First Edition : January 1959

Published by
VOSTOK
79 Mahatma Gandhi Road
Calcutta : 700 009

Printed by :
Nandan Offset,
29, Justice Manmatha Mukherjee Row,
Calcutta : 700 009

সূচিপত্র



Тургеневъ

খোর আর কালীনিচ

বোলখভ জেলা থেকে ঝিজদ্রা জেলায় যাবার সুযোগ যারই ঘটেছে, অরেল প্রদেশ আর কালুগার মানুষের মধ্যে একটা আশ্চর্য পার্থক্য তার চোখে পড়বেই। অরেলের চাষী লম্বা নয়, ঝুঁকে-পড়া দেহ, চেহারাটা বেজার আর সন্দিগ্ধ গোছের; আস্পেন কাঠের ছোটো এঁদো কুঁড়েঘরে তাদের বাস, ক্ষেতে মেহনত করে ভূমিদাসের মতো, কোনো ব্যবসা বাণিজ্যের বালাই নেই, আহার অকিঞ্চিৎকর, পায়ে বাস্টের জুতো। কালুগার খাজনাদার চাষী থাকে পাইন কাঠের প্রশস্ত কুটিরে; তার দেহ লম্বা, সে সাহসী, চোখে হাসিখুশি ভাব, চেহারা ছিমছাম পরিচ্ছন্ন; মাখন আর আলকাতরা নিয়ে তার ব্যবসা, ছুটির দিনে পায়ে চাপায় উঁচু বুট। অরেল প্রদেশের গ্রামগুলির (গুবেরনিয়ার পূর্বাঞ্চলের কথা বলছি) অবস্থিতি সাধারণত চষা জমির মাঝখানে, গিরিনালার কাছাকাছি, সেটা একটা নোংরা ডোবায় পর্যবসিত। কয়েকটা সদাশিব উইলো এবং দু'তিনটে কাহিল গোছের বার্চ গাছ ছাড়া এক মাইলের মধ্যে একটিও গাছ চোখে পড়বে না; গায়ে গায়ে লাগানো কুটিরগুলি, চালগুলি এবড়ো খেবড়ো করে ছাওয়া পচে-যাওয়া খড় দিয়ে ... অন্যদিকে, কালুগার গ্রামগুলি ঘিরে বনের সারি, কুটিরগুলি ছাড়া ছাড়া, অপেক্ষাকৃত সোজা আর তাদের চাল তৈরি বোর্ড দিয়ে; গেটগুলো আটকায় বেশ আঁট হয়ে, বেড়াগুলো ভেঙেও যায়নি, হেলেও পড়েনি; চরে-বেড়ানো শুয়োরগুলো ঢুকে পড়তে পারে এমন কোনো ফাঁক নেই ... আর শিকারীর পক্ষেও কালুগা প্রদেশের সবকিছু অনেক ভালো। অরেল প্রদেশে আর পাঁচ বছরের মধ্যে ঝোপঝাড়, বন সব লোপ পেয়ে যাবে, জলাভূমির আর চিহ্নমাত্র ইতিমধ্যে

নেই, কিন্তু কালুগায় জলাভূমি প্রসারিত মাইলের পর মাইল, বনভূমির বিস্তার শত শত মাইল, আর বনমোরগের মতো চমৎকার পাখি এখনো সেখানে বিদ্যমান; খোসমেজাজের বড়ো বড়ো কাদাখোঁচা আছে অঢেল, আর ডানা ঝাপটানো তিতিরগুলো হঠাৎ সোজা ওপর দিকে উড়ে গিয়ে শিকারীকে আর তার কুকুরকে চমকে দেয়, মাতিয়ে তোলে।

শিকারের খোঁজে একবার ঝিজদ্রা জেলায় গিয়ে মাঠে আমার দেখা হয়েছিল কালুগা প্রদেশের এক ক্ষুদে জমিদারের সঙ্গে, নাম তার পলুতীকিন, তার সঙ্গে পরিচয়ও হল। ভদ্রলোক একজন উৎসাহী শিকারী; কাজেই অতি চমৎকার লোক না হয়ে পারেন না। কিছু কিছু দুর্বলতা তাঁর ছিল সত্যি; প্রদেশের প্রত্যেকটি অনুঢ়া ওয়ারিসের কাছে তিনি প্রস্তাব করে পাঠাতেন, তারপরে যখন তার পাণিপ্রার্থনা আর আতিথ্যগ্রহণ মঞ্জুর হত না, তখন ভগ্নহৃদয়ে তিনি তার দুঃখ বর্ণনা করে যেতেন বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত পরিজন সবার কাছে, আর তরুণীর আত্মীয় স্বজনদের বিলিয়ে যেতেন টক পীচ ফল এবং তাঁর বাগানের অন্যান্য সব কাঁচা ফল; এক ঘটনাকেই বার বার করে বলতে তিনি ভালোবাসতেন, সেটা মিঃ পলুতীকিনের কাছে ভালো লাগলেও আর কাউকে নিশ্চয় খুশি করতে পারত না; আকিম নাখিমভের লেখা এবং "পিনা" উপন্যাস ছিল তাঁর সমাদরের বস্তু; ছিলেন তোৎলা; কুকুরটাকে ডাকতেন অ্যাস্ট্রনমার বলে; "তবে কিনা"র বদলে বলতেন "তবে কিছু কিনা"; বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থাটিকে করেছিলেন ফরাসী কায়দায়, রাঁধুনী বলত যে তাঁর রান্নার গোপন রহস্যটি ছিল প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনের স্বাভাবিক আস্বাদকে একেবারে ওলট পালট করে দেওয়া; এই শিল্পীর হাতের গুণে মাংসে আসত মাছের গন্ধ, মাছে ব্যাঙের ছাতার, আর ম্যাকারনিতে বারুদের গন্ধ; আর ক্ষতিপূরণের জন্য আঁকাবাঁকা চারকোনা কিংবা অসমান বাহু বিশিষ্ট চতুর্ভুজের আকার না নিয়ে উপায় ছিল না সুপের একটি গাজরেরও। কিন্তু, এই গোটাকয়েক অকিঞ্চিৎকর ত্রুটি বাদ দিলে মিঃ পলুতীকিন ছিলেন, আগেও তা বলা হয়েছে, ছিলেন একটি চমৎকার লোক।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনেই মিঃ পলুতীকিন আমাকে তাঁর বাড়িতে রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ জানালেন।

বললেন, "আমার বাড়ি আরো পাঁচ মাইল দূরে। হেঁটে গেলে বেশ খানিক পথ, প্রথমে চলুন খোর-এর বাড়ি যাই।" (তাঁর তোৎলামি বাদ দিয়ে লিখছি পাঠক মার্জনা করবেন।)

"খোর কে ?

"আমার একজন কিষাণ। সে এখান থেকে বেশ কাছেই থাকে।"

আমরা গেলাম সেদিকে। বনের মাঝখানে সাফ-করা ভালো করে চষা একটি জায়গায় খোরের খামার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। খামারে কয়েকখানা পাইন কাঠের বাড়ি, তক্তার বেড়া দিয়ে জোড়া, বড়ো বাড়িটার সামনে দিয়ে চলে গেছে একটি অলিন্দ, সরু সরু থামের ওপর তা দাঁড়ানো। আমরা প্রবেশ করলাম। দেখা হল বিশ বছরের একটি যোয়ান ছেলের সঙ্গে, ছেলেটি লম্বা, বেশ ভালো দেখতে।

মিঃ পলুতীকিন শুধোলেন, "কিহে ফেদিয়া, খোর আছে বাড়িতে?"

তুষারের মতো শাদা এক পাটি দাঁত বার করে হেসে ছেলেটি বলল, "না। খোর গেছে শহরে। ছোটো গাড়িটা কি বার করব?"

"হাঁ বাছা, ছোটো গাড়িটা। আর আমাদের জন্য কিছু ক্‌ভাস নিয়ে এসো তো।"

কুটিরের মধ্যে গেলাম। দেয়ালের পরিষ্কার তক্তার ওপর সুজ্‌দালের একখানা সস্তা ছাপা ছবিও নেই; এক কোণে রুপোর খাপের মধ্যে ভারি দেবমূর্তির সামনে জ্বলছে একটি প্রদীপ; লিনডেন কাঠের টেবিলটি সম্প্রতি পালিশ করে ঘষে মেজে সাফ করা হয়েছে, জানালার ফ্রেমের কোণে ঘুপচিতে চঞ্চল প্রুশিয়ান গুবরে পোকা ছুটে বেড়াচ্ছে না, লুকিয়ে নেই গোমড়ামুখো কোনো আরশোলা। ছেলেটি এল আবার, চমৎকার ক্‌ভাস ভর্তি মস্ত একটা শাদা কলসী, প্রকাণ্ড একখানা গমের রুটি আর কাঠের বাটিতে গোটা বারো নুন মাখা শশা হাতে করে। খাবারগুলো সে রাখল টেবিলের ওপর, তারপর দুয়ারে হেলান দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল হাসিমুখে। আমাদের খাওয়া শেষও হয়নি, এমন সময় দোরের সামনে গাড়ি খটখট করে উঠল। বেরিয়ে এলাম। কোঁকড়া চুলওয়ালা, বছর পনেরোর একটি ছেলে, গাল দুটি তার গোলাপী, গাড়িতে চালকের আসনে বসে, হৃষ্টপুষ্ট শাদাকালো ঘোড়াটাকে ধরে রাখতে তার কষ্ট হচ্ছিল। গাড়িটা ঘিরে

ছয়টি প্রকান্ড যোয়ান, তাদের দেখতে অনেকটা একরকম এবং ফেদিয়ার মতো।

পল্‌তীকিন বললেন, "সব কটাই খোরের ছেলে!"

ফেদিয়া বলল, "ওরা সবাই খোর্‌কি" (মানে খটাশ), ফেদিয়া আমাদের পেছন পেছন এসেছে সিঁড়ি পর্যন্ত; বলল, "এরাই সব নয়: পতাপ গেছে বনে, আর সিদর গেছে শহরে, বুড়ো খোরের সঙ্গে," গাড়িচালকের দিকে ফিরে বলল, "শোনো ভাসিয়া, হাওয়ার মতো গাড়ি ছুটিয়ে যাবে, নিয়ে যাচ্ছ কর্তাকে। কেবল খেয়াল রেখো গর্তের ওপর দিয়ে যাবার সময়, তখন একটু যত্নে গাড়ি চালিয়ো গাড়ি উল্টে দিয়ে কর্তার পেট পাকিয়ে দিয়ো না!"

অন্য খোর্‌কিরা ফেদিয়ার রসিকতায় মুচকে হাসল।

মিঃ পল্‌তীকিন বললেন রাশভারী চালে, "অ্যাস্‌ট্রেনমারকে তুলে দাও!" ফুর্তি হারাল না ফেদিয়া, কুকুরটার মুখে যেন জোর করে ফুটিয়ে তোলা একটু হাসি, তাকে তুলে গাড়িতে বসিয়ে দিল ফেদিয়া। ভাসিয়া চালিয়ে দিল ঘোড়াটাকে। গাড়িতে করে আমরা চললুম।

একটা ছোটো নিচু ঘর দেখিয়ে মিঃ পল্‌তীকিন সহসা আমাকে বললেন, "ওইটে আমার হিসেব-ঘর। যাবেন নাকি ভেতরে?"

"অবশ্য।"

ভেতরে যেতে যেতে তিনি বললেন, "এটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না। তবু দেখবার মতো।"

হিসেব-ঘরের দুটি কোঠা খালি। দেখাশুনো করে যে লোকটি সে বুড়ো, এক চোখ তার কানা, লোকটি ছুটে এল উঠোন থেকে।

মিঃ পল্‌তীক্বিন বললেন, "ভালো তো মিনিয়াইচ, জল-টল ঠিক করে রাখো না কেন?"

এক চোখ কানা বুড়ো লোকটি চলে গেল, পরমুহূর্তে ফিরে এল এক বোতল জল এবং দুটি গেলাস নিয়ে। পল্‌তীকিন আমাকে বললেন, "খেয়ে দেখুন। আমার ঝরণার জল, ভারি চমৎকার!" দুই গেলাস করে আমরা জল খেলাম, বুড়ো লোকটি সেলাম জানিয়ে মাথা নিচু করে রইল।

আমার নতুন বন্ধু এবার বললেন, "আসুন, এবার বোধহয় যাওয়া যেতে

পারে। এই হিসেব-ঘরে বসে বণিক আল্লিলুয়েভকে বেশ ভালো দামে চার একর জংলা জমি বেচেছি।”

গাড়িতে গিয়ে বসলাম, তার আধ ঘণ্টার মধ্যে জমিদার-বাড়ির প্রাঙ্গণে আমরা পেঁছে গেলাম।

রাত্রে খেতে খেতে পলুতীকিনকে জিজ্ঞেস করলাম, “বলুন না, খোর আপনার অন্যান্য কিষাণদের থেকে আলাদা থাকে কেন?”

“হুঁ, কারণ, ও সেয়ানা কিষাণ। পঁচিশ বছর আগে ওর কুঁড়েঘর গেছল পুড়ে, আমার বাবার কাছে এসে বলল, ‘নিকলাই কুজমিচ, বাদার ওপরটাতে বনে আপনার জমিতে আমাকে বসতি করতে দিন। ভালো খাজনা দেব।’ ‘কিন্তু বাদাটা তোর চাই কেন?’ ‘ও, এমনি আমি চাচ্ছিলাম, নিকলাই কুজমিচ, হুজুর, আমাকে কোনো কাজ করে দিতে বলবেন না আজ্ঞে, যা ভালো মনে করেন সেই রকম একটা খাজনা শুধু ঠিক করে দিন।’ ‘বছরে পঞ্চাশ রুবল।’ ‘যে আজ্ঞে।’ ‘কিন্তু দেখিস, বাকি রাখা চলবে না কিন্তু!’ ‘না না, বাকি রাখব না ...’ বাদায় এসে বসল সে। তারপর থেকে ওকে সবাই ডাকে খোর বলে” (খোর মানে খটাশ)।

আমি শুধোলাম, “আচ্ছা, ও পয়সাকড়ি করেছে নাকি?”

“হ্যাঁ, করেছে। এখন আমাকে খাজনা দেয় পুরো একশ, আরো বাড়িয়ে দেব ভাবছি। অনেকবার ওকে বলেছি, খোর, আর পরের গোলাম থাকো কেন? কিনে নাও নিজের মুক্তিটা! নাও, কিনে নাও, স্বাধীন হয়ে যাও, খোর...? কিন্তু ও বলে, না, তার উপায় নেই; ধড়িবাজ! বলে, তার টাকা নেই ... যেন তাও সম্ভব ...”

পরদিন, চা খাওয়ার পরই শিকারে বেরুলাম আবার। গ্রামের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি, মিঃ পলুতীকিন একটা মাথা নোয়ানো কুটিরের কাছে গাড়ি থামাতে বললেন, তারপর চেঁচিয়ে ডাকলেন, “কালীনিচ!”

উঠোন থেকে সাড়া এল, “যাই হুজুর, যাচ্ছি। জুতো পরছি।”

আস্তে আস্তে গেলাম খানিকটা, গ্রামের বাইরে বছর চল্লিশেকের একটি লোক আমাদের ধরে ফেলল। লোকটি লম্বা, রোগা, মাথাটি ছোটো আর একেবারে খাড়া। এ-ই কালীনিচ। তার শ্যামবর্ণ খোসমেজাজী মুখখানা অল্প একটু ভাঙা, একবার দেখেই আমি খুশি হয়ে উঠলাম। কালীনিচ

(পরে জেনেছি) রোজ যেত তার কর্তার সঙ্গে শিকারে, থলে বইত, কখনো কখনো বন্দুকটাও, লক্ষ্য রাখত শিকার পাওয়া যাবে কোথায়, জল আনত, ঝাঁপড়ি বানাত, কুড়িয়ে আনত স্ট্রবেরি আর গাড়ির পেছন পেছন ছুটত, মিঃ পলুতীকিন তাকে ছাড়া এক পাও নড়তে পারতেন না। কালীনিচের স্বভাব ছিল আমুদে আর ভারি শান্ত, গুন্ গুন্ করে সে সর্বদাই গান গাইত আপন মনে আর চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখত নিশ্চিন্ত মনে। একটু নাকি-সুরে সে কথা বলত, আর তখন তার ফিকা নীল চোখ দুটি হাসিতে মিট মিট করত, আর তার অভ্যাস ছিল নিজের সামান্য সূঁচলো দাড়িতে হাত দিয়ে টেনে টেনে তোলা। চলা তার খুব দ্রুত নয়, কিন্তু চলত লম্বা লম্বা পা ফেলে একটি সরু লম্বা লাঠির ওপরে ভর করে। দিনের মধ্যে অনেকবার সে আমাকে ডেকে কথা বলেছে, আমার সেবা করেছে, তার মধ্যে কোনো হীনতা ছিল না, কিন্তু কর্তাকে সে এমনভাবে দেখাশুনো করত যেন তিনি একটি শিশু মাত্র। দুপুরবেলা অসহ্য গরমে আমরা যখন আশ্রয় খুঁজছি সে তখন আমাদের নিয়ে চলল একেবারে বনের মাঝখানে তার মৌ-বাগিচায়। সেখানে কালীনিচ খুলে দিল ছোটো একটি কুটির, তার চতুর্দিকে ঝুলে পড়েছে নানা সুগন্ধি লতাপাতা গাছগাছড়ার ঝাড়। শুকনো কিছু খড়ের ওপর আমাদের সে বসতে দিল আরামে, তারপর নিজের মাথায় জড়িয়ে নিল জালের থলে গোছের একটি কী যেন, হাতে নিল ছুরি একখানা, একটি ক্ষুদ্র পাত্র আর একটি জ্বলন্ত লাঠি, তারপর চলে গেল মৌচাকের কাছে আমাদের জন্য কিছু মধু পেড়ে আনতে। উষ্ণ স্বচ্ছ মধু খেয়ে ঝরণার জল খেলুম একটু, তারপর মৌমাছির একটানা গুঞ্জন আর পত্রমর্মরের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঈষৎ একটা দমকা হাওয়ায় আমার ঘুম ভেঙে গেল... চোখ খুলেই দেখি কালীনিচকে: আধ-ভেজানো দোরের দাওয়ায় সে বসে আছে, ছুরি দিয়ে চামচে চাঁচছে। অনেকক্ষণ আমি তার মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম সপ্রশংস দৃষ্টিতে, সে মুখখানা সন্ধ্যাকাশের মতো উজ্জ্বল মনোহর। মিঃ পলুতীকিনও জাগলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উঠে পড়লুম না। বহু ঘোরাঘুরির পর বেশ করে ঘুমিয়ে নিয়ে খড়ের ওপর চুপচাপ শুয়ে থাকতে বেশ লাগছিল; আমাদের শরীর অবসন্ন, ক্লান্তিতে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলাম, গরমে আমাদের মুখ একটু লাল হয়ে উঠেছে, মিঠা আলস্যে চোখ বুজে

রয়েছে। শেষ পর্যন্ত উঠলাম, তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত আবার ঘুরে বেড়ালাম।

রাত্রে খেতে বসে আবার আমি খোর আর কালীনিচের কথা শুরু করলাম। মিঃ পলুতীকিন আমায় বললেন, "কালীনিচ বেশ ভালো কিষাণ, খুব কাজের লোক, কাজকর্মে আপত্তি নেই একদম, কিন্তু নিজের জমি ও ভালো করে চাষ করতে পারে না; ওকে প্রায়ই আমি চাষের কাজ থেকে সরিয়ে নিই। রোজ আমার সঙ্গে ও শিকারে বেরোয়... কাজেই বুঝতেই পারছেন ওর চাষের কাজ চলে কেমন।"

তাঁর কথাটা মানলুম আমি। তারপর ঘুমুতে গেলাম।

পরের দিন মিঃ পলুতীকিনের যেতে হল শহরে, প্রতিবেশী পিচুকভের সঙ্গে তাঁর একটা মোকদ্দমা ছিল। এই প্রতিবেশী পিচুকভ পলুতীকিনের কিছু জমির ওপর চাষ চালিয়েছিল, আর সেই জমিতেই তাঁর এক কিষাণীকে চাবুক মেরেছিল। একলাই বেরুলাম শিকারে, সন্ধ্যে না হতেই এসে পেঁছিলাম খোরের বাড়িতে। কুটিরের দাওয়ায় দেখা হল এক বৃদ্ধের সঙ্গে— বৃদ্ধটির মাথায় টাক; বেঁটে, কাঁধটা চওড়া এবং বলিষ্ঠ — খোর স্বয়ং। সকৌতূহলে তাকালাম লোকটির দিকে। মুখের আকৃতি সক্রেটিসের কথা মনে করিয়ে দেয়: সেই রকম উঁচু, চওড়া কপাল, সেই ক্ষুদ্র চোখ, সেই রকম খাঁদা নাক। এক সঙ্গে দুজনে ঘরে ঢুকলাম। সেই ফেদিয়া নিয়ে এল আমার জন্য খানিকটা দুধ এবং রাই-এর রুটি। খোর বসল একটা বেঞ্চের ওপর, তারপর কোঁকড়ানো দাড়িটিতে হাত বুলোতে বুলোতে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। নিজের কদর সে বোঝে মনে হল; কথা বলে, চলে ফেরে সে ধীরে ধীরে; মাঝে মাঝে লম্বা গোঁফের মধ্যে হাসির চুমকুড়ি শোনা গেল।

বীজ বোনা, শস্যের কথা, কৃষকের জীবন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম... মনে হচ্ছিল সে যেন আমার সব কথার সঙ্গে একমত, পরে কিন্তু আমার অস্বস্তি হল, মনে হল আমি বকে চলেছি বোকার মতো... সেদিক দিয়ে আমাদের কথাবার্তা ছিল বিচিত্র। খোর মাঝে মাঝে একেবারে দুর্বোধ্য কথা বলছিল, সাবধান হতে চায় বলে সন্দেহ নেই... আমাদের বাক্যালাপের নমুনা হচ্ছে এই।

আমি বললুম, "খোর, বল তো কর্তার কাছ থেকে নিজের মুক্তি আদায় করে নিচ্ছ না কেন টাকা দিয়ে?"

"কিসের জন্য কিনব স্বাধীনতা। এখন তো আমি আমার মনিবকে জানি, নিজের খাজনার কথাটাও জানা ... আমাদের হুজুর বেশ ভালো।

আমি বললুম, "স্বাধীন হওয়া সব সময়েই ভালো।" খোর আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানল।

বলল, "নিশ্চয়।"

"বেশ, তাহলে টাকা দিয়ে স্বাধীন হচ্ছ না কেন?"

খোর মাথা নাড়ল।

"কী দিয়ে কিনবো, আজ্ঞে?"

"আহা! ও সব কথা বোলো না বুড়ো!"

নিচু গলায়, যেন নিজের মনে সে বলে চলল, "খোর যদি আজ স্বাধীন লোকের মাঝে গিয়ে পড়ে, তাহলে দাড়ি-ছাড়া প্রত্যেকটি লোক হবে খোরের চাইতে ভালো।"

"তবে কামিয়ে ফেলো দাড়ি।"

"দাড়িটা আর কী? দাড়ি তো ঘাস মাত্র, কেটে ফেলা যায়।"

"তাহলে?"

"কিন্তু খোর তো সরাসরি বণিক হয়ে যাবে একেবারে, বণিকদের জীবন তো খাসা, আর তাদের দাড়িও আছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন? একটু আধটু ব্যবসা-ট্যাবসাও করো নাকি?"

"একটু মাখন আর একটু আলকাতরার ব্যবসা করে থাকি ... গাড়ি জুতব নাকি, হুজুর?"

আমি মনে মনে বললুম, "হুঁশিয়ার লোক তুমি, জিভের 'পরে কড়া বলগা তোমার।" মুখে বললুম, "না, গাড়ি আমার চাই না; কাল তোমার বাড়ির কাছাকাছি শিকার করব, আর যদি থাকতে দাও তাহলে তোমার খড়ের গোলাঘরে রাতটা কাটাব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু গোলাঘরে কি আরাম হবে আপনার? মেয়েদের বলব'খন একখানা চাদর বিছিয়ে দিতে আর একটা বালিশ দিতে ... ওগো

মেয়েরা!” উঠে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে ডাকল, বলল, “শুনছো তোমরা! আর ফেদিয়া, তুমিও যাও ওদের সঙ্গে। জানো তো, মেয়েরা কেমন বোকা।”

মিনিট পনেরো পরে ফেদিয়া একটা লণ্ঠন হাতে করে আমাকে গোলাঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিল। গন্ধে ভরা খড়ের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লুম; পায়ের কাছে গুটি পাকিয়ে পড়ে রইল আমার কুকুরটা; ফেদিয়া শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে আটকে গেল দোরটা, বহুক্ষণ আমার ঘুম এল না। দোরের কাছে এসে একটা গোরু জোরে জোরে দুবার নিঃশ্বাস ফেলল, কুকুরটা ভারিক্কি মেজাজে গর গর করে উঠল; একটা শুয়োর হেঁটে চলে গেল বিষণ্ণ মেজাজে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে; কোথায় যেন একটা ঘোড়া খড় চিবিয়ে খাচ্ছে আর নাক দিয়ে শব্দ করছে... অবশেষে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সূর্য উঠলে আমাকে জাগিয়ে দিল ফেদিয়া। এই সতেজ চটপটে যুবকটি ভারি খুশি করল আমাকে; আর দেখেশুনে মনে হল সে বুড়ো খোরেরও প্রিয়পাত্র। পরস্পরের সঙ্গে বেশ বন্ধুর মতো ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তারা। এবার বুড়ো এল আমাকে দেখতে। তার বাড়িতে রাত কাটিয়েছি বলেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক খোর আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি সাদর ব্যবহার করল আমার সঙ্গে।

একটু হেসে আমায় সে বলল, “সামোভার তৈরি, চলুন চা খাই গে।”

টেবিলে বসলুম দুজনে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটি কিষাণী — তার পুত্রবধূ — এক ঘড়া দুধ নিয়ে এল। ছেলেরা এল একের পর এক।

বৃদ্ধকে বললুম, “কী চমৎকার তোমার ছেলেপুলেরা!”

দাঁতে চিনির ছোটো টুকরো ভেঙে সে বলল, “হ্যাঁ, আমার সম্পর্কে বা বুড়ীর সম্পর্কে ওদের মনে হয় কোনো নালিশ নেই।”

“সবাই তোমার সঙ্গেই থাকে?”

“হ্যাঁ, ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে, এখানেই থাকে সবাই।”

“সবার বিয়ে হয়েছে?”

“এই একটি বিয়ে করেনি, পাজীটা!” সে বলল ফেদিয়াকে দেখিয়ে। ফেদিয়া সেই আগের মতো দোরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। “আর ভাসিয়া, সে এখনো যোয়ান হয়নি, ও সবুর করতে পারে।”

ফেদিয়া প্রত্যুত্তরে বলল, "আমি বিয়ে করতে যাব কেন? যেমন আছি বেশ তো আছি। বউ-এর আমার দরকারটা কী? ঝগড়া করার জন্য? অ্যাঁ?"

"হুঁ, এই যে দেখো, তুমি ... তোমাকে জানতে বাকি আছে আমার? তুমি রুপোর আংটি পর... চাকরাণীদের পেছন পেছন তো লেগে থাকবে সর্ব সময় ..." তারপর চাকরাণীদের অনুকরণ করে বুড়ো বলল আবার, "'থামাও বাপু, লজ্জা করে না!' হ্যাঁ, তোমাকে আর জানিনে, ভারি ভদ্দরলোক তুমি!"

"কিন্তু কৃষক মেয়ের ভালোটা কোথায়?"

খোর গম্ভীরভাবে বলল, "কৃষক মেয়ে হচ্ছে—মজুরাণী, সে কিষাণের চাকরাণী।"

"মজুরাণী দিয়ে আমি কী করব?"

"মনে হচ্ছে, তুমি খেলতে চাও আগুন নিয়ে আর তাতে আঙুল পুড়বে অন্য লোকের; তুমি কোন ধরনের ছোকরা, আমাদের তা জানা আছে।"

"তাহলে বিয়ে দিয়ে দাও আমার। কই, জবাব দিচ্ছ না কেন?"

'থাক, ঢের হয়েছে, ছেবলা ছোঁড়া কোথাকার! দেখছ না এই ভদ্রলোক বিরক্ত হচ্ছেন। বিয়ে দেবই তোমার, দেখে নিও... আর আপনি আজ্ঞে ওর ওপর বিরক্ত হবেন না হুজুর, দেখছেন তো একেবারে বাচ্চা ও; বুদ্ধি-শুদ্ধি এখনো ওর হয়নি বেশি।"

ফেদিয়া মাথা নাড়ল।

"খোর আছো নাকি বাড়িতে?" পরিচিত গলায় ডাক শোনা গেল, হাতে এক গুচ্ছ বুনো স্ট্রবেরি নিয়ে ঘরে ঢুকল কালীনিচ, বন্ধু খোরের জন্য স্ট্রবেরি যোগাড় করে নিয়ে এসেছে সে। বুড়ো আদর করে ডেকে নিল তাকে। অবাক হয়ে কালীনিচের দিকে তাকালাম আমি। স্বীকার করছি, একজন কিষাণের কাছে এমন সুন্দর বন্ধু সংকার আমি আশা করিনি।

সচরাচর যা করে থাকি সেদিন তার থেকে চার ঘণ্টা দেরী করে শিকারে বেরুলাম, এবং পরের তিন দিন রইলাম খোরের বাড়িতে। আমার নতুন বন্ধুদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠলাম। জানি না কী করে তাদের আস্থা অর্জন করেছি, কিন্তু তারা আমার সাথে বেশ অবাধে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। দুই বন্ধু এক রকম নয় একেবারেই। খোর হচ্ছে একেবারে সাক্ষাৎ বৈষয়িক

কাজের লোক, পরিচালন করবার ক্ষমতা বেশ আছে, খুব যুক্তিবাদী; কিন্তু কালীনিচ হচ্ছে আদর্শবাদী কল্পনাপ্রবণদের দলের, ভাববিলাসী উৎসাহপ্রবণ মেজাজের। খোরের বাস্তব বুদ্ধি স্পষ্ট — তার মানে, সে ভবিষ্যতের কথা ভাবে, কিছু টাকাকড়ি জমিয়ে নিয়েছে, জমিদার এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে খাতির রেখে চলেছে; কালীনিচ বাস্ট জুতো পায়ে দেয়, আর দিন আনে দিন খায়। খোর বেশ বড়ো-সড়ো একটি পরিবার গড়ে তুলেছে, তারা সবাই একত্রিত আর খোরের বাধ্য; কালীনিচের এককালে বৌ ছিল বটে, কিন্তু তাকে সে ভয় করত, আর ছেলেপুলে নেই তার। খোর মিঃ পলুতীকিনকে চিনত একেবারে মর্মে মর্মে, কালীনিচ তার প্রভুকে করত পুজো। খোর ভালোবাসত কালীনিচকে, সযত্নে দেখাশোনা করত তাকে, আর কালীনিচ খোরকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। খোর কথা বলত কম, ফিক করে হাসত আর নিজের ভাবনা নিজে ভাবত, কালীনিচের অভিব্যক্তিতে ছিল আন্তরিকতা, যদিও কারখানার তুখোড় মজুরের মতো চোস্ত ভাষার তুবড়ী ফুটত না তার মুখে। কিন্তু কালীনিচের এমন সব ক্ষমতা ছিল যা খোরও স্বীকার করত; সে রক্তস্রাব, তড়কা, পাগলামি এবং ক্রিমির ব্যামো আরাম করতে পারত; তার মৌমাছিগুলো বরাবরই খুব কাজের; হাতজোড়া সর্বদাই হালকা। আমার সামনেই খোর তাকে বলল নতুন কেনা একটা ঘোড়াকে আস্তাবলের দলে ভেড়াতে, কালীনিচ সযত্ন গাম্ভীর্যে সেই অবিশ্বাসী বুড়োর অনুরোধ পালনও করল। কালীনিচের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল প্রকৃতির সঙ্গে, আর খোরের সংযোগ লোকজন আর সমাজের সঙ্গে। কালীনিচ যুক্তিতর্ক পছন্দ করত না, সবকিছু বিশ্বাস করত অন্ধভাবে; খোরের কিন্তু ছিল এমন কি জীবন সম্বন্ধেও একটা শ্লেষের মনোভাব। সে দেখেছে অনেক, অনেক তার অভিজ্ঞতা, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। যেমন ধরুন, তার কাছ থেকেই আমি জানতে পারলাম যে, ফি-বছর শস্যমাড়াই-এর সময়ের কিছু আগে গ্রামে দেখা দেয় একটা ছোটো অদ্ভুত দর্শন গাড়ি। গাড়িতে বসে থাকে একটা লোক, গায়ে তার লম্বা কোট, সে কাস্তে বেচে। নগদে তার দাবি হল এক রুবল পঁচিশ কোপেক, নোটে দেড় রুবল, আর ধারে চার রুবল। অবশ্য সব চাষীরাই তার কাছ থেকে কাস্তে কেনে ধারে। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে লোকটা ফিরে এসে টাকা চায়। চাষীর যব তখন সবে

কাটা হয়েছে, কাজেই ধার শোধ করতে কোনো অসুবিধে হয় না, ব্যাপারীকে সঙ্গে করে সে যায় শুঁড়িখানায়, সেখানে দেনাপাওনা মিটে যায়। কয়েকজন জমিদার ঠিক করেছিল নগদ দামে কাস্তেগুলো কিনে রাখবে তারাই, তারপর একই দামে সেগুলো ধার দেবে চাষীদের; কিন্তু চাষীরা যেন তাতে অসন্তুষ্ট, এমন কি বিরক্তও হল; কারণ কাস্তের ওপর টোকা মেরে ধাতুর শব্দ শোনা, হাতের ওপর বার বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাস্তেখানা দেখা, তারপর বদমাশ ব্যাপারীকে বার বার করে বলা, "হুঁ হুঁ, দোস্ত, কাস্তে দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না আমায়!"—এ সবকিছুর আনন্দ থেকে তারা যে বঞ্চিত হবে।

ছোটো কাস্তে বিক্রীতেও একই ছলা কলা, তফাৎ কেবল এই, সে ক্ষেত্রে কেনা-বেচায় মেয়েরাও হাত লাগায়, আর মাঝে মাঝে তারা ব্যাপারীকেই প্রায় বাধ্য করে তোলে তাদের মার লাগাতে,—সে অবশ্য তাদেরই ভালোর জন্য। কিন্তু সব থেকে খারাপ ব্যবহার মেয়েরা পায় এই ভাবে। কাগজ কলে অকেজো নানা মাল মসলা সরবরাহের ঠিকাদাররা ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি কিনে আনার জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর লোক নিয়োগ করে, কোনো কোনো জেলায় তাদের বলা হয় "ঈগল"। এমনি এক "ঈগল" ব্যাপারীর কাছ থেকে দু'শ রুবলের নোট নিয়ে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু "ঈগল"এর নাম নিলেও সেই অভিজাত পাখিটির মতো প্রকাশ্যে ও সাহসের সঙ্গে শিকারের ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে না; বরং "ঈগল" শরণ নেয় প্রতারণা ও শঠতার। গ্রামের কাছাকাছি কোনো একটা ঝোপঝাড়ে সে তার গাড়িটা রেখে আসে, নিজে যায় পেছন দিকের উঠোনে ও খিড়কির দরজায়, যেন এমনি হেঁটে চলে যাচ্ছে সেই রকম করে কিংবা ভবঘুরের ভাব করে। মেয়েরা যেন তার গন্ধ পায়, লুকিয়ে চলে আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। দরাদরি হয়ে যায় খুব জলদি। কয়েকটা তামার পয়সার জন্য কিষাণী তার প্রত্যেকটি অকেজো ন্যাকড়ার খণ্ড শুধু নয়, প্রায়ই স্বামীর শার্টটা কিংবা এমন কি তার নিজের পেটিকোট পর্যন্ত দিয়ে দেয়। অধুনা মেয়েরা যেন নিজেদের মধ্য থেকে জিনিস চুরি করাটা এবং শণও একই রকমে বিক্রী করে দেওয়াটা ভারি লাভজনক বলে আবিষ্কার করছে—তাতে "ঈগল"দের ব্যবসাও বাড়ে, লাভও বাড়ে! এবিপদ সামলানোর জন্য চাষীরাও অবশ্য অনেকটা বেশি ধূর্ত হয়ে উঠেছে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে, "ঈগল" দেখা

দেবার সামান্য আভাসমাত্র পেলে সঙ্গে সঙ্গে এসে তারা বিপদ নিবারণের ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর, তাছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটা সৃষ্টিছাড়া নয়? শণ বেচা তো পুরুষ মানুষের কাজ—তারা তা বেচে থাকেও... শহরে অবশ্য নয় (কেননা সেখানে সব টেনে নিয়ে যেতে হয় তাদের নিজেদের), বেচে শহর থেকে আসা ব্যাপারীদের কাছে, যারা দাঁড়িপাল্লার অভাবে চল্লিশ থাবায় এক পুদ হিসেব করে -- তবে রুশের হাতখানা কি তাতো জানেনই, আর সে হাতে কতখানি যে ধরে, বিশেষ করে সে যখন আবার "চেষ্টা করে যথাসাধ্য"!

আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, পল্লীতে আমি বসবাস করিনি তাই এমনি ধরনের অনেক বর্ণনা শুনলাম। সব সময় খোর কিন্তু কেবল বর্ণনাই করত না, বহু ব্যাপারে সে আমাকে অনেক প্রশ্নও করত। সে জানতে পারল আমি বিদেশে গেছি, তাতে তার কৌতূহল জেগে উঠল... কৌতূহল কালীনিচেরও কম নয়, কিন্তু সে বেশি আকৃষ্ট হল প্রকৃতির বর্ণনায়, পর্বত, নির্ঝর, অসাধারণ সৌধশ্রেণী, বড়ো বড়ো নগরীর বর্ণনায়: খোরের আগ্রহ ছিল সরকার এবং শাসন পরিচালনার নানা প্রশ্নে। সবকিছু বোঝার মধ্যে তার একটি শৃংখলা ছিল। "আচ্ছা, ওদের ব্যবস্থাটাও কি আমাদেরই মতো, না আলাদা? ... বলুন, আজ্ঞে হুজুর, কেমন সেটা?" আমি যখন গল্প বলতাম কালীনিচ বলে উঠত,"হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!" খোর কথা বলত না, ঘন ভুরু কোঁচকাতো, মাঝে মাঝে শুধু মন্তব্য করত, "আমাদের বেলা ও চলবে না: তবু এই জিনিসটা ভালো -- ঠিক কথা।"

তার সব প্রশ্ন আমি আবার নতুন করে বলতে পারিনা, তার দরকারও নেই; কিন্তু আমাদের কথাবার্তা থেকে একটি দৃঢ় বিশ্বাস আমি বহন করে নিয়ে এসেছি, কী তা আমার পাঠকরা আন্দাজও করতে পারবেন না... আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, মহান পিটার ছিলেন বিশেষ করে একজন রুশ, বিশেষ করে সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে। রুশ মানুষ আপন শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে এত সচেতন যে বিপুল, প্রচন্ড প্রয়াসেও সে ভয় পায় না, অতীতের প্রতি তার আগ্রহ অকিঞ্চিৎকর, বলিষ্ঠ দৃষ্টি প্রসারিত সম্মুখ পানেই যা ভালো তা সে পছন্দ করে, যা সঙ্গত সে তা গ্রহণ করবে, কোত্থেকে

তা এল তা দিয়ে সে মাথা ঘামায় না। তারা সতেজ-বুদ্ধি জার্মানদের সূক্ষ্ম বচনবাগিশীকে ঠাট্টা করতে ভালোবাসে; কিন্তু খোরের ভাষায়, "জার্মানরা অদ্ভুত লোক।" আর তাদের কাছ থেকে কিছু শিখতেও সে প্রস্তুত। খোরের বিশেষ অবস্থা আর তার ব্যবহারিক স্বাধীনতা — এই কারণে সে আমাকে অনেক কথা বলেছে, এমন কথা যা আপনি অন্য কোনো লোকের কাছ থেকে খুঁটে খুঁটে কিংবা, কৃষকদের ভাষায় — কোদাল দিয়ে খুবলেও বার করতে পারবেন না। বাস্তবিক সে তার নিজের অবস্থাটিকে বুঝত ভালো করে। খোরের সঙ্গে কথাবার্তাতেই আমি প্রথম শুনি রুশ কিষাণের সরল, বিজ্ঞ আলোচনা। সে ভাবত সে যথেষ্ট জানে, কিন্তু পড়তে পারত না, কালীনিচ কিন্তু পারত।

খোর মন্তব্য করল, "ওই অকেজোটা ইস্কুলে পড়েছে, আর ওর মৌমাছিগুলো শীতকালে মরে যায় না কখনো।"

"কিন্তু ছেলেপুলেদেরও কি তুমি পড়তে শেখাওনি?"

এক মুহূর্ত খোর নীরব। "ফেদিয়া পড়তে পারে।"

"আর, আর সবাই?"

"অন্যেরা পারে না।"

"কিন্তু কেন?"

বুড়ো এ কথার কোনো জবাব দিল না, কথার বিষয়টি বদলে দিল। অবশ্য, বুদ্ধিমান হলেও তার ছিল বহু সংস্কার এবং নানা খামখেয়ালীপনা। যেমন ধরুন, মেয়েদের সে একেবারে অন্তর থেকে ঘৃণা করত, আর মেজাজ খুশি থাকলে মেয়েদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে আমোদ পেত। তার বৌ ভারি বদমেজাজী বুড়ী, সারাদিন শুয়ে থাকত স্টোভের ওপর, আর অনবরত বক বক করত আর ধমকাত; ছেলেরা কেউ গ্রাহ্য করত না তাকে, কিন্তু ছেলের বৌদের সে দারুণ সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। রুশী গীতিকায় শাশুড়ীর গানটি খুব অর্থপূর্ণ: "কী যে ছেলে তুই আমার! কেমন যে তুই গৃহস্বামী! বৌয়ের গায়ে তুলিস না হাত, যুবতী বৌকে মারিস না তুই..." আমি একবার বৌদের হয়ে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছিলাম, খোরের সহানুভূতি জাগানোর চেষ্টা করেছিলাম; সে খুব ঠাণ্ডা গলায় প্রত্যুত্তর দিয়ে বলল আমায়, "এ সব... সামান্য বিষয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকারটা কী,

মেয়েরাই খেয়োখেয়ি করে নিক না মিটিয়ে... ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে আরো খারাপ দাঁড়াবে অবস্থাটা... ওতে হাত কালি করে কোনো লাভ নেই।" কখনো কখনো ছিংস্নটে বুড়ী স্টোভ থেকে নেমে আসত, খড়ের গাদা থেকে ডেকে আনত উঠোনের কুকুরটাকে, চেঁচাত, "আয় আয় তু-তু"; তারপর ওর সরু মাজায় মারত, আর নয়ত চৌকাঠে দাঁড়িয়ে যে যাবে তাকে দেখেই, খোরের ভাষায়, "কুকুরের মতো গর্জন করত"। স্বামীকে কিন্তু সে ভয় পেত, তার কথায় ফিরে যেত স্টোভের ওপর। মিঃ পলুতীকিনের প্রসঙ্গ উঠলে পরে খোর আর কালীনিচের মধ্যে যে তর্ক বাধত তা শোনা আবার বিশেষ বিচিত্র।

কালীনিচ বলত, "এই, খোর, ওঁর কথা ছেড়ে দাও।"

খোর জবাবে বলত, "কিন্তু তোমার জন্য বুট জুতোর অর্ডার দেন না কেন তিনি?"

"হ্যাঁ? বুট জুতো!... বুট জুতোর আমার দরকারটা কিসের? আমি তো চাষা।"

"তা যদি বলো, তাহলে চাষা তো আমিও, কিন্তু দেখো না!" এই বলে খোর তুলে ধরত তার পা দুখানা, কালীনিচকে দেখাত পায়ের বুট জুতো, সে জুতো দেখতে এমন, যেন প্রকাণ্ড এক হাতীর চামড়ায় তৈরি।

কালীনিচ বলত, "তুমি যেন আমাদের একজন আর কি!"

"আচ্ছা, অন্তত তোমার বাস্ট জুতোর দামটা তো তিনি দিতে পারেন, তুমি তাঁর সঙ্গে শিকারে বেরোও; রোজ তো তোমার এক জোড়া করে চাই।"

"বাস্ট জুতোর জন্য আমাকে তো তিনি দেন কিছু কিছু।"

"হ্যাঁ, গত বছর দুটো তামার পয়সা দিয়েছিলেন।"

কালীনিচ বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিত, কিন্তু খোর হেসে উঠত খল খল করে, তখন তার ক্ষুদে চোখ দুটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেত।

কালীনিচ গান গাইত বেশ মিষ্টি করেই এবং একটু আধটু বাজাতো বালালাইকা। সে গান বাজনা শুনতে খোরের কখনো ক্লান্তি ছিল না: একেবারে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ত একদিকে, আর একটা শোক-করুণ সুরে সে গলা মিলিয়ে দিত। বিশেষ করে "হায় বরাত, আমার বরাত"— এই গানটি ছিল তার ভারি প্রিয়। ফেদিয়া বাপকে নিয়ে কৌতুক করার সুযোগ কখনো হারাত না, বলত, "কী বুড়ো, এত তোমার দুঃখু কিসের?"

কিন্তু খোর হাতে গাল ঠেকিয়ে, চোখ বুজে নিজের বরাত নিয়ে বিলাপই করে যেত... আবার অন্য সময়ে তার চেয়ে কর্মঠ লোক পাওয়াই যেত না, সব সময় একটা কিছু নিয়ে সে ব্যস্ত — কখনো গাড়ি মেরামত, কখনো বা বেড়ার্টা জোড়াতালি দেওয়া, আবার কখনো হয়ত ঘোড়ার স্যাজ সরঞ্জামের তদারক করা। অবশ্য খুব বেশি পরিমাণ পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তার কোনো জেদ ছিল না: একবার আমার একটি মন্তব্যের জবাবে সে বলল, "কুটিরের গন্ধটি হওয়া চাই এমন যাতে বোঝা যায় সেখানে লোক বাস করে।"

জবাবে আমি বললাম, "কিন্তু দেখো, কালীনিচের মৌ-বাগিচাটি কেমন পরিচ্ছন্ন।"

নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "নইলে মৌমাছিরা সেখানে থাকত না, হুজুর।'

আর একবার আমায় সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলুন তো, আপনার নিজের কোনো তালুক আছে?"

"হ্যাঁ।"

"অনেক দূর এখান থেকে?"

"একশ মাইল।"

"আপনি কি আপনার জমিদারীতেই থাকেন, হুজুর?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আপনি তো বন্দুকটাকেই বেশি পছন্দ করেন, কী বলেন?"

"হ্যাঁ, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।"

"ভালোই করেন হুজুর; মনের সুখে বনমোরগ গুলি করুন, আর হামেশা গোমস্তা বদল করবেন।"

চতুর্থ দিন সন্ধ্যেবেলা মিঃ পলুতীকিন আমায় ডেকে পাঠালেন। বুড়োর কাছ থেকে চলে আসতে আমার দুঃখ হচ্ছিল। শকটে কালীনিচকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বসলাম।

বললাম, "আচ্ছা, চলি খোর — কল্যাণ হোক তোমার, চলি ফেদিয়া।"

"বিদায়, হুজুর, বিদায়; আমাদের ভুলে যাবেন না।"

রওয়ানা দিলাম আমরা, সূর্যাস্তের প্রথম রক্তাভা দেখা দিয়েছে তখন।

স্বচ্ছ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, "চমৎকার হবে কালকের দিনটা।"

কালীনিচ বলল জবাবে, "না, বৃষ্টি হবে কাল। ওই যে দূরে পাতিহাঁসগুলো জল-কাদা ছিটিয়ে চলেছে, আর ঘাসের গন্ধটা কড়া হয়ে উঠেছে।"

আমাদের গাড়ি গিয়ে প্রবেশ করল একটা ঝোপের মধ্যে। চালকের আসনে বসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে মৃদুস্বরে গান ধরে দিল কালীনিচ, আর সূর্যাস্তের পানে এক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল, তাকিয়ে রইল।

পরদিন অতিথিবৎসল পলুতীকিনের বাড়ি ছেড়ে চলে এলুম।

ইয়েরমলাই এবং যাঁতাদারের বউ

একদিন সন্ধ্যেবেলা শিকারী ইয়েরমলাই-এর সঙ্গে বেরিয়ে ছিলাম "দাঁড়িয়ে-শিকার" করতে। কিন্তু আমার পাঠকদের সবাই বোধহয় জানেন না "দাঁড়িয়ে-শিকার" কাকে বলে। বুঝিয়ে বলছি।

বসন্তকাল, সূর্যাস্তের মিনিট পনেরো আগে বন্দুকটি নিয়ে বেরিয়েছেন বনে, সঙ্গে কিন্তু কুকুরটা নেই। বনের প্রান্তে একটি জায়গা বেছে নিয়েছেন, তারপর তাকিয়ে দেখছেন চারদিকে; কার্তুজগুলো পরখ করে নিচ্ছেন, আর সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। মিনিট পনেরো কেটে যায়; সূর্য ডুবেছে, কিন্তু বনভূমিতে আলো আছে তখনো, আকাশ নির্মল, স্বচ্ছ; পাখিরা কিচির মিচির করছে, তাজা ঘাস ঝকঝক করছে মরকতের দ্যুতিতে... আপনি অপেক্ষা করে রয়েছেন। ধীরে ধীরে অরণ্যের নিভৃত অঞ্চল আঁধার হয়ে আসে, সন্ধ্যাকাশের রক্তচ্ছটা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়ে যায় বনস্পতির মূলে ও কাণ্ডে, ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে যায় উঁচুতে আরো উঁচুতে, নিচু, প্রায় পত্রহীন শাখা থেকে ধীরে ধীরে উঠে যায় স্তব্ধ, তন্দ্রাতুর তরু-শীর্ষে... তারপর সব থেকে উঁচু শাখাগুলিও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে; নীলাভ লাল আকাশটা ঘন নীলে আচ্ছন্ন হয়। অরণ্যের সৌরভ তীব্র হয়ে ওঠে, সিক্ত মাটির আর উষ্ণতার একটু গন্ধ; পত পত করা বাতাসটা থেমে যায় আপনার পাশে। পাখিরা ঘুমোয় — সব একেবারে একসঙ্গে চট করে নয় — একে একে, তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী, প্রথমে থেমে যায় কলকণ্ঠ পাখিরা, কয়েক মিনিট পরে গায়ক পাখিরা, এবং তাদের পর থামে হলদে বান্টিং পাখি। বনভূমিতে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। তরুগুলি সব একটা প্রকাণ্ড কালোর আকৃতিতে

একাকার হয়ে যায়; ঘন নীল আকাশে প্রথম তারাগুলির ভীরু আত্মপ্রকাশ শুরু হয়। সব পাখিরা ঘুমিয়ে গেছে। শুধু রেডস্টার্ট আর ক্ষুদে নুথাচ পাখিগুলি তখনো ঘুমে জড়ানো কিচির মিচির শব্দ করে... তারপর তারাও স্তব্ধ হয়ে যায়। পীউইটের ডাকের শেষ প্রতিধ্বনি আমাদের মাথার ওপর ঊর্ধ্বে সাড়া জাগায়; দূরে কোথায় যেন ওরিওলের কান্নার বিষণ্ণ সুর বেজে ওঠে; তারপর—নাইটিঙ্গেলের প্রথম স্বর। দ্বিধার কম্পনে হৃদয় আপনার অবসন্ন, তখন হঠাৎ — আমার কথা কেবল শিকারীরাই বুঝবেন -- হঠাৎ সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে একটা অদ্ভুত কট্ কট্, শন্ শন্ শব্দ জাগে, দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনের সীমিত আবর্তনের শব্দ শোনা যায়, কাদাখোঁচা তার লম্বা ঠোঁটটি বাঁকিয়ে অন্ধকার একটি বার্চ গাছের পিছন থেকে অনায়াসে পাখা বিস্তার করে সোজা চলে আসে আপনার গুলিটি বুক পেতে নেবার জন্য।

এই হচ্ছে "দাঁড়িয়ে-শিকার"-এর মানে।

আমি তো ইয়েরমলাই-এর সঙ্গে বেরুলাম "দাঁড়িয়ে-শিকার" করতে। কিন্তু পাঠক আমাকে মার্জনা করবেন: গোড়াতে ইয়েরমলাই-এর পরিচয় দেওয়া দরকার।

প'য়তাল্লিশ বছরের একটি দীর্ঘ কৃশ ব্যক্তিকে মনে মনে কল্পনা করে নিন, তার নাকটি সরু আর লম্বা, কপাল সংকীর্ণ, কটা চোখ দুটি ছোটো, এক-মাথা খোঁচা খোঁচা চুল, আর বিদ্রূপে ভরা তার পুরু ঠোঁট দুটি। কি শীত কি গ্রীষ্ম, লোকটি পরে থাকত বিদেশী ছাঁটের একটি হলদে নানকিন কোট, তার কোমর বেষ্টন করে থাকত একটি বেড়; পাৎলুন ছিল তার নীল রঙের আর টুপিটা আস্ত্রাখানের। এক অপব্যয়ী জমিদার স্ফূর্তির ঝোঁকে টুপিটি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। তার কোমরের বেড়ে বাঁধা থাকত দুটি থলে, একটি সামনের দিকে, বেশ নিপুণ করে তা দুটি ভাগে বাঁধা, ওতে থাকত গুলি আর বারুদ; আর একটি থলে পেছনের দিকে, সেটিতে থাকত নিহত শিকার; আর তার অদ্ভুত, প্রায় অক্ষয় টুপি থেকে ইয়েরমলাই বার করত মুঠো পাকানোর জিনিস। শিকার বেচে তার যে পয়সা আসত তা দিয়ে সহজেই সে কার্তুজের বাক্স এবং বারুদের ফ্লাস্ক কিনে নিতে পারত; কিন্তু এ ধরনের কিছু কেনবার কথা সে একবার ভাবেওনি, পুরনো কায়দাতেই সে বন্দুক গাদত, আর তার নৈপুণ্য ছিল এমন যে গুলি ও বারুদ একটুও সে ফেলত

না বা গুলিতে বারুদে কখনো মিশিয়ে ফেলত না, তার এ নিপুণতা দর্শকদের প্রশংসা উদ্রেক করত। তার বন্দুকটা ছিল একনলা ফ্লিন্টলক, সেটার দোষ ছিল আর একটা, তাতে বিশ্রী মারাত্মক রকমে "ধাক্কা" লাগত শিকারীর দেহে। এই কারণেই ইয়েরমলাই-এর ডান গালটা বা গালের থেকে অনেকখানি বড়ো হয়ে ফুলে গিয়েছিল একেবারে স্থায়ীভাবে। এ রকম একটা বন্দুক দিয়ে সে যে কী করে গুলি করত কোনো কিছু, তা আবিষ্কার করা বুদ্ধিমানের কাজ— কিন্তু গুলি সে করত ঠিক। ভালেৎকা নামে তার একটা শিকারী কুকুরও ছিল, একেবারে অদ্ভুত অসাধারণ একটি জানোয়ার। ইয়েরমলাই তাকে কখনো খেতে দিত না। বলত, "আমি খাওয়াবো কুকুরকে! কেন, কুকুর চতুর জানোয়ার, সে তার নিজের খাবার নিজেই যোগাড় করে নেয়।" আর সত্যি বটে, ভালেৎকার অত্যন্ত রোগা শরীরটা দেখে নিতান্ত উদাসীন দর্শকও স্তম্ভিত না হয়ে পারত না, সে বেঁচে ছিল ঠিক এবং দীর্ঘ জীবন পেয়েছিল; আর শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও একবারও হারিয়ে যায়নি, একবারও তার প্রভুকে ছেড়ে চলে যাবার আগ্রহ দেখায়নি। একবার অবশ্য সে তার যৌবনকালে, প্রেমের পাল্লায় পড়ে দু'দিন অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু এ নির্বুদ্ধিতা তার থাকেনি বেশি দিন। ভালেৎকার সব থেকে বড়ো বিশেষত্ব ছিল দুনিয়ার সব কিছুতে একটা আশ্চর্য অনুদ্বিগ্ন অনাসক্তি... যাকে নিয়ে কথা বলছি সে যদি কুকুর না হত তবে তাকে আমি বলতুম "মোহমুক্ত"। সে সাধারণত বসত তার ছাঁটা ল্যাজটা গুটিয়ে, মাঝে মাঝে মুখ ভার করে থাকত আর শরীরের পেশীগুলি নড়াত, কিন্তু হাসত না সে কখনো। (কুকুরেরা যে হাসতে প্যারে এবং খুব সুন্দর মিষ্টি হাসি হাসতে পারে তা তো সুবিদিত।) অতি কুৎসিত দেখতে ছিল সে, কুঁড়ে চাকর-বাকররা তার চেহারা নিয়ে নির্মম ঠাট্টা বিদ্রূপ করবার সুযোগ ছাড়ত কদাচিৎ; কিন্তু এই সব হাসি ঠাট্টা এবং এমন কি চড় চাপড়ও ভালেৎকা সইত আশ্চর্য একটি উদাসীনতার সঙ্গে। রাঁধুনীদের কাছে সে ছিল এক বিশেষ মজাদার জিনিস, দুর্বল মুহূর্তে— আর এ দুর্বলতা কেবল কুকুরদেরই যে আছে তা নয়— যখনই সে রান্নাঘরের উষ্ণতায় এবং লালা ঝরানো গন্ধে লুব্ধ হয়ে তার ক্ষুধাতুর নাকটা ঢুকিয়ে দিত ভেজানো দোরের মধ্যে দিয়ে, তখনই সব রাঁধুনী সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ ফেলে চীৎকার করে, গালি পাড়তে পাড়তে তাকে তাড়া করে

বেড়াত। শিকার অনুসরণের সময় আশ্চর্য শক্তির পরিচয় সে দিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল, আর তার ঘ্রাণ-শক্তিটি ছিল ভালো; কিন্তু সামান্য আহত কোনো খরগোসকে দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলবার সুযোগ পেলে তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন লোপাট করে দিয়ে বেশ উপভোগ করে খেত চেটে পুটে, খেত সবুজ ঝোপের নিচে শীতল ছায়ায় ঘেরা কোনো একটি জায়গা বেছে নিয়ে, ইয়েরমলাই-এর কাছ থেকে বেশ ভালো রকম দূরত্ব বজায় রেখে, ইয়েরমলাই তখন তাকে জানা অজানা নানা ভাষায় গালি পাড়ছে।

ইয়েরমলাই-এর মনিব ছিলেন আমার একজন প্রতিবেশী, প্রাচীনপন্থী একজন জমিদার। প্রাচীনপন্থী জমিদাররা শিকার-টিকারের ধার ধারে না, ঘরে-পোষা মোরগই তাদের পছন্দ। কেবল বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, যেমন জন্মদিন কিংবা নামকরণের দিনে বা নির্বাচনের সময় প্রাচীনপন্থী জমিদারদের পাচকরা লেগে যায় কোনো লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখি কাটায়, রান্নায়; তারপর ঠিক কী করতে হবে না বুঝতে পেরে খাঁটি রুশদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা একেবারে ক্ষেপে যায়, পাখিগুলো দিয়ে এমন চমৎকার ব্যঞ্জন বানায় যে অতিথি অভ্যাগতরা সাজানো ডিশগুলো বেশ আগ্রহের সঙ্গে এবং মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, কিন্তু ক্বচিৎ ঠিক করতে পারে যে তা চেখে দেখবে কিনা। ইয়েরমলাই-এর ওপর হুকুম ছিল তার প্রভুর জন্য মাসে দুটি জোড়া করে বনমোরগ আর তিতির দিতে হবে। তারপর সে যথায় ইচ্ছা যেমন খুশি থাকতে পারে। কোনো রকম কাজের লোক নয় বলে তার আশা ওরা সবাই ছেড়ে দিয়েছে — ওকে তারা বলে একেবারে "হাড়-আলসে"। তাকে গুলি বা বারুদ অবশ্য দেওয়া হত না কিছুই, যে কারণে সে তার কুকুরকে খাওয়াত না, এ ক্ষেত্রেও তারা সেই একই নীতি পালন করে চলত। ইয়েরমলাই ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির লোক: পাখির মতো ভ্রূক্ষেপহীন, কথা বলতে ভালোবাসত, একটু কিম্ভূত ধরনের, আর চোখে তার একটা শূন্য দৃষ্টি, মদ খেতে ভয়ানক ভালোবাসত আর অনেকক্ষণ চুপচাপ করে বসে থাকতে পারত না একেবারে; চলত পা টেনে টেনে এবং এক দিক থেকে আর এক দিকে হেলে হেলে পড়ত; তবু এই ভাবে লেংচে লেংচে হেলেদুলে দিনে সে পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে যেত। অজস্র রকমের খেয়াল ছিল তার: রাত কাটাত জলাভূমিতে, কখনো বা গাছে চেপে,

ছাদের ওপর, কিংবা পুলের তলায়; একাধিকবার সে চিলে কোঠায়, গুদোমঘরে বা গোলাঘরে আটক পড়েছে; কখনো কখনো সে হারিয়ে ফেলত তার বন্দুক, তার কুকুরটাকে, তার অপরিহার্য সাজপোষাকগুলো; অনেকক্ষণ ধরে মারধোর খেত, কিন্তু তারপর আবার সর্বদাই বাড়ি ফিরে আসত কিছুক্ষণ পরে, জামাকাপড় পরনে, সঙ্গে কুকুরটা আর বন্দুক। তাকে ঠিক খোসমেজাজী বলা চলে না, কিন্তু সর্বদাই মনটাকে তার ধীর শান্ত দেখা যেত, সাধারণত তাকে মনে করা হত খাপছাড়া বলে। ভালো সঙ্গী পেলে আর বিশেষ করে মদ খেতে খেতে কথাবার্তা বলা ছিল ইয়েরমলাই-এর পছন্দ, কিন্তু বেশিক্ষণ সে তাতেও আটকে থাকত না, উঠে পড়ে চলে যেত কিছুক্ষণ পরেই। "বলি, যাচ্ছো কোন চুলোয়? বাইরে যে রাত নেমেছে।" "যাই একটু চাপ্‌লিনোয়।" "কিন্তু কেন? কিসে তোমাকে টেনে নিয়ে চলল সেই দশ মাইল দূরে চাপ্‌লিনোতে?" "সেখানে সফ্‌রোনের বাড়িতে থাকব আজ রাতটা।" "তা এখানেই থাকো না আজ রাতে।" "না, তা হয় না।" এই বলে তার ভালেৎকাকে সঙ্গে করে ইয়েরমলাই বেরিয়ে যেত অন্ধকার রাত্রিতে, হাঁটত বনের মধ্য দিয়ে খাল পেরিয়ে, তারপর চাষী সফ্‌রোন হয়ত দিত না জায়গা আর এমনও আশংকা আছে, সফ্‌রোন তাকে এক ঘুষি মেরে শিখিয়ে দিত: "সজ্জনদের বিরক্ত করতে নেই।" কিন্তু বসন্তকালে গভীর জলে মাছ ধরায়, খালি হাতে চিংড়ী মাছ ধরতে, গন্ধ শুঁকে শিকার খুঁজে বার করতে, ভারুই পাখি ফাঁদে ফেলতে, বাজ পাখিদের শিক্ষা দিতে, নানা বিচিত্র স্বরের নাইটিঙ্গেল ধরে আনতে ইয়েরমলাই-এর দক্ষতার কোনো জুড়ী ছিল না... একটা কাজ সে পারত না করতে, কুকুরকে শেখাতে পারত না; ততখানি ধৈর্য তার ছিল না। তার বউও ছিল একটি। সপ্তাহে একবার করে সে তাকে দেখতে যেত। স্ত্রী থাকত একটা হতচ্ছাড়া পোড়ো ছোটো কুটিরে, দিন এনে দিন খেয়ে বেঁচে থাকত কোনো রকমে, আজ গেলে কাল কী খাবে তার কোনো স্থিরতা ছিল না, সব দিক দিয়ে তার বরাত একেবারে শোচনীয়। ইয়েরমলাইকে দেখে মনে হত নিরুদ্যোগ ঢিলে ঢালা লোক, কিন্তু বউ-এর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল নির্মম কর্কশ; নিজের বাড়িতে সে ভারি কড়া আর ভয়ংকর, বউ বেচারী তাকে খুশি করার জন্য তটস্থ, সে চোখ তুলে তাকালে ভয়ে কাঁপে, তাকে ভদ্‌কা কিনে দিতে গিয়ে শেষ কপর্দকটুকুও খুইয়ে বসে,

তারপর স্টোভের ওপরে সম্রাটের মহিমায় সে যখন শুয়ে পড়ে আর বীরের ঘুম ঘুমোয় বউ তখন ভেড়ার লোমের কোট দিয়ে তাকে ঢেকে দেয় দাসীর মতো। একাধিকবার আমি নিজেই তার চোখে একটা অনিচ্ছাকৃত দুর্দান্ত বর্বর গোছের দৃষ্টি দেখে ফেলেছি, যখন সে দাঁত দিয়ে আহত একটি পাখিকে শেষ করে দেয় তখন তার মুখের অভিব্যক্তি আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু এক দিনের বেশি ইয়েরমলাই তার বাড়িতে কখনো থাকেনি, বাড়ির বাইরে সে আবার সেই চিরদিনের "ইয়েরমলকা", একশ মাইল ধরে লোকে তাকে ডাকত "ইয়েরমলকা" বলেই, মাঝে মাঝে সে নিজেও তাই বলত। একেবারে দীনতম গৃহদাস যে সেও এই ভবঘুরের থেকে নিজেকে উচ্চতর মনে করত আর বোধহয় ঠিক এই কারণেই তারা তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করত, চাষীরা গোড়ায় ফাঁকা অঞ্চলে খরগোসের মতো তাকে দৌড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে মজা পেত, কিন্তু তারপর তাকে ছেড়ে দিল ঈশ্বরের হাতে। যখন টের পেল যে সে একটু "কিম্ভূত" ধরনের তখন আর তাকে জ্বালাতন করত না, এমন কি একটু রুটিও দিত খেতে এবং তার সঙ্গে আলাপে বসত... এই লোককে সাকরেদ করে বেরুলাম শিকারে; ওকে সঙ্গে করেই ইসতার তীরে মস্ত এক বার্চ বনে গেলুম "দাঁড়িয়ে-শিকার" করতে।

ভোলগার মতোই রাশিয়ায় বহু নদী আছে যার এক কূল এবড়ো খেবড়ো এবং খাড়া, অন্য তীর বাঁধা সমতল প্রান্তরে; ইসতা ঠিক এই রকম। ছোটো এই নদীর বাঁকগুলি ভারি খামখেয়ালী, সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে, পুরো আধা মাইলও গতি তার সোজা নয়, কোনো কোনো জায়গায়, আকস্মিক একটা ঢালুর মাথায় দাঁড়ালে দশ মাইল দূরেও নদীর গতিপথ দেখা যায়, দেখা যায় বাঁধ, দেখা যায় গাড়া, স্রোতে টানা মিল, পারের বাগিচাগুলি, দেখা যায় তীরভূমি আটকে আছে উইলোর ঝাড়ে, দেখা যায় ঘন ফল বাগানগুলি। ইসতায় মাছ আছে অজস্র, অসংখ্য; বিশেষ করে রোচ বা শোল মাছ (গ্রীষ্মকালে চাষীরা ঝোপঝাড়ের তলায় শুধু হাতে ধরে এই মাছ), খটখটে নদীতটে রেখা এঁকে যায় স্বচ্ছ শীতল স্রোতধারা, তার ওপর দিয়ে ছোটো কাদাখোঁচারা শিস দিতে দিতে ডানা ঝট্পটিয়ে উড়ে যায়, বুনো হাঁসেরা গাড়ার মাঝখানে ডুব দেয়, চতুর্দিকে তাকায় সতর্কভাবে, উদ্গত হয়ে ঝুলে পড়া উঁচু পাহাড়ের আড়ালে ছায়ার মাঝে দাঁড়িয়ে ওঠে বকেরা... আমরা

লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম প্রায় এক ঘণ্টা, দু'জোড়া বুনো কাদাখোঁচা মারলুম, তারপর সকাল বেলা সূর্যোদয়ের সময় আবার ভাগ্য পরীক্ষা করব ঠিক করেছি যখন ("দাঁড়িয়ে-শিকার" প্রত্যুষেও করা চলে), তখন এটাও স্থির করে ফেললাম যে রাতটা কাটাব একেবারে সামনের মিলে। বন থেকে বেরিয়ে ঢালু বেয়ে নেমে এলাম। নিচে বইছে নদীর গভীর নীল জল, রাত্রির কুয়াশায় বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। দুয়ারে করাঘাত করলুম। উঠোনে কুকুরগুলো ডাকাডাকি লাগিয়ে দিল।

ঘুম-জড়ানো ভাঙা গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আমরা শিকারী; রাতটা আমাদের থাকতে দাও।" কোনো জবাব এল না। "আমরা পয়সা দেব।"

"গিয়ে কর্তাকে বলছি। শ্‌শ্‌! কুকুর না আপদ! যা যা, গোল্লায় যা!"

মজুরটি ঢুকল কুটিরে, আমরা শুনতে লাগলাম; ফিরে এল সে শীগ্‌গিরই। বলল, "না। কর্তা বললেন আপনাদের ভেতরে যেন না আনি।"

"নয় কেন?"

"উনি ভয় পেয়েছেন; আপনারা হলেন শিকারী, যদি মিলে আগুন লাগিয়ে দেন, আর আপনাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র তো আছেই।"

"কী যে সব বাজে কথা!"

"গত বছর এই ভাবেই আমাদের মিলে আগুন লেগেছিল; কয়েকজন মাছের ব্যাপারী এখানে ছিল রাতে, তারা কোনো একটা কায়দায় ওতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়।"

"কিন্তু বন্ধু, খোলা আকাশের নিচে তো আমরা ঘুমুতে পারি না।"

"সে আপনারা বুঝবেন।" চলে গেল সে, হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তার বুটজুতো খট্‌ খট্‌ করে চলল।

"ভবিষ্যতে অনেক বেকায়দায় ওকে পড়তে হবে," এমনি শাসানি দিয়ে ইয়েরমলাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল অবশেষে, "চলুন গ্রামে যাই।" কিন্তু গ্রাম যে দু' মাইল দূরে।

আমি বললাম, "এসো, এখানেই রাত কাটাই, খোলা আকাশের নিচে — রাতটা বেশ গরম; পয়সা দিলে যাঁতাদার কিছু খড় আমাদের দেবেই।"

কোনো কথাবার্তা না বলে রাজী হয়ে গেল ইয়েরমলাই। আবার গিয়ে আমরা দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম।

সেই মজুরটির গলা শোনা গেল আবার, "এই যে, কী চাই আবার? বললুম যে হবে না।"

কী চাই সেটি বুঝিয়ে বললাম তাকে। গৃহকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চলে গেল সে, তারপর তাঁকে নিয়ে আবার এল। পাশের ছোটো গেটটা ক্রীক ক্রীক করে উঠল। যাঁতাদার এল, লোকটি লম্বা, মুখ মোটা, ঘাড়খানা ষাঁড়ের মতো, পেটটি গোল, সব মিলিয়ে অতি স্থূল। আমার প্রস্তাবে রাজী হল সে। মিল থেকে একশ পা দূরে ছোটো একটা বার-বাড়ি, তার চারদিক খোলামেলা। আমাদের জন্য সেখানে তারা নিয়ে এল খড়কুটো, নদীর কাছে ঘাসের ওপর একটি সামোভার রাখল মজুরটি, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে কসে কসে ফুঁ দিতে লাগল। নিভু নিভু কয়লা লাল গনগনে হয়ে উঠল, আর সে আলোয় তার তরুণ মুখখানা উজ্জ্বল করে তুলল। যাঁতাদার চলে গেল তার বউকে ডেকে তুলতে, তারপর কথা পাড়ল শেষটায় যে, আমার ঘুমোনো উচিত কুটিরের মধ্যেই; কিন্তু আমি খোলা আকাশের নিচেই থাকতে চাইলাম। যাঁতাদারের বউ আমাদের দুধ, ডিম, আলু আর রুটি এনে দিল। অনতিবিলম্বে সামোভার ফুটে উঠল আর চা খেতে লেগে গেলাম আমরা। নদীর থেকে উঠে এল কুয়াশা; হাওয়া নেই; চারিদিক থেকে আসছে কর্ণ-ক্রেকের ডাক, আর মিলের চাকা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জলের শব্দ, প্যাডল থেকে টপ টপ্ করে পড়ছে ফোঁটাগুলি, আর শব্দ পাওয়া যায় জলের, কব্জার দাঁড়গুলোর মধ্য দিয়ে গল গল করে জল চলছে তার শব্দ। মাটিতে একটু আগুন জ্বালিয়ে নিলাম। জ্বলন্ত কয়লায় আলু পুড়িয়ে চলেছে ইয়েরমলাই, একটু তন্দ্রা এল আমার। কাছে একটা সযত্নে চাপা ফিসফিসানিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মাথা তুললাম, আগুনের সামনে একটা টব উল্টে, তাতে বসেছে যাঁতাদারের বউ আর গল্প করছে আমার শিকারী সাকরেদের সঙ্গে। তার পোষাক, তার চলা-ফেরা, তার কথা বলার ধরন দেখে আমি ইতিমধ্যেই বুঝেছিলাম যে, সে গৃহকর্ম করেছে, সে কৃষকও নয় শহরের মানুষও নয়; কিন্তু এই প্রথম আমি তার চেহারাটা দেখতে পেলুম স্পষ্ট। বয়স বছর ত্রিশেক হবে, পাতলা মলিন মুখে এখনো আশ্চর্য সৌন্দর্যের আভাস লেগে

আছে, বিশেষ করে আমাকে যা মুগ্ধ করল সে হচ্ছে তার চোখ, চোখ দুটি তার বড়ো আর করুণ তার চাউনি। কনুই দুটি রেখেছে সে হাঁটুর ওপর, দু'হাতের ওপর মুখখানা। ইয়েরমলাই আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আগুনে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছিল।

যাঁতাদারের বউ বলছিল, "ঝেলতুখিনোয় আবার গো-মড়ক দেখা দিয়েছে। ফাদার ইভানের গোরু দুটো মরে গেছে — ঈশ্বর আমাদের দয়া করুন!"

একটু চুপ করে থেকে ইয়েরমলাই বলল, "আর তোমার শুয়োরগুলো কেমন আছে?"

"বেঁচে আছে।"

"একটা বাচ্চা শুয়োর আমাকে উপহার দেওয়া উচিত তোমার।"

এক মুহূর্ত নীরব রইল যাঁতাদারের বউ, তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস। জিজ্ঞেস করল, "তোমার সঙ্গে উনি কে?"

"কস্তমারভোর এক ভদ্রলোক।"

ইয়েরমলাই কয়েক ফালি সরু পাইন কাঠ ফেলে দিল আগুনে; সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল তাতে, তার মুখে এসে লাগল শাদা ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী।

"তোমার স্বামী আমাদের ঘরে ঠাঁই দিল না কেন?"

"ভয় পেয়েছে।"

"ভয়! মোটকা বুড়ো! আরীনা তিমোফেয়েভনা, লক্ষ্মীটি, ছোটো এক গেলাস মদ এনে দাও!"

যাঁতাদারের বউ উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। গুন গুন করে গান গাইতে লাগল ইয়েরমলাই:

আমার জুতো গিয়েছে ছিঁড়ে...
প্রেয়সীকে দেখতে গিয়ে

ছোটো একটা ফ্লাস্ক এবং গেলাস হাতে করে ফিরে এল আরীনা। ইয়েরমলাই উঠে দাঁড়াল, বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, তারপর সবটা গিলে ফেলল এক চুমুকে। বলল কেবল, "বা!"

যাঁতাদারের বউ আবার বসল টবের ওপর।

"আচ্ছা আরীনা তিমফেয়েভনা, এখনো কি অসুখ তোমার?"

"হ্যাঁ।"

কী অসুখ?"

"রাত্রে কাশির বড়ো যন্ত্রণা।"

অল্প একটু চুপ থেকে ইয়েরমলাই বলে উঠল, "ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হচ্ছে। আরীনা! ডাক্তারের কাছে যেও না তুমি; গেলে আরো খারাপ হবে।"

"যাচ্ছি না তো।"

"আমার কাছে এসো কিন্তু।"

বিমর্ষভাবে মাথা নিচু করল আরীনা।

ইয়েরমলাই বলে চলল, "আমি বউটাকে তাড়িয়ে দেব তখনকার মতো। কথা দিচ্ছি, দেব তাড়িয়ে।"

"ইয়েরমলাই পেত্রোভিচ, ভদ্রলোককে এবার তুলে দিলে হয়; দেখ, আলু পোড়া হয়ে গেছে।"

আমার বিশ্বস্ত অনুচরটি ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, "ওঁকে নাক ডাকতে দাও; হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই ঘুমুচ্ছেন গভীর ঘুমে।"

খড়ের ওপর আমি পাশ ফিরলাম। ইয়েরমলাই উঠে আমার কাছে এসে বলল, "আলু তৈরি হয়ে গেছে; উঠে এসে খাবেন নাকি?"

বার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম; যাঁতাদারের বউ টব থেকে উঠে চলে যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে বললুম, "মিলটা কি অনেক দিন থেকে আছে?"

"আমি এখানে এসেছি ট্রিনিটির দিনে, তারপর দু'বছর হয়ে গেল।"

"তোমার স্বামী কোন জায়গার লোক?"

আরীনা বুঝতে পারল না আমার প্রশ্নটা।

ইয়েরমলাই গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার স্বামী এসেছে কোথা থেকে?"

"বেলেভ থেকে। উনি বেলেভ শহরের লোক।"

"তুমিও কি বেলেভের?"

"না, আমি ভূমিদাসী, চাকরাণী ছিলাম আমি।"

"কার?"

"আমার মালিক ছিলেন জ্ভেরকোভ। এখন আমি স্বাধীন।"

"কোন জ্ভেরকোভ?"

"আলেক্সান্দ্র সিলীচ।"

"তুমি তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা ছিলে না?"

"হ্যাঁ। আপনি জানলেন কী করে?"

আরীনার দিকে চতুর্গুণ কৌতূহল আর সহানুভূতি নিয়ে তাকালাম। বললাম, "তোমার মনিবকে চিনি আমি।"

নিচু গলায় সে বলল, "চেনেন?" তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল।

আরীনার প্রতি আমার এত সহানুভূতি কেন সেটা বলতে হয় পাঠকের কাছে। পিটার্সবুর্গে থাকা কালে আকস্মিকভাবে আমার সঙ্গে মিঃ জ্ভেরকোভের পরিচয় ঘটে। বেশ কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁর ছিল বটে, বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত বলে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্থূলাঙ্গী, ন্যাকা, কাঁদুনে এবং হিংসুটে — অতি সাধারণ ও অপ্রিয় একটি মহিলা: একটি পুত্রও আছে তাঁর, আধুনিক উদ্ধত তরুণবাবু বলতে যা বোঝায় একেবারে ঠিক তাই, আদুরে এবং মূর্খ। বাইরে থেকে মিঃ জ্ভেরকোভের চেহারাটা এমন ছিল যে কারু প্রীতি তিনি অর্জন করতে পারতেন না। প্রশস্ত প্রায় চৌকোনা মুখখানা তাঁর, ইঁদুরের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটি ধূর্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত; নাকটা বড়ো এবং চোখা, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত; কদম ছাঁট পাকা চুল কুঁচকে যাওয়া কপালের ওপর একেবারে বুরুশের মতো খাড়া হয়ে থাকত; পাতলা ঠোঁট দুটি তাঁর সর্বদাই নড়তে থাকত আর তাতে লেগে থাকত এক টুকরো রুগ্ণ হাসি। ছোটো পা দুটো ফাঁক করে এবং চটচটে হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসতেন মিঃ জ্ভেরকোভ। একবার কেমন করে যেন শহর থেকে একই গাড়িতে চেপে আমাকে আসতে হয় মিঃ জ্ভেরকোভের সঙ্গে। কথাবার্তা শুরু হল। মিঃ জ্ভেরকোভ তো অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি, অতএব আমাকে তিনি "সত্যের পথে" চালনা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত নাকিয়ে তিনি বললেন, "কথা বলতে চাই আপনাকে

কয়েকটা; আপনারা তরুণরা সব ব্যাপারে এমন চট চট করে সমালোচনা করেন এবং রায় দিয়ে বসেন; নিজের দেশ সম্বন্ধে আপনাদের জ্ঞান অল্পই; যুবক, আপনাদের কাছে রাশিয়া একটি অজানা দেশ; এই হচ্ছে ব্যাপারটা!... আপনারা বরাবর জার্মানই পড়ে যাচ্ছেন। যেমন ধরুন, এখন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে এ কথা সে কথা বলে বসেন। যেমন, গৃহদাসদের সম্পর্কে... চমৎকার, খুব চমৎকার সব কথা, আমি তাতে দ্বিমত প্রকাশ করব না, কিন্তু ওদের আপনারা চেনেন না; কী রকম লোক ওরা তা জানেন না আপনারা।" (জোরে নাক ঝাড়লেন মিঃ জ্‌ভেরকোভ, তারপর নস্যি নিলেন এক টিপ।) "দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি ছোটো কাহিনী বলি আপনাকে; আপনার কৌতূহল জাগাতে পারে।" (মিঃ জ্‌ভেরকোভ গলা খাঁকারি দিলেন।) "আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার স্ত্রীটি কী; আমার মনে হয়, ওর থেকে সহৃদয়া মহিলা খুঁজে পাওয়া শক্ত, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন। তাঁর পরিচারিকারা তো যেন থাকে একেবারে স্বর্গে, তাতে কোনো ভুল নেই ... কিন্তু পরিচারিকাদের বিয়ে হয়ে গেলে তাদের আর রাখেন না তিনি, এই তাঁর নিয়ম। রাখা চলে না; ছেলেমেয়ে হয় — আরো কত কি ব্যাপার — তখন যেমন উচিত তেমন করে আর কর্ত্রীর সেবা পরিচারিকা করবে কী করে, কেমন করে তাঁর কাজে খাপ খাইয়ে নেবে; তা সে পারে না; তার মন তখন অন্য দিকে। মানবিক প্রকৃতি বিচার করেই সব জিনিস দেখতে হয়। হ্যাঁ, একবার আমরা গাড়ি চেপে যাচ্ছিলাম আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে, সে প্রায় — আচ্ছা ঠিক হিসেব করে নিই — হ্যাঁ, পনেরো বছর আগে। গোমস্তার বাড়িতে দেখলুম একটি তরুণী মেয়ে, তারই কন্যা, আর বাস্তবিক, ভারি সুন্দর; তার চালচলনে — বুঝলেন — ভালো পরিচারিকার ছাপ। আমার স্ত্রী বললেন, 'কোকো' — ওই নামে, বুঝলেন, তিনি আমাকে ডাকতেন — 'এই মেয়েটিকে চলো পিটার্সবুর্গে নিয়ে যাই; আমার ওকে পছন্দ, কোকো...' আমি বললাম 'নিশ্চয় নিশ্চয়, চলো নিয়ে যাই ওকে।' গোমস্তা তো আমাদের পায়েই পড়ে এসে; এমন সৌভাগ্য সে আশাও করতে পারেনি, বুঝতেই পারছেন... হুঁ, তারপর, মেয়েটা অবশ্য অবুঝের মতো কাঁদল খানিক। অবশ্য, প্রথম দিকে তার পক্ষে ব্যাপারটা কঠোরই ছিল; মা-বাবার বাড়ি... মানে ঐ সব আর কি... ওতে অবাক হবার ছিল না কিছু। যাই হোক, শীগ্‌গিরই আমাদের

সঙ্গ তার অভ্যস্ত হয়ে গেল: গোড়াতে তাকে আমরা রেখেছিলাম ঝিদের ঘরে; ও'রা অবশ্য ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর জানেন? মেয়েটার আশ্চর্য উন্নতি হল, আমার স্ত্রী তো প্রায় তার ভক্ত হয়ে উঠলেন, আর সবাইকে ডিঙিয়ে অবশেষে তাকেই তাঁর খাস পরিচারিকা করে নিলেন ... বুঝুন! আর ন্যায্যত তার সম্পর্কে এ কথা মানতেই হয়, এমন একটি ঝি আমার স্ত্রীর আর ছিল না, কখনো ছিল না বাস্তবিক; মেয়েটা ছিল মনোযোগী, বিনয়ী এবং বাধ্য — মানে যা কিছু কাম্য তার সে সব গুণই ছিল। আমার স্ত্রী তার প্রতি খুব সদয় ছিলেন; আর এ কথাও বলতে হবে, তিনি তাকে একটু বিগড়েও দিয়েছিলেন; ভালো সাজপোষাক পরাতেন তাকে, নিজের টেবিল থেকেই তাকে খেতে দিতেন, চা দিতেন, আরো কত কি, — সে আপনি কল্পনা করতেই পারেন! এমনি করে দশ বছর হবে সে আমার স্ত্রীর পরিচর্যা করেছে। অকস্মাৎ একদিন, বুঝুন কাণ্ডটা, আরীনা — ওর নাম ছিল আরীনা — না বলে-কয়ে আমার পড়ার ঘরে ঢুকল দৌড়ে এবং আমার পায়ে পড়ল হুমড়ি খেয়ে। আর সোজা বলছি মশাই আপনাকে, এ সব ব্যাপার আমি একেবারে সহ্য করতে পারিনে। কোনো মানুষেরই তার মর্যাদা হারানো উচিত নয়। ঠিক বলিনি? আমি বললুম, 'কী চাই?' 'হুজুর, আলেক্সান্দ্র সিলীচ, আপনার কাছে একটি অনুগ্রহ চাই।' 'কী অনুগ্রহ?' 'আমাকে বিয়ে করতে অনুমতি দিন।' স্বীকার করতেই হবে, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বললুম, 'কিন্তু তুমি তো জানো, বোকা মেয়ে, তোমার কর্ত্রীর আর কোনো খাস চাকরাণী নেই।' 'কেন আগের মতোই আমি তাঁর পরিচর্যা করব।' 'বাজে বকো না! যত বাজে কথা! তোমার কর্ত্রী বিবাহিতা ঝিদের বরদাস্ত করতে পারেন না।' 'তাহলে মালানিয়া আমার জায়গায় কাজ করবে।' 'তর্ক কোরো না আমার সঙ্গে।' 'আপনার কথাই মানব।' রীতিমত একটা ধাক্কা খেলাম বলতেই হবে। আমি ঐ রকম বটে, বুঝলেন; জানেন, কৃতঘ্নতার মতো অন্য কোনো কিছুতে আমার তেমন জোর আঘাত লাগে না — অন্য কিছুতে না। আমার স্ত্রী যে কী সে কথা আর বলে দিতে হবে না—সে তো আপনিই জানেন—আমার স্ত্রী: মূর্তিমতী দেবকন্যা, অশেষ তাঁর গুণাবলী। এমন কি নিকৃষ্টতম লোকও তাঁকে ব্যথা দিতে লজ্জিত হবে, সেটা যে কেউ ভেবে নিতে পারে। যাই হোক, আমি আরীনাকে ছাড়িয়ে

দিলাম। ভাবলুম ওর কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসবে; জানেন, কোনো লোকের মধ্যে দুষ্ট কলুষিত কৃতঘ্নতা থাকতে পারে বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক ছিলাম আমি। আপনি কী মনে করেন? ছয় মাসের মধ্যে একই অনুরোধ নিয়ে ও আমার কাছে আবার আসবার কথা ভাবতে পারল। স্বীকার করছি এবার আমি রেগে গিয়ে ভাগিয়ে দিলুম তাকে, আমার স্ত্রীকে সব বলে দেব বলে ভয় দেখালুম। ভয়ানক বিরক্ত লাগল। কিছু পরে, কল্পনা করুন, আমি কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আমার স্ত্রী এলেন চোখে জল নিয়ে, তখন তিনি এত উত্তেজিত যে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। 'কী হয়েছে?' 'আরীনা ... বুঝেছো ... বলতে আমার লজ্জা হয়।' 'অসম্ভব! কিন্তু লোকটি কে?' 'পেত্রুশ্‌কা, তোমার পেয়াদা।' আমার বিরক্তি ফেটে পড়ে এবার। আমার ধাতই ওই রকম। আধ-খ্যাঁচড়া কাজ আমি পছন্দ করিনে পেত্রুশ্‌কো — কিন্তু, তার কোনো দোষ নেই। আমরা চাব্‌কাতে পারতুম ওকে, কিন্তু আমার মতে দোষ তার নয়। আরীনা... হুঁ, হুঁ! আর বেশি কিছু বলতে হবে? হুকুম দিয়ে দিলাম সোজা, আরীনার চুল কেটে দিয়ে মোটা চটের কাপড় পরিয়ে দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে আসা হোক গ্রামে। আমার স্ত্রী চমৎকার একটি পরিচারিকা হারালেন, কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না; ঘর সংসারে তো আর ব্যভিচার বরদাস্ত করা চলে না কোনো প্রকারেই। ভ্রষ্ট মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে ছেঁটে বাদ দিয়ে ফেলাই ভালো। বেশ, তাহলে! আপনি এবার নিজেই বিচার করে দেখতে পারেন — জানেন তো আমার স্ত্রীকে ... তিনি ... হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! বাস্তবিক... একটি দেবকন্যা! আরীনার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, আরীনা তা জানত, আর তার কিনা এমন আস্পর্ধা হল যে, ... অ্যাঁ? না, বলুন আপনি ... অ্যাঁ? এ সব কথা বলে আর ফলই বা কি। সে যা হোক, আর কোনো উপায় ছিল না। আমি, বাস্তবিক, আমিই বিশেষ করে আহত বোধ করলুম, মেয়েটার অকৃতজ্ঞতায় দীর্ঘকাল মনে কষ্ট পেলুম। আপনি যাই বলুন — এ সব লোকের মধ্যে হৃদয়ের সন্ধান করে, সংবেদনার সন্ধান করে কোনো লাভ নেই! খুশিমত নেকড়ে বাঘকে খাওয়াতে পারেন, কিন্তু তার লোভটা থাকে বরাবর বনের দিকে। শিক্ষাটা আমাদের হল ভালোই! কিন্তু আমি আপনার সামনে একটা দৃষ্টান্ত মাত্র তুলে ধরতে চেয়েছি ...”

মিঃ জ্ভেরকোভ তাঁর কথাটা অসমাপ্ত রেখেই, মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন, এবং বেশ করে পোষাকটি এ'টে গায়ে জড়িয়ে, তাঁর অনিচ্ছাকৃত আবেগ পুরুষ মানুষের মতো দমন করলেন।

এবারে বোধহয় পাঠক বুঝতে পারছেন কেন আরীনার দিকে আমি সাগ্রহ সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়েছিলাম।

অবশেষে আমি জিজ্ঞেস করলুম তাকে, "তোমার কি যাঁতাদারের সঙ্গে অনেক দিন হল বিয়ে হয়েছে?"

"দু'বছর।"

"কী করে হল? হতে দিলেন তোমার মনিব?"

"তাঁরা টাকা দিয়ে আমার স্বাধীনতা আদায় করে দিয়েছেন।"

"কারা?"

"সাভেলী আলেক্সেয়েভিচ।"

"কে সে?"

"আমার স্বামী।" (ইয়েরমলাই হাসল আপন মনে।) একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আরীনা বলল, "আমার মনিব বোধহয় বলেছেন আপনাকে আমার কথা?"

তার প্রশ্নের কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারলুম না।

দূর থেকে যাঁতাদার ডেকে উঠল, "আরীনা!" উঠে সে চলে গেল।

ইয়েরমলাইকে জিজ্ঞেস করলুম, "ওর স্বামী বেশ ভালো লোক?"

"এই আর কি।"

"ছেলেপুলে আছে ওদের?"

"একটি ছিল, মরে গেছে।"

"আচ্ছা কি করে ঘটল ব্যাপারটা? ওকে কি যাঁতাদারের বেশ পছন্দ হয়েছিল? ওর মুক্তি কিনে নেবার জন্য সে কি অনেক দিয়েছে?"

"জানিনে। ও লিখতে পড়তে জানে: ওদের কারবারে সেটা দরকার। মনে হয় ওকে ওর স্বামীর পছন্দ হয়েছিল।"

"আর তুমি কি ওকে অনেক দিন থেকে জানো?"

"হ্যাঁ। আমি ওর মনিবের বাড়ি যেতুম। তাঁদের বাড়ি এখান থেকে দূর নয় বেশি।"

"পেয়াদা পেত্রুশ্কাকে চেনো তুমি?"

"পিওতর ভাসিলিয়েভিচের কথা বলছেন? নিশ্চয়, চিনি তাকে।"

"এখন সে কোথায়?"

"তাকে সৈন্য করে পাঠানো হয়েছিল।"

একটুক্ষণ আমরা নীরব।

শেষে ইয়েরমলাইকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওকে দেখে তো সুস্থ মনে হয় না।"

"আমারও মনে হয় না! জানেন, আগামী কাল বেশ ভালো শিকার হবে মনে হচ্ছে। এবারে একটু ঘুমুলে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।"

এক ঝাঁক বুনো হাঁস শন শন করে উড়ে চলে গেল আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, অনতিদূরে নদীর বুকে তারা পড়ল ঝপ্ করে, শুনতে পেলাম। অন্ধকার এতক্ষণে নিবিড় হয়ে এসেছে, ঠান্ডা হতে শুরু করল, ঝোপের মধ্যে বেজে চলল নাইটিঙ্গেলের সুমধুর গীতধ্বনি। খড়ের গাদায় গা ডুবিয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাস্পবেরি ঝরণা

আগস্ট মাসের গোড়াতে গরমটা প্রায়ই অসহ্য হয়ে ওঠে। এ ঋতুতে বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত এমন কি সব থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উৎসাহী শিকারীও শিকারে সমর্থ হয় না; সব থেকে বাধ্য অনুরক্ত কুকুর "প্রভুর রেকাব পরিষ্কার" করতে থাকে, অর্থাৎ প্রভুর পায়ে পায়ে অনুসরণ করতে থাকে, কষ্টে তার চোখ মিট মিট করে, তার জিব একেবারে অতিরিক্ত লম্বা হয়ে ঝোলে; প্রভুর তিরস্কারে খুব বাধ্য বিনীতভাবে ল্যাজ নাড়ায় এবং মুখের 'পরে ফুটিয়ে তোলে একটি বিভ্রান্তভাব; কিন্তু ছুটে এগিয়ে যায় না। ঠিক এমনি একটি দিনে আমি শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ছায়ায় কোথাও অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও শুয়ে পড়ার লোভ লাগছিল অনেকক্ষণ থেকে, লোভ সংযত করছিলাম; অনেকক্ষণ ধরে আমার অক্লান্ত কুকুরটা ঝোপে ঝাড়ে ছুটোছুটি করছিল, যদিও এই চাঞ্চল্য থেকে কিছু লাভ হতে পারে এমন আশা সে নিজেও করেনি। দম বন্ধ করে দেয় এমন গরম, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলুম কি করে আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা বজায় রাখা যায় তাই ভাবতে। কোনো রকমে এলুম ছোটো ইস্‌তা নদীর কাছে, ইস্‌তা তো পূর্বেই আমার সহৃদয় পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে, নদীর খাড়া পার বেয়ে নামলুম, তারপর ভেজা, হলুদ রঙের বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চললুম সেই ঝরণাটির দিকে, সারা তল্লাটে যা রাস্পবেরি ঝরণা নামে পরিচিত। ঝরণাটির নির্গম হয়েছে নদীতীরের একটি চিড় থেকে, তারপর ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে গেছে একটি ছোটো অথচ গভীর নালায়, বিশ পা ছাড়িয়ে ঝরণাটি চঞ্চল কুলুকুলু ধ্বনি বয়ে নিয়ে গিয়ে পড়ছে নদীতে। স্রোতের খাতের ঢালু প্রাচীরগাত্র জুড়ে রয়েছে তরুণ ওক গাছগুলি, ছোটো

মখমলের মতো ঘাস উৎস মুখটাতে সবুজ, শীতল রুপোলী জলধারায় সূর্যের রশ্মি গিয়ে প্রায় পৌঁছোয়ই না। ঝরণাটি পর্যন্ত এগিয়ে এলাম; বার্চ কাঠে তৈরি একটি কাপ পড়ে রয়েছে ঘাসের ওপর, সাধারণের উপকারের জন্য পথ চলতি কোনো একজন কৃষক ওটি রেখে গেছে। তৃষ্ণা মিটিয়ে ছায়ায় শুয়ে পড়লাম, তাকালাম চতুর্দিকে। নদীতে গিয়ে পড়বার পথে নির্ঝরের প্রবাহটি একটি ছোটো গুহা তৈরি করে দিয়েছে, তাতে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে রয়েছে ক্ষুদ্র তরঙ্গ চিহ্নগুলি, সেই গুহায় বসেছিল দুটি বৃদ্ধ, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। একজন বেশ মোটাসোটা লম্বা, গায়ে তার গাঢ় সবুজ রঙের কোট, মাথায় পশমের টুপি, সে মাছ ধরছিল; অন্যটি বেঁটে ও রোগা, তার গায়ে ছিল তালি দেওয়া তুলোর মোটা কোট, মাথায় টুপি নেই; তার হাঁটুর ওপরে ধরে দাঁড় করানো ছোটো একটি পাত্রে ভর্তি পোকা, মাঝে মাঝে সে হাতখানা ক্ষুদ্র ধূসর মাথা পর্যন্ত তুলে ধরছিল, যেন সূর্যতাপ থেকে মাথা বাঁচাতে চাইছে। তার দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়ে তাকালাম, চিনলাম সে শুমিখিনোর স্তিওপুশ্‌কা। লোকটির পরিচয় দেবার জন্য একটু সময় চাচ্ছি পাঠকের কাছে।

আমার বাসস্থানের কয়েক মাইল দূরে বড়ো একটি গ্রাম, তার নাম শুমিখিনো, তাতে পাথরে গড়া এক গির্জা আছে, গির্জাটি নির্মাণ করা হয়েছিল সেণ্ট কজমা এবং সেণ্ট দামিয়ানের নামে। এককালে এই গির্জার মুখোমুখি ছিল একটা প্রকাণ্ড, জমকালো জমিদারের বাড়ি, চতুর্দিকে তার নানাবিধ ঘর-বাড়ি, অফিস দপ্তর, কারখানা, আস্তাবল, গাড়িঘর, স্নানঘর এবং অস্থায়ী রান্নাঘর, অভ্যাগত ও পেয়াদাদের জন্য বহু পার্শ্বগৃহ, সবজি-ঘর, লোকজনের জন্য দোলনা এবং এমনি আরো কমবেশি প্রয়োজনের নানা ইমারত। ধনী জমিদারদের একটি পরিবার বাস করত এই বাড়িতে, সবকিছু তাদের চলছিল ভালো, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সমস্ত ঐশ্বর্য পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মালিকরা চলে গেল অন্য বাড়িতে; শূন্য হয়ে গেল জায়গাটা। বিশাল বাড়িটার কালো হয়ে পুড়ে যাওয়া জায়গাটা পরিণত হল এক সবজি বাগানে, এখানে সেখানে পুরনো বাড়িঘরগুলির ভস্মাবশেষ, ইঁটের গাদিতে তা আকীর্ণ। আগুনের গ্রাস থেকে কোনো ক্রমে বাঁচা কড়িকাঠগুলো দিয়ে একটা ছোটো কুঁড়েঘর কোনো রকমে আনাড়িভাবে দাঁড় করানো হয়েছিল;

তার ছাদ গড়া হয়েছিল দশ বছর আগে কেনা কাঠ দিয়ে, গথিক ধরনে একটি পটমন্ডপ নির্মাণের জন্য এই কাঠ কেনা হয়েছিল; এই ঘরে স্থান দেওয়া হল মালী মিত্রফান, তার স্ত্রী আক্সিনিয়া এবং তাদের সাতটি ছেলেমেয়েকে। মিত্রফানকে হুকুম দেওয়া হল মনিবের খানার জন্য টাটকা সবজি ও বাগানের অন্যান্য জিনিসপত্র পেশছে দিতে হবে দেড়'শ মাইল দূরে; আক্সিনিয়ার ওপর ভার দেওয়া হল বেশি দামে মস্কোয় কেনা তিরোলি একটি গাভীর, কিন্তু গোরুটি বাচ্চা দিল না, তাই কেনার পর থেকে এক ফোঁটা দুধ পাওয়া যায়নি; আক্সিনিয়ার হাতে শেষ "অভিজাত" একটি পাখি, ঝুঁটি-মাথা একটা ধূসরবর্ণের পাতিহাঁসও রেখে যাওয়া হল; বয়স কম, — এই বিবেচনায় ছেলেমেয়েগুলির উপর বিশেষ কোনো দায়িত্বভার দেওয়া হয়নি, যার ফলে অবশ্য একেবারে কুঁড়ে হয়ে উঠতে তাদের কোনো বাধা হয়নি। দু'দুবার সেই মালীর বাড়িতে আমার রাত কাটাতে হয়েছিল, আর যখনি আমি গেছি সে পথ দিয়ে তখনি তার কাছ থেকে শশা পেয়েছি, শশাগুলি, কেন জানি না, গ্রীষ্মকালেও অদ্ভুত বড়ো, আর তাদের বিশেষত্ব হচ্ছে একটা তুচ্ছ জোলো গন্ধ আর পুরু হলদে খোসা। সেখানেই আমি প্রথম দেখি স্তিওপুশ্কাকে। মিত্রফান ও তার পরিবার আর একচোখো সৈনিকের বিধবার ছোটো ঘরখানিতে খয়রাতীর ওপর বেঁচে রয়েছে যে কালা বুড়ো গির্জাপ্রহরী, সে ছাড়া শুমিখিনোতে আর কোনো গৃহদাস থেকে যায়নি। স্তিওপুশ্কা, যাকে আমি প্রাঠকের কাছে পরিচিত করে দিতে চাই, তাকে ঠিক গৃহদাসদের বিশেষ সংজ্ঞাতে ফেলা যায় না, এমন কি আদৌ "মানুষ" এই সংজ্ঞায়ও প্রায় ফেলা চলে না।

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু একটা স্থান সমাজে আছে, অন্তত যেমন তেমন কিছু বন্ধন থাকে; প্রত্যেকটি গৃহদাস, মজুরি না পেলেও অন্তত তথাকথিত কিছু "রেশন" পেয়ে থাকে। কিন্তু স্তিওপুশ্কার একেবারে কোনো রকম জীবিকা নির্বাহেরই উপায় ছিল না, ছিল না কারু সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তার; তার অস্তিত্বের কথাটাই কেউ জানত না। এই লোকটির কোনো অতীত পর্যন্ত ছিল না; তার সম্পর্কে কোনো কাহিনী কেউ বলেনি; নতুন করে লোকগণনার হিসাবে বোধহয় তাকে কখনো ধরাই হয়নি। আবছা একটা গুজব ছিল যে, কোনো এক কালে সে নাকি

কারু দাস ছিল; কিন্তু সে কে, এল কোথা থেকে, কে তার বাবা, শুমিখিনোর অধিবাসীদের একজন সে হল কেমন করে, কী ভাবে এসেছে তার ওই তুলোর মোটা কোটটা যা সে পরে আসছে স্মরণাতীত কাল ধরে, কোথায় সে থাকে, থাকে কী খেয়ে -- এই সব বিষয়ে কারু সামান্যতম ধারণাও ছিল না; আর সত্যি কথা বলতে কি, এ বিষয়ে কেউ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করত না। ঠাকুর্দা ত্রফিমীচ সমস্ত গৃহদাসদের বংশ পরিচয় জানতেন সটান চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত, তাকে অবশ্য একবার বলতে শোনা গিয়েছিল, স্তিওপুশ্‌কা যে একটি তুর্কী রমণীর সঙ্গে সম্পর্কিত এ কথা তাঁর স্মরণ হয়, এই তুর্কী মেয়েটিকে স্বর্গত কর্তা ব্রিগেডিয়ার আলেক্সেই বমানীচ এক লড়াই-এর পর মালগাড়িতে করে নিয়ে এসেছিলেন দয়া করে। এমন কি ছুটির দিনে, দান-খয়রাত এবং প্রাচীন রুশী কায়দায় বাকহুইট-এর বড়া আর ভদকা দিয়ে খানা-পিনার দিনে — এমন কি এসব দিনেও খুঁটিওয়ালা টেবিল বা পিপেগুলোর সামনে হাজির হত না স্তিওপুশ্‌কা; সে মাথা নুয়ে নমস্কার করত না, প্রভুর কর চুম্বন করত না, বা গোমস্তার মোটা হাতে ঢালা মদে ভর্তি গেলাস মনিবের দৃষ্টির সামনে এক চুমুকে সবটা শেষ করে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করত না। তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় হয়ত কোনো সহৃদয় ব্যক্তি এই দীন হীন ভিখিরীকে অর্ধভুক্ত একটু বড়া দিয়ে যেত। তার কাছে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান পর্বের সময় কেউ বলত, "উঠে এসেছেন যীশুখ্রীষ্ট," সে কিন্তু তার তৈলাক্ত স্থূল আস্তিন গুটিয়ে নিত না, হাঁফাতে হাঁফাতে আর চোখ মিট্‌মিট করতে করতে তার তরুণ মনিবদের বা এমন কি কর্ত্রীকে পর্যন্ত দেবার জন্য পকেটের মধ্য থেকে রঙমাখা ডিম বার করে আনত না। গ্রীষ্মকালে সে থাকত মুরগী-ঘরের পিছনে ছোটো একটা ঝুপড়িতে আর শীতকালে গোসলখানার উপপ্রকোষ্ঠে; তীব্র তুষার পাতের মধ্যে রাত কাটাত গোলাঘরের ঘাসের মাচানে। তাকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছল গৃহদাসদের; কখনো কখনো তারা তাকে লাথি মারত একটা দুটো, কিন্তু কেউ তার কাছে কখনো কোনো মন্তব্য করেনি; আর ওর কথা যদি বলেন, মনে হয় জন্মকাল থেকে ও কখানো মুখ খোলেনি। সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের পর এই পরিত্যক্ত লোকটি মালী মিত্রফানের কাছে গিয়ে আশ্রয় চায়। মালী একেবারে নির্লিপ্ত; বলল না, "থাকো আমার সঙ্গে," কিন্তু তাকে তাড়িয়েও দিল না। আর

স্তিওপ্‌শ্‌কোও এল না মালীর বাড়িতে থাকতে; তার বাসস্থান হল বাগান। হাঁটত-চলত সে নিঃশব্দে, হাঁচত-কাশত হাত আড়াল করে, একেবারে নির্ভয়ে নয়; সর্বদাই ব্যস্তসমস্ত, এদিক ওদিক চলে ফিরে বেড়াত পিঁপড়ের মতো সঙ্গোপনে; আর তার সব ব্যস্ততা খাদ্যের সন্ধানে — শুধু খাদ্যের জন্য মাত্র। আর বাস্তবিক, খাবার সংগ্রহের জন্য যদি না সে রাত দিন মেহনত করত, তাহলে গরীব বেচারী ক্ষিধেয় নিশ্চয়ই মারা পড়ত। রাত্রে কী খাওয়া হবে সকালে তা না জানতে পারাটা অত্যন্ত মন্দ ভাগ্য সন্দেহ নেই! কখনো কখনো স্তিওপ্‌শ্‌কা গুল্মের বেড়ার নিচে বসে মুলো চিবোয়, বা চুষে চুষে খায় গাজর, কিংবা নোংরা কিছু বাঁধাকপির ডাঁটা কুটি কুটি করে টুকরো করে; আর নয়ত কোনো একটা না একটা উদ্দেশ্য নিয়ে গুংড়ে গুংড়ে এক বালতি জল টেনে নিয়ে আসে; অথবা ছোটো কোনো কিছুর একটি পাত্রের নিচে আগুন ধরায় আর কোটের বুক থেকে কতকগুলি ছোটো ছোটো টুকরো নিয়ে ফেলে দেয়; নতুবা তার ক্ষুদ্র কাঠের খোপে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে যায় — পেরেক ঠোকে, রুটির জন্য তাক বানায়। সবকিছু সে করে নীরবে, যেন লুকিয়ে-চুরিয়ে: একটু তাকিয়ে দেখে নিতে পারার পূর্বেই আবার সে লুকিয়ে পড়ে। কখনো কখনো হঠাৎ দুদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়, কেউ অবশ্য তার অনুপস্থিতি লক্ষ্যও করে না ... তারপর, আরে! তাকে দেখা যায় আবার, দেখা যায় বেড়ার নিচে কোনো এক ধারে গোপনে গোপনে কেটলির তলায় কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালছে। মুখখানা তার ছোটো, চোখ হলদে, চুলগুলো ঝুলে পড়েছে ভ্রূ পর্যন্ত, নাকটা খাড়া, বড়ো বড়ো স্বচ্ছ দুটি কান বাদুড়ের মতো, দাড়িটা এমন যে দেখে মনে হত মাত্র পনেরো দিনের, সেই দাড়ি কখনো বাড়ত না, কমতও না। এই হচ্ছে স্তিওপ্‌শ্‌কা, যাকে আর একটি বৃদ্ধের সঙ্গে আমি দেখলুম ইস্‌তার তীরে।

উঠে গিয়ে তাদের শুভদিন জানালাম এবং বসলাম তাদের পাশে। দেখলাম স্তিওপ্‌শ্‌কার সঙ্গীও আমার পরিচিত; সে হল কাউণ্ট পিওতর ইলিচ ক-এর দাস এখন মুক্ত, নাম তার মিখাইলো সাভেলিয়েভ, ডাকনাম তুমান (তার মানে কুয়াশা)। থাকত বোলখভ শহরের এক যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে, যার ছিল সরাইখানা, সেখানে আমি কয়েকবার থেকেছি। অরেল সড়ক দিয়ে যেতে যেতে তরুণ কর্মচারী এবং অন্যান্য অবসরভোগী ব্যক্তিরা (ডোরাকাটা

কম্বল মুড়ি দেওয়া বণিক-ব্যাপারীদের অন্য অনেক কাজ থাকে) এখনো দেখতে পারেন বড়ো গ্রাম ত্রোইৎস্করের থেকে অনতিদূরে এবং প্রায় সড়কের ওপরে এক বিশাল দোতলা কাঠের বাড়ি, একেবারে জনশূন্য, ছাদ যাচ্ছে ভেঙে পড়ে, জানালাগুলি বন্ধ। রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় দ্বিপ্রহরে ধ্বংসের এই চিহ্নের চেয়ে শোকাবহ আর কিছু কল্পনা করা যায় না। এইখানে এককালে থাকতেন কাউণ্ট পিওতর ইলিচ, প্রাচীন কালের একজন উচ্চ ধনী শ্রেণীর লোক, আতিথেয়তার জন্য প্রখ্যাত। এক সময়ে সারা প্রদেশ এসে মিলত তাঁর বাড়িতে, সেখানে তালিম-দেওয়া ঐকতান বাজত কানে তালা লাগিয়ে, হাউই ছুটত দুমদাম, জ্বলত রোমান বাতি, তারা সবাই সাধ মিটিয়ে নাচত, আর আমোদ-আহ্লাদ করত; সেই বড়োলোকের পরিত্যক্ত শূন্য প্রাসাদের পাশ দিয়ে গাড়িতে চেপে যাবার সময় আজো একাধিক বৃদ্ধা মহিলা নিশ্চয় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর স্মরণ করেন পুরনো দিনগুলির কথা, তাঁদের লুপ্ত যৌবনের কথা। কাউণ্ট দীর্ঘকাল ধরে বল-নাচের আয়োজন করে গেছেন, আনুগত্যে বিগলিত অভ্যাগতের মাঝখান দিয়ে মুখে একটু নম্র মৃদু হাসি নিয়ে হেঁটে যেতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর সম্পত্তি সমগ্র জীবন ব্যাপী টিকে থাকার মতো যথেষ্ট ছিল না। সর্বস্বান্ত হবার পর তিনি নিজের জন্য একটি চাকরী সন্ধান করে নেবার মানসে যাত্রা করলেন পিটার্সবুর্গে, কিন্তু কোনো ফল হল না, হোটেলের একটা ঘরে তিনি মারা গেলেন। তুমান ছিল তাঁর একজন কর্মচারী, কিন্তু কাউণ্টের জীবদ্দশাতেই সে তার মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল। বয়স প্রায় সত্তর, মুখখানা বেশ স্বাভাবিক ও প্রসন্ন। হাসি তার মুখে লেগে থাকত প্রায় সর্বদা, আর সে এমন হাসি যা কেবল ক্যাথারিণের আমলের লোকেরাই জানত হাসতে—সে হাসি রাজকীয় অথচ অমায়িক; কথা বলবার সময় সে ধীরে ধীরে তার ঠোঁট দুটি খুলত আর বুজত, প্রসন্নভাবে চোখ মিট মিট করত, আর একটুখানি নাকি-সুরে কথা বলত। নাক ঝাড়ত, নস্যিও নিত মৃদুমন্দ গতিতে, যেন এমন কিছু করছে যার গুরুত্ব সামান্য নয়।

আমি বলতে শুরু করলুম, "কী, মিখাইলো সাভেলিচ, মাছ ধরেছ একটাও?"

"এই যে, অনুগ্রহ করে ঝুড়িটা দেখুন: দুটো পার্চ এবং পাঁচটা রোচ মাছ ধরেছি ... দেখাও তো স্তিওপুশ্‌কা।"

স্তিওপুশ্‌কা আমার দিকে ঝুড়িটা বাড়িয়ে ধরল।

তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "কেমন আছো, স্তিওপুশকা?"

"ওঃ — ওঃ — আজ্ঞে — আজ্ঞে — না — তেমন খারাপ নয়, আজ্ঞে," স্তেপান বলল তোৎলাতে তোৎলাতে, যেন তার জিভে একটা ভারী ওজন রয়েছে।

"আর মিত্রফান ভালো আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুজুর।"

বেচারী মুখ ফিরিয়ে নিল।

তুমান বলল, "মাছ তেমন টোপ খাচ্ছে না; যা সাংঘাতিক গরম, কাহিল হয়ে মাছেরা সব চলে গেছে ঝোপের নিচে; ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা পোকা গাঁথো, স্তিওপুশ্‌কা।" (একটা পোকা তুলে নিল স্তিওপুশ্‌কা, খোলা হাতে সেটা রাখল, ওটাকে মারল দু'তিন বার, বঁড়শীতে গাঁথল, ওপরে থুথু ফেলল, তারপর দিল তুমানকে।) "ধন্যবাদ স্তিওপুশ্‌কা," বলে আমার দিকে ফিরে তুমান বলল, "আর আপনি, আপনি কি হুজুর শিকারে বেরিয়েছেন?"

"দেখতেই পারছ।"

"আঃ — আর ওই যে আপনার কুকুরটা, ওটা কি জার্মান না বিলিতি?"

মাঝে মাঝে বুড়ো একটু লোক দেখাতে ভালোবাসত, যেন বলতে চায়, "হ্যাঁ, আমিও বাস করেছি বৈকি দুনিয়ায়!"

"কোন জাতের তা জানি না, কিন্তু কুকুরটা ভালো।"

"আঃ! আপনি কি হাউণ্ড নিয়েও বেরোন?"

"হ্যাঁ, আমার দু'দল শিকারী কুকুর আছে।"

তুমান মাথা নাড়ল মৃদু হেসে।

"এ রকমই হয়; একজন কুকুরের ভক্ত, আর একজন কিছুতেই কুকুর চায় না। আমি বেশি কিছু বুঝি না, কিন্তু মনে হয় কুকুর রাখাটা আড়ম্বর রক্ষার জন্য... আর সবগুলিকে তো কায়দামাফিক রেখে চালাতে হয়; ঘোড়ারও কায়দা থাকা চাই, শিকারীদেরও থাকতে হয়, তাদের থাকা উচিত, সবারই। স্বর্গত কাউণ্ট — ঈশ্বর তাঁকে দয়া করুন! — তিনি খুব একজন শিকারী ছিলেন না বলতেই হবে; কিন্তু তিনি কুকুর রাখতেন আর বছরে দু'বার করে

ওগ্লোকে নিয়ে বের হতেন। প্রাঙ্গণে জড়ো হত শিকারীরা জরিতে সাজানো লাল কাফতান পরে, শিঙ্গা বাজাত; মহানুভব কাউণ্ট বেরিয়ে আসতেন, তারপর কাউণ্ট মহোদয়ের ঘোড়া নিয়ে আসা হত; তারপর কাউণ্ট মহাশয় উঠে বসতেন ঘোড়ায়, প্রধান শিকারী তাঁর পা ঢুকিয়ে দিত জিনের রেকাবে, নিজের টুপি খুলে নিয়ে টুপিতে করে ঘোড়ার রাশ বাড়িয়ে দিত প্রভুর দিকে। কাউণ্ট মহোদয় এমনি করে চাবুক ঝাঁকতেন, আর শিকারীরা একটা চীৎকার করে গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেত। কাউণ্টের পেছন পেছন ঘোড়ায় চড়ে যেত একজন শিকারী, তার হাতে থাকত রেশমের রজ্জুতে বাঁধা প্রভুর প্রিয় দুটি কুকুর, শিকারী তাদের ভালো করে দেখাশুনো যে করবে, সেটা ধরেই নিতে পারবেন... আর শিকারীটিও কসাক জিনে উঁচু হয়ে বসত; তার গাল দুটো ছিল দারুণ লাল, আর এমনি করে সে চোখ পাকাত ... আর ঠিকই জানবেন, এমনি সব সময়ে আসত অতিথিরাও, চলত নানা উৎসব আপ্যায়ন ...” হঠাৎ কথা থামিয়ে বঁড়শীর সুতো টেনে সে বলল, “এই দেখো, ভেগেছে, পাজীটা!”

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “শোনা যায়, কাউণ্ট জীবদ্দশাটা বেশ কাটিয়েছেন?”

বুড়ো পোকায় থুথু দিয়ে আবার বঁড়শী নামিয়ে দিল জলে।

“তিনি যে বিরাট আদমী ছিলেন সে কথা সবাই জানে। কখনো কখনো, বলতে পারা যায়, পিটার্সবুর্গের প্রথম সারির লোকেরাও আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। বুকে তাঁদের শোভা পেত নীল রিবন, তাঁরা এসে বসতেন টেবিলে, খাওয়া দাওয়া করতেন। আর তাঁদের কী করে আপ্যায়ন করতে হবে তা জানতেন তিনি। মাঝে মাঝে আমাকে ডাকতেন। বলতেন, ‘তুমান, কালকের মধ্যে কিছু জ্যান্ত স্টার্জন মাছ চাই আমার; দেখো, পাওয়া যায় যেন কয়েকটা, কেমন?’ ‘আজ্ঞে হুজুর!’ সূক্ষ্ম কাজ-করা কোট, পরচুলা, বেত, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, সব থেকে ভালো ইউ-ডি-কোলোন, নস্যদানি, বিরাট বিরাট ছবি: সবকিছু তিনি আনাতেন একেবারে খোদ প্যারিস থেকে অর্ডার দিয়ে। যখন তিনি কোনো ভোজসভার আয়োজন করতেন, ওরে বাবা, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান! বাজি পোড়ানো হত তখন আর গাড়ির পর গাড়ি ছুটে আসত! এমন কি তোপ পড়াও বাকি থাকত না। খালি অর্কেস্ট্রার লোকই ছিল চল্লিশজন। ব্যাণ্ডের নেতা রেখেছিলেন তিনি একজন জার্মানকে,

কিন্তু সাংঘাতিক চাল মারতে শুরু করল জার্মানটা; প্রভুদের সঙ্গে এক টেবিলে সে খেতে চাইত; তখন কর্তা তাকে দূর করে দিতে বললেন! তিনি বলতেন, 'আমার বাজনদারেরা নেতা ছাড়াই কাজ চালাতে পারে।' সত্যি সত্যি প্রভু ছিলেন তিনি। এরপর শুরু হত নাচ, সারা রাত নাচত সবাই, বিশেষ করে 'ইকোসাইসে মাত্রাড়ুর' নাচে মেতে উঠত সবাই ... আহা, ধরা পড়েছে একটা!" (জল থেকে একটা ছোটো পার্চ মাছ টেনে তুলল বুড়ো।) "এই যে স্তিওপুশ্কা!" বঁড়শী আবার জলে নামিয়ে বুড়ো ফের শুরু করল, "কর্তা ছিলেন খাঁটি কর্তারই মতো, আর তাঁর হৃদয়ে দয়াও ছিল। মাঝে মাঝে ঘুষি মারতেন কাউকে, তারপর ঘুরে দাঁড়াবার আগেই ভুলে যেতেন সে কথা। কেবল একটা ব্যাপার: তাঁর রক্ষিতা ছিল। ওঃ, সেই মেয়েমানুষগুলো! ঈশ্বর ক্ষমা করুন তাদের! আর তারাই ছিল তাঁর সর্বনাশের কারণ; অথচ, কী জানেন, নিচু শ্রেণী থেকেই বেশি করে তিনি নিয়ে আসতেন ওদের। ভাবছেন তাদের খাই বেশি ছিল না? একদম তা নয় — সারা ইউরোপের মধ্যে সব থেকে দামী সবকিছু তাদের চাই-ই! হ্যাঁ, কেউ বলতে পারে হয়ত, 'যেমন খুশি তেমনি থাকতে পারবেন না কেন তিনি; এ তো তাঁর নিজের ব্যাপার' ... কিন্তু নিজের সর্বনাশ করার কোনো দরকার ছিল না তাঁর। বিশেষ করে একজনের কথা বলতে হয়; তার নাম আকুলীনা। আজ সে মরে গেছে; ঈশ্বর তাকে শান্তি দিন! সিতভো'র কনস্টেবলের মেয়ে ছিল সে; আর কী বদমেজাজীই না ছিল! এক এক সময় সে কাউণ্টের গালে চড় কসিয়ে দিত। তাঁকে একেবারে বশ করে ফেলেছিল। আমার ভাইপোকে মেয়েটা পাঠিয়েছিল সেপাই করে; ও তার একটি নতুন পোষাকে চকোলেট ফেলে দিয়েছিল তাই ... আর শুধু আমার ভাইপোকেই সে এমন সাজা দেয়নি। আহা, কিন্তু সে দিনগুলো বড়ো ভালোও ছিল বটে!" বলতে বলতে বুড়ো দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, সে চুপ করে গেল।

একটুক্ষণ নীরব থেকে আমি শুরু করলুম, "তাহলে, মনিব তোমার কড়া লোক ছিলেন দেখছি?"

মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল জবাবে, "তখন সেটাই ছিল রেওয়াজ, আজ্ঞে হুজুর।"

তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে আমি বললুম, "আজকাল আর ও সব করা হয় না?"

আড়চোখে তাকাল আমার দিকে।

বিড়বিড় করে বলল, "এখনকার অবস্থা নিশ্চয়ই ভালো অনেক।" বলে বঁড়শী আরো খানিকটা দূরে ফেলল।

আমরা বসেছিলুম ছায়ায়; কিন্তু ছায়াতেও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। গুমোট আবহাওয়াটা ভারী আর ক্লিষ্ট, গরমে যেন পুড়ে যাচ্ছে মুখটা, অস্বস্তিতে মুখটা তুলে একটুখানি হাওয়ার সন্ধান করলেও হাওয়া পাওয়া যায় না একটুও। নীল গাঢ় আকাশ থেকে সূর্যের আগুন ঝরে পড়ছে; ঠিক আমাদের উল্টো দিকে, নদীর ওপারে ওটে ভরা একটা হলদে মাঠ, এখানে ওখানে আগাছা; **ওটের** একটি শীষও কাঁপে না। একটু ভাঁটিতে একটা চাষীর ঘোড়া হাঁটু **পর্যন্ত নদীর** জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে আর ধীরে ধীরে নাড়ছে ভেজা ল্যাজটা; মাঝে মাঝে একটা ঝুলে পড়া ঝোপের নিচে বড়ো একটা মাছ ভেসে উঠছে, জলের ওপরে উঠছে বুদবুদ, তারপর মাছটা আস্তে ডুবে যাচ্ছে একেবারে নদীর তলায়, পেছনে সামান্য একটু ক্ষুদ্র তরঙ্গের আভাস রেখে। রৌদ্রে ঝলসানো ঘাসের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ করছে ফড়িংগুলো; ভারুই পাখির ডাকে একটা বিরক্তি, একটা মন্থরতা; মাঠের ওপর অনায়াসে উড়ে চলে যাচ্ছে বাজ পাখিরা, একই জায়গায় তারা বিশ্রাম নিচ্ছে ঘন ঘন, ডানা দ্রুত ঝটপট করে, ল্যাজ ছড়িয়ে পাখার আকারে। গরমে অভিভূত হয়ে আমরা বসে থাকি স্তব্ধ নিশ্চল। অকস্মাৎ আমাদের পেছনে নালায় শব্দ হল একটা; কেউ নেমে আসছে ঝরণায়। ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম বছর পঞ্চাশেকের একজন চাষী, সর্বাঙ্গে তার ধুলো, গায়ে রয়েছে তার কুর্তি আর পায়ে বাস্ট জুতো। কাঁধে চাপিয়ে বহন করে আনছে সে চাঁচে তৈরি একটি ঝুড়ি এবং একখানা পিরান। নিচে ঝরণায় সে নেমে গেল, তৃষিতভাবে জল খেয়ে উঠে এল।

তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তুমান চেঁচিয়ে উঠল, "আঃ, ভ্লাস, বন্ধু, বহাল তবিয়তে থাকো, কল্যাণ হোক তোমার! কিন্তু কোত্থেকে তোমায় পাঠালেন ঈশ্বর?"

চাষীটি আমাদের আরো কাছে এসে বলল, "বহাল তবিয়তে থাকো, মিখাইলো সার্ভেলিচ, কল্যাণ হোক তোমার! আমি আসছি অনেক দূর থেকে।"

তুমান জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গেছলে তুমি?"

"মস্কোয়, আমার মনিবের কাছে।"

"কী জন্য?"

"একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম।"

"কিসের?"

"এই, খাজনা কমানোর জন্য, কিংবা যাতে খেটে-খুটে খাজনা শোধ করতে পারি, অথবা আমাকে আর এক খণ্ড জমি দেওয়া হোক, বা অন্য কোনো কিছু ব্যবস্থার জন্য। আমার ছেলেটি মারা গেছে—এখন তাই আর একলা পারি না চালাতে।"

"ছেলে মারা গেছে তোমার?"

কৃষকটি একটু থেমে বলল, "মারা গেছে। ও থাকত মস্কোয়, গাড়ি চালাত, আর, বলতে দ্বিধা নেই, আমার হয়ে খাজনা দিত সে-ই।"

"সেকি, এখনো খাজনা দিচ্ছ নাকি?"

"হ্যাঁ, আমরা **খাজনা দিই।**"

"কী বললেন তোমার মনিব?"

"কী আর বললেন মনিব! আমাকে তাড়িয়ে দিলেন! বললেন, 'সরাসরি আমার কাছে এসেছ, কী আস্পর্ধা! এ সব কাজের জন্য তো নাজির গোমস্তা আছে। তোমাকে আগে আর্জি জানাতে হবে তার কাছে... আর তাছাড়া অন্য জমিতেই বা তোমাকে আমি বসাব কোথায়?' বললেন, 'যা পাওনা আছে তোমার কাছে, তা আগে তো নিয়ে এসো।' তিনি রেগে গেছলেন একেবারে।"

"তারপর — ফিরে চলে এলে?"

"ফিরে এলাম। দেখতে চেয়েছিলাম আমার ছেলে তার নিজের বলতে কিছু রেখে গেছে কিনা, কিন্তু সরাসরি জবাব পেলাম না কোনো। তার মালিককে বললাম, 'আমি ফিলীপের বাপ,' তিনি বললেন, 'আমি তার কী জানি? আর তোমার ছেলে,' বললেন তিনি, 'কিছুই রেখে যায়নি, আমার কাছে বরং দেনাই আছে তার।' আমি তাই ফিরেই এলাম চলে।"

কৃষকটি এই সব ঘটনা বলে গেল মুখে একটু মৃদু হাসি নিয়ে, যেন অন্য কারুর কথা বলছে; কিন্তু তার ছোটো, কুঞ্চিত চোখ দুটিতে দেখা দিচ্ছিল অশ্রু, ঠোঁট কাঁপছিল।

"হুঁ, এখন তাহলে বাড়ি যাচ্ছো?"

"কোথায় আর যাবো? বাড়িতেই যাচ্ছি। বউ মনে হচ্ছে এতদিনে না খেয়ে শুকিয়ে উঠেছে।"

"তাহলে তোমার উচিত..." হঠাৎ বলল স্তিওপুশ্‌কা। বিব্রত হয়ে উঠল সে, নীরব হয়ে গেল, তারপর পোকা ভর্তি পাত্রটার মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল।

স্তিওপুশ্‌কার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে তুমান আবার বলল, "আর তুমি কি যাবে নাকি গোমস্তার কাছে?"

"কী জন্য আর যাবো? বকেয়া তো আছেই আমার। মারা যাবার আগে ছেলেটা এক বছর অসুখ হয়ে পড়ে ছিল; এমন কি নিজের খাজনাই সে দিতে পারেনি। কিন্তু ওতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না; আমার কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারবে না ওরা... হ্যাঁ, ওরা যত খুশি ধূর্ত হতে পারে — আমি পরিষ্কার কেটে বেরিয়ে গেছি!" (সে হাসতে লাগল।) "কির্নাতিলিয়ান সেমিওনীচের খুবই চতুর হতে হবে যদি..."

ভ্‌লাস হাসল আবার।

তুমান ভেবে চিন্তে বলে উঠল, "ব্যাপার-স্যাপার আজকাল বেশ কঠিন, ভাই।"

"কঠিন! না!" (ভ্‌লাসের গলাটা ভেঙে যায়।) আস্তিনে মুখ মুছে সে বলল এরপর, "ওঃ, কী গরম!"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার মনিব কে?"

"কাউণ্ট ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ ক।"

"পিওতর ইলিচের ছেলে?"

জবাব দিল তুমান, "কাউণ্ট পিওতর ইলিচের ছেলে, পিওতর ইলিচ তাঁর জীবদ্দশায় ভ্‌লাসের গ্রামখানা দিয়ে গেছলেন তাঁকে।"

"তিনি ভালো আছেন?"

ভলাস বলল, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভালো আছেন। কী লাল না হয়ে

গেছেন তিনি, মুখখানা হয়েছে এমন যে মনে হয় যেন নরম কিছু দিয়ে তা ভরাট করে দেওয়া হয়েছে।"

আমার দিকে ফিরে তুমান বলল, "দেখুন হুজুর, মস্কোর কাছে হলে বেশ ভালোই হত, কিন্তু এখানে খাজনা দেওয়াটা আলাদা ব্যাপার।"

"সব মিলিয়ে তোমার খাজনা কত?"

বিড় বিড় করে ভ্‌লাস বলল, "পঁচানব্বুই রুবল।"

"দেখলেন, আর জমি তো সামান্য এক চিলতে; আর যা সব তার সবটাই মনিবের বন।"

কৃষকটি বলল, "শোনা যায়, ওটা বেচে দিয়েছেন ওঁরা।"

"দেখুন তাহলে এবার। এই স্তিওপুশ্‌কা, পোকা দাও একটা। এ কি, ও স্তিওপুশ্‌কা, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি—এঃ?"

চমকে উঠল স্তিওপুশ্‌কা। কৃষকটি আমাদের কাছে বসল। আমরা নীরব হয়ে গেলুম আবার। ওপারে কে যেন গান গাইছে—কিন্তু কী শোকের গান। বেচারী ভ্‌লাস বিষাদে বড়ো ম্লান বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

আধঘণ্টা পরে ছাড়াছাড়ি হল আমাদের।

জেলার ডাক্তার

হেমন্তের একদিন, মফঃস্বলের এক দূরে অঞ্চল থেকে ফিরছিলাম, ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ভাগ্য ভালো জ্বরটা এল জেলা শহরের সরাই-খানায় যখন ছিলুম তখন, ডাক্তার ডেকে পাঠালুম। আধ ঘণ্টার মধ্যে জেলার ডাক্তার এলেন, মাঝারি লম্বা গোছের কৃষ্ণকেশ কৃশ-তনু লোকটি। ঘাম ঝরাবার চলতি ওষুধ তিনি লিখে দিলেন, সরষের পুলটিশ লাগাতে বললেন, পাঁচ রুবলের একটি নোট বেশ কৌশলে আস্তিনের কাফে গলিয়ে দিলেন একটু শুকনো কাশি কেশে এবং অন্য দিকে তাকিয়ে, তারপর বাড়ি যাবার জন্য উঠছিলেন, কিন্তু কী করে যেন কথায় জড়িয়ে গিয়ে থেকেই গেলেন। জ্বরের তাপে অবসন্ন লাগছিল আমার, বুঝতে পারছিলাম রাতে ঘুম হবে না, কাজেই একজন আমুদে সঙ্গীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারা যাবে বলে খুশিই হলাম। চা দেওয়া হল। আমার ডাক্তার অবাধে কথা বলে চললেন। লোকটির কাণ্ডজ্ঞান আছে, নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন বেশ জোরের সঙ্গে আর কিছু হাস্যরস মিশিয়ে। অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে দুনিয়ায়: কিছু লোকজনের সঙ্গে আপনি হয়ত দীর্ঘকাল থাকতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্যও থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে হয়ত কোনো দিন নিজের অন্তর থেকে খোলাখুলি কথা বলেননি; আবার অন্য অনেকে থাকেন হয়ত যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবারই সময় প্রায় পাননি, কিন্তু একেবারে হঠাৎই আপনি আপনার সমস্ত গূঢ় কথাগুলো গরগর করে তাঁকে—কিংবা তিনি আপনাকে বলে যাবেন, যেন আপনারা দুজনে পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকারে বসেছেন। কী করে জানি না আমি আমার নতুন বন্ধুর আস্থা অর্জন করলাম। যাই

হোক, নেহাৎ আচম্বিতে তিনি আমাকে বেশ একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শোনালেন; সহৃদয় পাঠকের কাছে আমি তাঁর সেই কাহিনী বর্ণনা করব। ডাক্তারের নিজের কথাতেই কাহিনীটি বলতে চেষ্টা করব।

"আপনি বোধহয় চেনেন না," দুর্বল কম্পিত স্বরে (নির্ভেজাল বেরিওজভ নস্যি নেওয়ার ফলে এই রকম হয়ে থাকে) শুরু করলেন তিনি, "আপনি বোধহয় চেনেন না এখানকার জজকে, মীলভ পাভেল লুকিচকে? চেনেন না তাঁকে? তা চেনা না-চেনা সমানই কথা।" (গলা খাঁকারি দিয়ে চোখ রগড়ালেন)। "হ্যাঁ, দেখুন, ঠিক ঠিক নির্ভুলভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটা ঘটেছিল লেন্ট-এর সময়, ঠিক বরফ গলার সময়। আমি বসে ছিলাম তাঁর বাড়িতে — মানে জজ সাহেবের বাড়িতে — বসে বসে প্রেফারেন্স খেলছিলাম; জজটি বেশ লোক, প্রেফারেন্স খেলতে ভালোবাসতেন। অকস্মাৎ" (ডাক্তার এই কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করতেন) "আমায় ডেকে বলা হল, 'আপনাকে একটি চাকর ডাকছে।' আমি বললাম, 'কী চায় সে?' তাঁরা বললেন, 'একটি চিঠি নিয়ে এসেছে — নিশ্চয় কোনো রোগীর চিঠি হবে।' আমি বললাম, 'দিন তো চিঠিখানা আমাকে।' হ্যাঁ রোগীরই চিঠি — বেশ বেশ — বুঝলেন কিনা — এই তো আমাদের অন্নের সংস্থান ... কিন্তু ব্যাপারটি ছিল এই: চিঠি লিখেছেন এক নারী, বিধবা তিনি; লিখেছেন, 'আমার মেয়েটি মারা যাচ্ছে। আসুন, ঈশ্বরের দোহাই!' চিঠিতে তিনি বলছেন, 'আপনার জন্য ঘোড়াও পাঠানো হল।' ...বেশ, ভালো কথা। কিন্তু তিনি থাকেন শহর থেকে বারো মাইল দূরে, বাইরে তখন মধ্যরাত্রি, আর রাস্তার যা দশা, কি বলব! তাছাড়া, তিনি ছিলেন দরিদ্র, কাজেই দু'রুবলের বেশি আশা নেই, তাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয়; হয়ত ফি'র বদলে পাওয়া যাবে একখণ্ড লিনেন আর কিছু শুকনো খোসা ছাড়ানো গম। কিন্তু জানেন তো, কর্তব্য সবকিছুর আগে: একটি মানুষ মরে যাচ্ছে হয়ত। তৎক্ষণাৎ তাস দিয়ে দিলাম প্রাদেশিক কমিশনের সদস্য কাল্লিওপিনের হাতে, বাড়ি ফিরে এলাম। তাকিয়ে দেখি, হতচ্ছাড়া একটা ছোটো শকট দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির কাছে; তাতে জোতা চাষীদের ঘোড়া, ঘোড়াগুলো মোটা-সোটা — একটু অতিরিক্ত মোটা-সোটাই — আর তাদের গা ফেল্টের মতো লোমশ; সহিস সম্মান দেখিয়ে টুপি খুলে বসে আছে। যাই হোক, ভাবছি আপন মনে, 'এ কথা স্পষ্ট, বন্ধু, তোমার মনিবরা

তো সোনার থালায় খাবার খায় না।'... আপনি হাসছেন, কিন্তু আপনাকে বলি, আমার মতো দরিদ্র লোকের সবকিছুই বিচার বিবেচনা করে নিতে হয়... সহিস যদি বসে থাকে রাজপুত্রের মতো, টুপিতে হাতই ছোঁয়ায় না, এমন কি যদি সে দাড়ির আড়ালে আপনাকে ভেঙ্গায়, যদি চাবুক হাঁকায় — তবে বাজি রাখতে পারেন, ছয় রুবল পাওয়া যাবেই। কিন্তু এই কেসটা দেখলুম একেবারে আলাদা প্রকৃতির। তবু কোনো উপায় আছে বলে মনে হল না, সব কিছুর আগে কর্তব্য। সব থেকে দরকারী ওষুধগুলি তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে রওয়ানা হলাম। বিশ্বাস করবেন আপনি? কোনো রকমে সেখানে গিয়ে পেঁছুতে পারলাম। রাস্তার অবস্থা জঘন্য, নরকের মতো: জলের স্রোত, বরফ, নালা, তার ওপর আবার সব থেকে বড়ো আপদ — হঠাৎ সেখানে বাঁধটা গেছে ভেঙে। কিন্তু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পেঁছিলাম। ছোটো একটি খড়ে-ছাওয়া বাড়ি। জানালায় আলো দেখা যাচ্ছিল: তার মানে ওঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে এগিয়ে নিতে এলেন টুপি মাথায় এক বৃদ্ধা, খুবই মাননীয়া তিনি। বললেন, 'ওকে বাঁচান, ও মারা যাচ্ছে।' আমি বলি, 'ভেঙে পড়বেন না। রোগী কোথায়?' 'এদিকে আসুন।' দেখি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন একটি ঘর, কোণে একটি প্রদীপ; শয্যায় অচেতন হয়ে শুয়ে রয়েছে বিশ বছরের একটি মেয়ে। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস টানছে — প্রবল জ্বর। আরো দুটি মেয়ে, তার বোনেরা, আশঙ্কায় কাঁদছে। তারা বলল, 'কালও দিদি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, বেশ ক্ষিধেও ছিল; আজ সকালে মাথার যন্ত্রণার কথা বলল, আর সন্ধ্যায় অকস্মাৎ, এই তো দেখছেন।' আমি আবার বললুম, 'ব্যস্ত হবেন না আপনারা।' জানেন তো, ডাক্তারের কর্তব্য, — রোগিনীর কাছে গিয়ে খানিকটা রক্ত বার করে দিলাম তার দেহ থেকে, বাড়ির লোকদের বললুম সরষের পুলটিশ লাগাতে, আর একটা মিকশ্চার লিখে দিলাম। ততক্ষণে তার দিকে তাকালাম আমি; আমি তাকালাম তার দিকে, বুঝলেন — আরে বাবা, ঈশ্বর! — অমন মুখ আমি আর কখনো দেখিনি! — এক কথায় সে ছিল পরমা সুন্দরী! মমতায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। এমন চমৎকার নাক মুখ; এমন চোখ!... ঈশ্বরের কৃপা! মেয়েটি অনেকটা স্থির হয়ে উঠল; ঘাম হতে লাগল, মনে হল জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে তাকাল চতুর্দিকে, মৃদু হাসল, তারপর মুখের ওপর হাত বুলিয়ে নিল... বোনেরা

তার ওপর ঝু'কে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছো?' সে বলল, 'ভালো,' তারপর পাশ ফিরল। তাকিয়ে দেখলুম ঘুমিয়ে পড়েছে। বললাম, 'আচ্ছা, এবার রোগিনীকে ঘুমুতে দিতে হবে।' পা টিপে টিপে সবাই বেরিয়ে এলাম, একটি ঝি শুধু রইল, যদি দরকার হয় এই ভেবে। বৈঠকখানায় একটা টেবিলের ওপর দাঁড় করানো ছিল একটি সামোভার আর এক বোতল রাম: আমাদের পেশার লোকেরা ও ছাড়া চলতে পারে না। আমাকে ওঁরা চা দিলেন, বললেন রাতটা থেকে যেতে ... রাজী হলাম: অত রাতে বাস্তবিক আর যাবোই বা কোথায়? বৃদ্ধা বিলাপ করেই চলছিলেন। 'কী হয়েছে?' আমি বললাম, সেরে যাবে ও; আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না; বরং একটু বিশ্রাম নিন আপনি; প্রায় দুটো এখন বাজে।' 'কিন্তু কিছু যদি ঘটে তবে ডেকে দেবেন তো আমাকে?' 'হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।' বৃদ্ধা চলে গেলেন, মেয়েরাও গেল নিজেদের ঘরে: আমার জন্য বিছানা করে দেওয়া হল বৈঠকখানায়। যাই হোক, শুয়ে তো পড়লাম — কিন্তু ঘুমুতে পারলুম না: আশ্চর্য! কারণ বাস্তবিক আমি খুবই ক্লান্ত ছিলুম। রোগিনীকে কিছুতেই মাথা থেকে সরাতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠল অবস্থাটা, অকস্মাৎ উঠে পড়লাম, মনে মনে ভাবছি, 'এবার যাবো, গিয়ে দেখব রোগিনী আছে কেমন'। বৈঠকখানার পাশেই তার শয়নকক্ষ। যাই হোক, আমি তো উঠলাম, ধীরে ধীরে খুললাম দরজাটা। ইস্! বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে কী রকম! ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম, পরিচারিকা ঘুমিয়ে পড়েছে, মুখ তার হাঁ করে খোলা, এমন কি নাকও ডাকছে তার — হতভাগিনী! রোগিনী কিন্তু আমার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে, হাত দুটো তার ছড়ানো দু'দিকে, বেচারী! কাছে এগিয়ে গেলাম... হঠাৎ সে চোখ খুলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে! 'কে, কে আপনি?' আমার সব কী রকম গোলমাল হয়ে গেল। বললাম, 'ভয় পাবেন না আপনি। আমি ডাক্তার, দেখতে এসেছি কেমন আছেন আপনি।' 'আপনি ডাক্তার?' 'হ্যাঁ, আপনার মা লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে এনেছেন শহর থেকে; আপনার দেহ থেকে রক্ত ফেলে দিয়েছি; এখন একটু ঘুমোন তো, তারপর দু'এক দিনের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনাকে দাঁড় করিয়ে দেব।' 'আঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, আমি যেন মরে না যাই দেখবেন ... দয়া করুন, দয়া করুন ডাক্তারবাবু।' 'আপনি ওভাবে কথা বলছেন কেন? ভগবানের কৃপায় আপনি

ভাল হয়ে উঠবেন!' মনে হল তার আবার জ্বর হয়েছে; নাড়ী দেখলাম, হ্যাঁ, জ্বরই। আমার দিকে তাকাল সে, তারপর আমার হাতখানা টেনে নিল। 'আমি মরতে চাইনে, কেন তাই বলছি আপনাকে: হ্যাঁ, বলব আপনাকে ... এখন তো একলা আছি আমরা; শুধু আপনি বলবেন না... কাউকে নয়... হ্যাঁ, শুনুন ...' আমি নুয়ে পড়লাম; সে তার ঠোঁট একেবারে আমার কানের কাছে নিয়ে এল; চুল দিয়ে স্পর্শ করল আমার গালটা — স্বীকার করছি আমার মাথা ঘুরে গেছল — সে ফিস ফিস করে বলতে লাগল... কিছুই বুঝতে পারলাম না ... ওহো, প্রলাপ বকছিল সে!... ফিস ফিস করে সে বলে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, আর বলছে এত তাড়াতাড়ি, ভাষাটা যেন রুশ নয়; শেষ পর্যন্ত সে থামল, কাঁপতে কাঁপতে বালিশে নামিয়ে রাখল মাথাটা, তারপর আঙুল তুলে আমায় হুঁশিয়ার করে দিল। 'মনে থাকে যেন ডাক্তারবাবু, কাউকে বলবেন না।' কোনো ক্রমে শান্ত করলুম তাকে; কিছু পান করতে দিলুম, তারপর পরিচারিকাকে জাগিয়ে তুলে চলে গেলুম।"

এই বলে তখন ডাক্তার আবার অত্যন্ত প্রবল শক্তিতে নস্যি নিলেন, এক মুহূর্ত নীরব নিশ্চল হয়ে রইলেন।

তারপর বলে চললেন: "যাই হোক, পরদিন রোগিনীর কোনো উন্নতি দেখা গেল না; এ ঘটনা আমার প্রত্যাশিত ছিল না। আমার ভাবনা হল, চিন্তা করলাম বারবার, তারপর হঠাৎ সেখানে থাকা স্থির করে ফেললাম, যদিও আমার অন্যান্য রোগীরা পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিল... আর আপনি তো জানেন, সেটা অবহেলা করা যায় না, অবহেলা করলে প্র্যাকটিসের ক্ষতি হয়। কিন্তু, প্রথম কথা, রোগিনীর অবস্থা সত্যিই ছিল সঙ্গীন; আর দ্বিতীয়ত, সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়া, গোটা পরিবারটিকেও আমার পছন্দ হয়েছিল। তাঁরা বাস্তবিকই ছিলেন ভারি গরীব; কিন্তু আমি বলতে পারি, তাঁরা অসাধারণ সভ্য, মার্জিত... গৃহকর্তা ছিলেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, একজন গ্রন্থকার; তিনি মারা যান অবশ্য দারিদ্র্যের মধ্যে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ছেলেমেয়েদের চমৎকার লেখাপড়া শিখিয়ে যেতে পেরেছিলেন; প্রচুর বইও রেখে গেছেন তিনি। রোগিনীর বিশেষ যত্ন নিচ্ছিলাম আমি, সেজন্য বা অন্য কোনো কারণে হোক, যাই হোক না কেন, আমি জোর করে বলতে পারি, সমস্ত পরিবারটি আমাকে

এমন ভালোবেসে ফেললেন যেন আমি তাঁদেরই একজন। ইতিমধ্যে রাস্তাঘাট আরো জঘন্য হয়ে গেছে; প্রায় সমস্ত যোগাযোগ গেছে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে; শহর থেকে এমন কি ওষুধ আনাও ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। এদিকে রোগিনী ভালো হচ্ছে না। দিনের পর দিন, দিনের পর দিন... কিন্তু... এখানে..." (ডাক্তার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন।) "হ্যাঁ, স্পষ্টই বলছি, কী করে যে বলব আপনাকে তা জানি না..." (আবার নস্যি নিলেন ডাক্তার, কাশলেন, এক ঢোক চা খেলেন।) "হ্যাঁ, সোজাসুজিই বলছি আপনাকে। আমার রোগিনী... কী করে যে বলি? ... হ্যাঁ, সে প্রেমে পড়ে গেছে আমার... কিংবা না, প্রেমে হয়ত সে পড়েনি... যাই হোক... বাস্তবিক, কী করে বলা যায়?" (ডাক্তার মাথা নিচু করে তাকালেন এবং আরক্ত হয়ে উঠলেন।)

তাড়াতাড়ি এবার বললেন, "না, প্রেমে পড়া বটে! নিজেকে মানুষের কখনো বাড়িয়ে দেখা উচিত নয়। মেয়েটি সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, অনেক পড়াশুনা করেছে, আর আমি তো আমার লাটিনই ভুলে গেছি, ভুলে গেছি প্রায় সম্পূর্ণরূপে। আর চেহারার কথা" (একটু মুচকে হেসে ডাক্তার দেখে নিলেন নিজেকে), "সে দিক দিয়েও আমার গর্ব করার কিছু নেই। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে মূর্খ করেননি; কালোকে আমি শাদা বলে গ্রহণ করি না; দু'একটি জিনিস আমার জানা আছে; আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম, আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌নার — ওটা রোগিনীর নাম — আমার প্রতি ভালোবাসা ছিল না, ছিল, যাকে বলে একটি বন্ধুত্বের প্রবণতা — আমার প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব বা অন্য কিছু। যদিও সে নিজেই হয়ত এই ভাবটিকে ভুল বুঝেছিল, তবু যাই হোক, ওই ছিল তার মনোভাব; এবার আপনি নিজেই বুঝে নিতে পারেন ব্যাপারটা। কিন্তু," আরো বললেন ডাক্তার, এক নিশ্বাসে এবং স্পষ্ট বিব্রতভাবে সমস্ত অসংলগ্ন কথাগুলো বলে ফেলেছিলেন তিনি, "আমি বোধহয় একটু অবান্তর কথাই বলে ফেলেছি — আপনি এ সবকিছু বুঝবেন না ... যাক, এবার আপনার অনুমতি নিয়ে সব কথাগুলো সাজিয়ে বলি।"

এক গেলাস চা খেয়ে ডাক্তার এবার অনেকখানি শান্ত স্বরে বলতে শুরু করলেন।

"হ্যাঁ, তারপর। আমার রোগিনীর অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হয়ে চলল।

আপনি তো ডাক্তার নন, মশাই, ডাক্তারের যখন প্রথম ধারণা হতে থাকে রোগকে সে বাগ মানাতে পারছে না তখন, বিশেষ করে প্রথমটা, তার মনে কী যে হতে থাকে তা আপনি বুঝতে পারবেন না। তাঁর আত্মবিশ্বাস কোথায় যায়? সে হঠাৎ এত ভয় পেয়ে যায় যে অবস্থাটা বর্ণনা করা যায় না। তখন তার মনে হয় যা কিছু জানা ছিল সব ভুলে গেছে, মনে হয় রোগীর কোনো আস্থা নেই তার ওপর, অন্যান্য সবায়ের নজরে পড়ে তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তারা তখন রোগের লক্ষণগুলো বলে নেহাৎ অনিচ্ছায়, সবাই সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকায় ডাক্তারের দিকে, ফিসফাস করে কথা বলে... ওঃ সে কি ভয়ানক! তার মনে হয় খুঁজে বের করতে পারলে এ অসুখের নিশ্চয় কোনো ওষুধ আছে। সেটা কি এই ওষুধটা? দিয়ে দেখা গেল — না, এটা তো নয়, তখন ওষুধের ফল পাবার সময় পর্যন্ত সে দেয় না... একবার এটা, একবার অন্য ওষুধটা আঁকড়ে ধরে। হয়ত খুলে বসে ওষুধের বই — ভাবে, এই তো পেয়ে গেছি! কখনো বরাত জোরে হঠাৎ একটা ওষুধের সন্ধান পায়; ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেবার কথা ভাবে... কিন্তু এ দিকে মানুষ একজন মারা যাচ্ছে যে, অন্য কোন ডাক্তার হয়ত তাঁকে বাঁচতে পারতেন। তখন সে বলে, 'একটু পরামর্শ করতে হয়; একলার ওপর আমি দায়িত্ব নিতে পারি না।' আর সে অবস্থায় কী যে বোকা বনে যেতে হয়! কিন্তু সময়ে এ সব সইতে শেখে সে; তখন আর কিছুই এসে যায় না তার। মানুষ একজন মরে গেল — কিন্তু সেটা তার দোষ নয়; সে তো নিয়মমাফিক চিকিৎসা করে গেছে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণা সে ভোগ করে যখন দেখে তার ওপর সকলের অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে, অথচ সে নিজে বুঝছে যে কোনো কাজে লাগছে না। আমাতে ঠিক এই অন্ধ বিশ্বাসই ছিল আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌নার সমগ্র পরিবারের; তাঁরা ভাবতেও পারেননি যে মেয়েটির অবস্থা সঙ্গীন। আমিও আমার দিক থেকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছি: না, ও কিছু নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছিল। যন্ত্রণার ওপর যন্ত্রণা, রাস্তাঘাটগুলো এমন হয়েছে যে, ওষুধ আনতে গিয়ে সহিস দিনের পর দিন ধরে আর ফিরে আসতে পারল না। আমি রোগিনীর ঘর ছেড়ে নড়িনি একটুও, সরে যেতে পারিনি; তাকে, বুঝলেন, মজার মজার গল্প বলে যেতাম, তাস খেলতাম তার সঙ্গে। রাত্রে পাশে বসে থেকে লক্ষ্য রাখতাম তার দিকে, বৃদ্ধা জননী সাশ্রু নয়নে আমাকে ধন্যবাদ

জানাতেন; কিন্তু আমি মনে মনে ভাবতুম, 'আমি তো যোগ্য নই আপনার কৃতজ্ঞতার।' খোলাখুলি স্বীকার করছি আপনার কাছে — এখন আর লুকিয়ে রাখার কোনো কারণ নেই — আমি প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমার রোগিনীর। এবং আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌নাও আমার অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল; এক এক সময় আমাকে ছাড়া আর কাউকে ঘরে থাকতে দিত না। আমার সঙ্গে সে কথা বলত, আমাকে জিজ্ঞেস করত: কোথায় পড়াশুনা করেছি, কী ভাবে থেকেছি, আমার আত্মীয়-স্বজন কারা, কাদের দেখতে যাই আমি। আমি বুঝতুম যে কথাবার্তা বলা তার উচিত নয়, কিন্তু তাকে বারণ করা — জোর করে বারণ করা — সে আমি কিছুতেই পারতাম না, জানেন! এক এক সময় হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরতাম, মনে মনে প্রশ্ন করতাম, 'কী করছ তুমি, পশু কোথাকার?' আর সে আমার হাতখানা টেনে ধরে রাখত, বহুক্ষণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে, তারপর ফিরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলত, 'কী ভালো আপনি!' তার হাত দুটো এমন জ্বরতপ্ত অস্থির, চোখ দুটি এমন বড়ো আর দুর্বল, শান্ত... 'হ্যাঁ,' বলত সে, 'আপনি ভারি ভালো, ভারি দয়ালু, আমাদের প্রতিবেশীদের মতো নন আপনি। এর আগে আপনাকে আমি চিনলুম না কেন?' আমি বলতুম, 'আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌না, শান্ত হোন। আমার মনে হচ্ছে, বিশ্বাস করুন,... কী যে লাভ আমার হয়েছে জানি না... কিন্তু, কিন্তু শান্ত হোন আপনি। সব ঠিক হয়ে যাবে; আপনি আবার ভালো হয়ে উঠবেন।'" তারপর ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে ভ্রূ দুটি উঁচিয়ে বলে চললেন, "হ্যাঁ, আর একটি কথা বলে রাখি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা ছিল খুবই কম, প্রায় কিছু ছিল না বললেই চলে, কারণ দরিদ্র প্রতিবেশীরা ওঁদের সমস্তরের লোক ছিল না, আর ওঁদের আত্মমর্যাদা ধনীদের সঙ্গে মাখামাখির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি বলতে পারি, ওঁরা ছিলেন অসামান্য মার্জিত একটি পরিবার, কাজেই বুঝতে পারেন, আমার পক্ষে ব্যাপারটা কী রকম তৃপ্তিদায়ক ছিল। মেয়েটি কেবল আমার হাত থেকেই ওষুধ খেত। আমাকে ধরে উঠত বেচারী, ওষুধটা খেয়ে নিত, আর তাকিয়ে থাকত আমার দিকে... আমার হৃদয় যেন ফেটে যাচ্ছে এমন মনে হত। আর এদিকে তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ, আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছিল; মনে মনে ভাবতুম, ও মরে যাবে, নিশ্চয় মরে যাবে। বিশ্বাস করুন, তার চেয়ে আগে

মরতে পারলে বাঁচতুম; আর তার মা আর বোনেরা দেখতেন আমাকে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতেন... আমাতে তাঁদের আস্থা টুটে ক্ষয়ে যাচ্ছিল। 'কি? ও কেমন আছে?' 'হুঁ, ভালো, ভালোই আছে!' ভালোই বটে! মনের শক্তি হারিয়ে যাচ্ছিল আমার। যাক সে কথা, আর একটি রাত্রি, একলা বসেছিলাম রোগিনীকে নিয়ে। পরিচারিকাটিও ছিল, পুরোদমে নাক ডাকিয়ে যাচ্ছিল; বেচারীর অবশ্য কোনো দোষ আছে বলে আমার মনে হল না: সেও শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সেদিন সারা সন্ধ্যা আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌নার খুব খারাপ কেটেছে, জ্বরের ঘোর। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সে ছটফট করে কাটাল, অবশেষে মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে; অন্তত, একেবারে না নড়েচড়ে শুয়ে রইল চুপচাপ। ঠাকুরের মূর্তির সামনে ঘরের কোণে প্রদীপটি জ্বলছে। আর আমি, জানলেন, মাথা নিচু করে বসেছিলাম, একটুখানি তন্দ্রাও এসেছিল। অকস্মাৎ মনে হল, পাশ থেকে কে যেন স্পর্শ করল আমাকে; ঘুরে দেখলাম... হা ঈশ্বর! আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌না অখণ্ড একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে... তার ঠোঁট দুটি ফাঁক করা, গাল দুটো যেন পুড়ে যাচ্ছে। 'কী, ব্যাপার কী? কী হয়েছে?' 'ডাক্তারবাবু, আমি কি মরে যাবো?' 'কি আশ্চর্য, করুণাময় ঈশ্বর!' 'না, ডাক্তারবাবু, না; দয়া করে আর বলবেন না যে আমি বাঁচব... ওকথা বলবেন না আর... যদি জানতেন আপনি... শুনুন, ঈশ্বরের দোহাই, আমার আসল অবস্থাটা লুকোবেন না,' বলতে বলতে সে হাঁপাতে লাগল ভয়ানক। 'যদি নিশ্চয় জানতে পারি যে মারা আমি যাবই, তাহলে সব কথা বলব আপনাকে, সব কথা, সব!' 'আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌না, মিনতি করছি আপনার কাছে!' 'শুনুন, আমি ঘুমিয়ে পড়িনি একেবারেই। অনেকক্ষণ ধরে আপনার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। ঈশ্বরের দোহাই!... আপনাকে আমি বিশ্বাস করি; আপনি ভালো লোক, সৎ লোক আপনি, পৃথিবীতে যা কিছু পবিত্র আছে তার নামে অনুনয় করে বলছি — আমাকে সত্যি কথাটা বলুন! যদি জানতেন আমার পক্ষে কত জরুরী ... ডাক্তারবাবু, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে আপনি বলুন... আমার অবস্থা কী কঠিন?' 'আপনাকে কী বলতে পারি, আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌না, বলুন?' 'ঈশ্বরের দোহাই, আপনার হাত ধরে অনুরোধ করছি, ডাক্তারবাবু।' তখন আমি বললুম, 'আপনার কাছ থেকে গোপন করতে পারি না, আলেক্সান্দ্রা

আন্দ্রেয়েভ্‌না: আপনার জীবন অবশ্যই বিপন্ন, কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়।' 'আমি মরব, মরে যাব আমি।' মনে হল, সে ভারি খুশি হয়েছে; মুখ চোখ তার এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আমি ভয় পেয়ে গেলাম। 'ভয় পাবেন না, আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন! মরণকে আমি একেবারে ভয় করি না।' হঠাৎ সে উঠে বসল এবং কনুইয়ের ওপর ভর করে রইল। 'এখন ... হ্যাঁ, এখন বলতে পারি, আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সমস্ত মন দিয়ে... বলতে পারি যে, আপনি ভালো, আপনি দয়ালু: আপনাকে আমি ভালোবাসি!' আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলুম তার দিকে; আপনি তো জানেন, ব্যাপারটা আমার পক্ষে কী সাংঘাতিক। 'শুনছেন, আপনি শুনছেন, আমি ভালোবাসি আপনাকে!' 'আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌না, আমি তার যোগ্য হলাম কী করে—' 'না, না, আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন না, তুমি বুঝতে পারছো না!' এবার অকস্মাৎ সে তার বাহু প্রসারিত করে দিল, তারপর আমার মাথা আঁকড়ে ধরে চুমু খেল। বিশ্বাস করুন, প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলাম। হাঁটু গেড়ে বসে বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিলুম। সে কথা কইল না; আমার চুলের মধ্যে তার আঙুলগুলি কাঁপতে লাগল, কান পেতে শুনলাম ও কাঁদছে। আশ্বাস দিতে লাগলাম, সান্ত্বনা দিলাম... কী তাকে বলেছিলাম সত্যি জানি না। বললুম, 'মেয়েটা জেগে উঠবে যে, আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌না, ধন্যবাদ ... বিশ্বাস করুন আমাকে... শান্ত হন।' সে জেদ করে বলল, 'থাক থাক, হয়েছে! ওদের কথা ভুলে যান, জাগুক না; ওরা সবাই আসুক—ওতে কিছু যায় আসে না; আমি তো মারা যাচ্ছি, দেখছেন... আর ভয় কি? আপনি কি ভয় পেয়েছেন? মাথাটা তুলুন। না কি আপনি ভালোবাসেন না আমাকে; আমি ভুল করেছি হয়ত। তাই যদি হয়, আমাকে মাপ করবেন।' 'কী বলেছেন আপনি আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌না... আপনাকে ভালোবাসি আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্‌না!' সোজা সে তাকাল আমার চোখে, তার বাহু দুটি উন্মুক্ত বিস্তার করে দিল। 'তাহলে আমায় বুকে নিন।' সত্যি বলছি আপনাকে, সে রাত্রিতে কেন যে পাগল হয়ে যাইনি জানি না। বুঝতে পারছিলাম, আমার রোগিনী নিজের সর্বনাশ করছে; দেখলাম সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নেই। এও জানতাম যদি নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা না বুঝত তাহলে আমার কথা ভাবতও না ও;

আর, যাই বলুন আপনি, পঁচিশ বছর বয়সে প্রেমের পরিচয় না পেয়ে মরে যাওয়া খুবই শক্ত; এইটেই তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল; এই জন্যেই মরীয়া হয়ে সে আমাকে ধরেছিল আঁকড়ে — এখন বুঝতে পারছেন? কিন্তু সে আমাকে তার বাহুতে বেঁধেই রাখল, কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। আমি বললুম, 'আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্না, দয়া করুন আমাকে, নিজের প্রতিও কি মায়া হয় না!' ও বলল, 'কেন? ভাবার কী আছে? আপনি তো জানেন আমি মরেই যাব।' এই একটা কথা সে অবিরাম আউড়ে গেল। 'যদি বুঝতাম যে বেঁচে উঠব, আবার ধীরস্থির তরুণী হয়ে উঠব, তাহলে লজ্জিত হতাম, ... নিশ্চয় ... হতাম লজ্জিত ... কিন্তু এখন আর কেন?' 'কিন্তু কে বলল আপনি মরবেন?' 'উঁহু, ছাড়ুন ও কথা; আমাকে ঠকাতে পারবেন না; আপনি মিছে কথা বলতেও জানেন না — নিজের মুখের দিকে দেখুন তাকিয়ে।' 'আপনি নিশ্চয় বাঁচবেন, আলেক্সান্দ্রা আন্দ্রেয়েভ্না, আমি বাঁচাবই আপনাকে; আপনার মায়ের আশীর্বাদ চেয়ে নেব আমরা... আমরা মিলিত হব—সুখী হব আমরা।' 'না, না, আমি আপনার কথা পেয়েছি, আমি মরবই ... আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাকে ... আমায় বলেছেন।' আমার পক্ষে ব্যাপারটা ভারি কঠোর, বহু কারণে কঠোর। সামান্য জিনিসও সময় সময় কী করতে পারে দেখুন, মনে হয় ওটা কিছু নয়, কিন্তু বড়ো বেদনাদায়ক। অকস্মাৎ কি খেয়াল হল, আমাকে ও জিজ্ঞেস করল, আমার নাম কি, পদবী নয়, নামটাই জানতে চাইল। দুর্ভাগ্য আমার, নাম আমার ত্রিফন। হ্যাঁ, সত্যি, ত্রিফন ইভানীচ। বাড়ির প্রত্যেকে আমাকে ডাকত ডাক্তার বলে। সে যাই হোক, উপায় নেই। আমি বললুম, 'ত্রিফন, মাদমোয়াজেল।' ও ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ল, ফরাসী ভাষায় কী যেন বলল বিড় বিড় করে — আঃ হা, নিশ্চয় অপ্রিয় কিছু! — এরপর হাসল — সে হাসিও অপ্রীতিকর। যাই হোক, এই ভাবে সারা রাত কাটালুম ওর সঙ্গে। সকালের আগে চলে এলাম, মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে গেছি। আবার যখন ওর ঘরে ঢুকলাম তখন দিনের বেলা, সকালের চা খাওয়া হয়ে গেছে। হা ঈশ্বর! আমি প্রায় চিনতেই পারিনি ওকে; কবরে শোয়ানোর আগেও লোককে এর চাইতে ভালো দেখায়। আপনাকে শপথ করে বলছি, জানি না আমি, — কিছুতেই বুঝতে পারি না এখন — কী করে সেই সব দিন কাটিয়েছি। তিন দিন তিন রাত্রি তবু টিকে

রইল আমার রোগিনী। আর কী সেই রাত্রি, কত কথাই না আমাকে ও বলেছে! একেবারে শেষের রাত্রিতে, কল্পনা করতে পারেন! — ওর কাছে বসেছিলাম, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম একটি মাত্র অনুগ্রহের: 'ওকে নাও, ভগবান,' বললুম মনে মনে, 'তাড়াতাড়ি নাও, আর ওর সঙ্গে নাও আমাকে।' অকস্মাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধা জননী এলেন ঘরে। আগে সন্ধ্যার সময়েই তাঁকে — মাকে — বলেছিলাম, আশা আর প্রায় নেই, এখন পাদ্রী ডেকে পাঠানো ভালো। রুগ্না মেয়েটি মাকে দেখে বলল, 'তুমি এসেছ খুব ভালো হয়েছে: আমাদের দেখো মা, আমরা ভালোবাসি পরস্পরকে — আমরা কথা দিয়েছি একে অপরকে।' 'কী বলছে ও, ডাক্তারবাবু? কী বলছে?' আমি একেবারে বিবর্ণ হয়ে পড়লুম। বললুম, 'স্বপ্ন দেখছে, ভুল বকছে। জ্বর তো!' কিন্তু ও বলল, 'চুপ চুপ; এইমাত্র সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছেন আপনি, আমার আংটি নিয়েছেন। এখন মিছে ভান করছেন কেন? মা আমার ভারি ভালো — মা ক্ষমা করবেন — বুঝবেন সব কথা — আমি যে মরে যাচ্ছি। মিছে কথা বলার কোনো দরকার নেই আমার; আপনার হাতখানা দিন তো।' লাফিয়ে উঠলাম, ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বৃদ্ধা সব কথা অবশ্যই অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন।

"আপনাকে আর বেশি বিরক্ত করব না, আর আমার পক্ষে ব্যাপারটা মনে করাও যে কি যন্ত্রণার! পরদিন আমার রোগিনী মারা গেল। ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন!" ডাক্তার বললেন আবার, বললেন দ্রুত স্বরে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে। মৃত্যুর পূর্বে সে তার পরিবারের সবাইকে বলল ঘর ছেড়ে চলে যেতে, আমার কাছে তাকে একলা রেখে যেতে।

সে বলল, 'ক্ষমা করুন আমায়। আপনার প্রতি বোধহয় অন্যায় করেছি ... আমার অসুখটা ... কিন্তু বিশ্বাস করুন আমায়, আপনার থেকে আর কাউকে আমি বেশি ভালোবাসিনি ... ভুলে যাবেন না আমাকে ... এই নিন, আংটিটা রাখবেন।'"

ডাক্তার মাথা ফেরালেন; আমি ধরলাম তাঁর হাতখানা।

তিনি বললেন, "আঃ যাক, অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি আসুন, না কি অল্প বাজি রেখে প্রেফারেন্স খেলবেন? আমার মতো লোকের এত বড় ভাবাবেগ প্রকাশ করা চলে না। আমার ভাবনা-চিন্তার বিষয় আছে একটি

মাত্র: ছেলেমেয়েরা যেন না কাঁদে, আর স্ত্রী যেন কটু ভর্ৎসনা থেকে বিরত থাকেন। সেই ঘটনার পর, বুঝলেন, সেই যে বলে বৈধ বিবাহ, তার সময় এল। হ্যাঁ, এক বণিক কন্যাকে ঘরে এনেছি — সঙ্গে যৌতুক সাত হাজার। তাঁর নাম আকুলিনা, ত্রিফনের সঙ্গে বেশ থাপ খায়। ভারি বদমেজাজী স্ত্রীলোক, জানলেন, কিন্তু কপাল ভালো — তিনি ঘুমিয়ে থাকেন সারা দিন... কি, প্রেফারেন্স খেলবেন?"

কোপেক পয়েণ্ট বাজি ধরে প্রেফারেন্স খেলতে বসলাম। ত্রিফন ইভানীচ আমার কাছ থেকে জিতে নিলেন আড়াই রুবল, দেরী করে বাড়ি ফিরলেন, জিততে পেরেছেন বলে বেশ খুশি হয়েই ফিরলেন।

আমার প্রতিবেশী রাদীলভ

হেমন্ত কালে কাদাখোঁচারা প্রায়ই লাইম গাছের পুরনো বাগানগুলিতে আশ্রয় নেয়। আমাদের অরেল প্রদেশে এমনি বহু বাগান আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখনই বাসস্থানের জমি বাছাই করতেন, তখনই লাইম গাছের বীথিওয়ালা ফলের বাগান করার জন্য ভালো দু'একর জমি চিহ্নিত করে রাখতে ভুলতেন না। গত পঞ্চাশ, কিংবা খুব বেশি হলে সত্তর বছরের মধ্যে এই সব অট্টালিকা — যাদের কথায় বলে — 'কুলীন বাড়ি' — পৃথিবীর বুক থেকে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে; বাড়িগুলি ভেঙে-চুরে যাচ্ছে, কিংবা অন্য বাড়ি তৈরির মালমসলা হিসাবে বিক্রি হয়ে গেছে; পাথরে গড়া বার-বাড়ি ইঁট পাথরের স্তূপে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে; আপেল গাছগুলো মৃত, তা দিয়ে হয় শুধু জ্বালানী কাঠ, বেড়াগুলো ভেঙে তুলে ফেলা হয়। শুধু লাইম গাছগুলি ঠিক আগের মতোই ঐশ্বর্য নিয়ে গড়ে ওঠে, আর চতুর্দিকে চষা জমির মাঝে দাঁড়িয়ে তারা এ কালের লঘুচিত্ত মানুষের কাছে যেন বলে যায়, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের, আমাদের অগ্রজদের কথা, যাঁরা জীবন কাটিয়ে গেছেন আমাদের পূর্বে।'

প্রাচীন লাইম গাছ বড় সুন্দর গাছ। রুশী চাষীর নির্মম কুঠারও তাকে রেহাই দেয়। এর পাতা ছোটো, প্রবল শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে, নিচে চিরস্থায়ী ছায়া।

একদা, ইয়েরমলাইকে সঙ্গে নিয়ে তিতির খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মাঠ প্রান্তর ঘুরে ঘুরে, কিছু দূরে দেখলুম একটি পরিত্যক্ত বাগান, ঢুকলাম তার মধ্যে। বাগানে ঢুকতে না ঢুকতে খট্ খট্ করতে করতে একটা কাদাখোঁচা উঠে এল

একটি ঝোপ থেকে। গুলি ছুঁড়লাম, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা দূরে শুনলাম একটা আর্তনাদ; গাছের সারির আড়াল থেকে মুহূর্তের জন্য একটি তরুণীর আতঙ্কিত মুখ উঁকি মারল, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইয়েরমলাই ছুটে এল আমার কাছে। "আপনি এখানে গুলি ছুঁড়ছেন কেন? এখানে যে জমিদার থাকেন একজন।"

জবাব দেবার সময় পাবার আগেই, গুলি করা পাখিটাকে নিয়ে ভারিক্কি চালে আমার কুকুরটা আসবার আগেই, দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল; একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ বেরিয়ে এলেন ঝোপের ওদিক থেকে; মুখে তাঁর গোঁফ একজোড়া, অপ্রসন্নভাবে আমার সামনে এসে থামলেন। যথাসম্ভব মার্জনা চাইলুম, আমার নাম বললুম, তাঁর সম্পত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে পাখিটি মেরেছি তা দিতে চাইলুম তাঁকে।

একটু মুচকে হেসে তিনি বললেন, "বেশ, আপনার শিকার আমি নিতে পারি, কিন্তু একটি শর্তে, আমাদের সঙ্গে থেকে আহারাদি সম্পন্ন করবেন, বলুন।"

স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর এ প্রস্তাবে খুব খুশি আমি হইনি, কিন্তু তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ না করা ছিল অসম্ভব।

নব-পরিচিত লোকটি বলে চললেন, "আমি এখানকার একজন জমিদার, আপনার প্রতিবেশী রাদীলভ; আমার নাম শুনেছেন বোধহয়। আজ রোববার, আমাদের খাওয়া দাওয়া আজ নিশ্চয় ভালো হবে, নইলে নেমন্তন্ন করতাম না আপনাকে।"

এমনতর অবস্থায় যেমন সাজে তেমন জবাব দিলাম, তারপর তাঁকে অনুসরণ করলাম। এক টুকরো পথ, ক'দিন মাত্র হল পরিষ্কার করা হয়েছে; পথটি শেষ হতেই বেরিয়ে এলাম লাইম বীথি থেকে, এসে পড়লাম সব্জি বাগানে। পুরনো আপেল গাছগুলো আর গুসবেরির ঘন ঝোপের মাঝে সারি সারি বহু শাদা সবুজ বাঁধাকপির তরঙ্গিত সমারোহ; উঁচু দীর্ঘ দণ্ডের চারদিকে জড়িয়ে জাড়িয়ে উঠেছে লতাতন্তু; শুকনো মটরকলাই ভর্তি বাদামী শাখাগুলোর ঘন সারি এদিকে; বড়ো বড়ো চ্যাপটা কুমড়োগুলো যেন মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে; ধুলোয় ঢাকা কোনাকাটা পাতার আড়াল থেকে শশাগুলোকে হলুদ বর্ণের মনে হয়; বেড়ার পাশ দিয়ে লম্বা বিছুটি গাছগুলো দুলছে;

দু'তিন জায়গায় বেড়ে উঠেছে তাতার দেশীয় লতাপুষ্পের গুচ্ছ, এলডার এবং বন-গোলাপের ঝাড় — পুরনো দিনের ফুল-বাগিচার অবশেষ। লালচে আঁটাল জলে ভরা ছোটো একটি মাছ-পুকুরের কাছে দেখলুম কূপটি, চারদিকে খানা; খানাগুলোয় ঝপাত ঝপাত করে ভেসে যাছে পাতিহাঁস; সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপিয়ে আর চোখ মিট মিট করতে করতে মাঠে বসে হাড় চিবুচ্ছে একটা কুকুর, মাঠে ঘুরে ঘুরে মন্থর গতিতে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে একটি নানা রঙের গরু, মাঝে মাঝে সরু পিঠটার ওপর দিয়ে ঝট করে ল্যাজ বুলিয়ে আনছে। ছোটো পথটি এবার বাঁক ঘুরেছে একদিকে; উইলো এবং বার্চ গাছের ঘন সারির পেছন থেকে দেখা গেল একটি ছোটো পুরনো ধূসর বাড়ি, তার ছাদ কাঠের আর সিঁড়িগুলো ঘোরানো। রাদীলভ হঠাৎ থেমে গেলেন।

আমার দিকে সোজা খোসমেজাজী দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কিন্তু, একটু ভেবে চিন্তে নিয়ে... আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে ঠিক আসতে চান না। তাই যদি হয় —"

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে আশ্বাস দিয়ে বললুম, বরং তাঁর সঙ্গে আহার করে আমি বিশেষ তৃপ্তিই পাবো।

"বেশ, আপনিই জানেন ভালো।"

বাড়ির মধ্যে গেলাম। ঘরের সিঁড়িতে আমাদের সঙ্গে দেখা হল একটি যুবকের, গায়ে মোটা নীল কাপড়ের লম্বা কোট। রাদীলভ সঙ্গে সঙ্গে তাকে বললেন, ইয়েরমলাই-এর জন্য কিছু ভদকা এনে দিতে; বদান্য গৃহকর্তার পেছনে আমার শিকারী সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াল। বড়ো হল-ঘরটা বহু রকমের রঙীন চিত্রে এবং পাখির খাঁচা দিয়ে সাজানো, হল-ঘরটি ছাড়িয়ে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করলুম আমরা — এটি রাদীলভের পাঠকক্ষ। শিকারের সাজসজ্জা খুলে ফেললুম, একটি কোণে রেখে দিলুম বন্দুকটি; লম্বা কোটওয়ালা যুবকটি দ্রুত আমার দেহে বুরুশ বুলিয়ে পরিচ্ছন্ন করে দিল।

রাদীলভ অমায়িকভাবে বললেন, "আচ্ছা, এবার তাহলে চলুন বৈঠকখানায় যাই। আমার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

তাঁর পিছু গেলুম। বৈঠকখানায়, ঠিক মাঝখানে একটি সোফার ওপর বসেছিলেন মাঝারি দৈর্ঘের একটি বৃদ্ধা মহিলা, পরনে দারুচিনি রঙের

পোষাক, মাথায় শাদা টুপি, মুখখানা পাতলা এবং দয়ালু, তাতে বার্ধক্যের ছাপ, মুখের অভিব্যক্তি করুণ, ভীরুতা জড়িত।

"এই যে, মা, এসো তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, আমাদের প্রতিবেশী..."

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে একটু নমস্কার করলেন, কিন্তু শুকনো হাত থেকে মোটা নরম রেশমী সুতোর গেঁজেটি ছাড়লেন না; গেঁজেটি দেখতে অনেকটা থলের মতো।

চোখ পিট পিট করতে করতে মৃদু শান্ত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের কাছাকাছি অনেক কাল আছেন নাকি আপনি?"

"না, বেশি দিন নয়।"

"বেশি দিন থাকতে চান নাকি এদিকে?"

"তা, শীতকাল অবধি তো মনে করছি।"

বৃদ্ধা আর কোনো কথা কইলেন না।

একটি রোগা ঢ্যাঙ্গা লোক — বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করেই আমি লক্ষ্য করিনি তাকে, তাকে দেখিয়ে মাঝখান থেকে রাদীলভ বললেন, "আর এই হচ্ছে ফিওদর মিখেইচ... এই যে, ফেদিয়া, এসো, অতিথিকে তোমার শিল্প-নিদর্শন কিছু দেখাও। ওই কোণে লুকিয়েছ কেন গিয়ে?"

ফিওদর মিখেইচ চেয়ার থেকে উঠল তৎক্ষণাৎ, জানালা থেকে নিয়ে এল হতচ্ছাড়া গোছের ছোটো একটা বেহালা, ছড়টা হাতে নিল — স্বাভাবিক নিয়মমাফিক এক দিকে না ধরে ধরল তার মাঝখানটিতে — বেহালাটি বুকে ঠেকাল, তারপর চোখ বুজে লেগে গেল নাচতে, সঙ্গে সঙ্গে গান চলল আর বেহালার তারে খর খর করে ছড় ঘষতে লাগল। তার বয়স মনে হল সত্তর; পাতলা একটি নানকিন ওভারকোট তার শুকনো অস্থিসার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে করুণভাবে পত্ পত্ করে ঘা খেতে লাগল। সে নাচছে, মাঝে মাঝে সাহস করে লাফ দিচ্ছে, তারপর অস্থিচর্মসার ঘাড়টি প্রসারিত করে ছোটো টেকো মাথা নুইয়ে দিচ্ছে, মাটির ওপর থপ থপ করে পা ফেলছে আর কখনো বা স্পষ্টত সক্লেশে হাঁটু ভাঙছে। দন্তহীন তার মুখবিবর থেকে বেরিয়ে এল বার্ধক্য-বিদীর্ণ একটি কণ্ঠস্বর।

আমার মুখের ভাব দেখে বোধহয় রাদীলভ আঁচ করলেন যে ফিওদরের “শিল্প” আমাকে খুব একটা আনন্দ দেয়নি।

তিনি বললেন, “বেশ হয়েছে বুড়ো, আর থাক, এবার গিয়ে দক্ষিণা নিতে পারো।”

তৎক্ষণাৎ ফিওদর মিখেইচ বেহালাটি রাখল জানালার তাকে, তারপর আমি অতিথি — প্রথমে আমাকে, তারপর বৃদ্ধা মহিলাটিকে এবং সব শেষে রাদীলভকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল বেরিয়ে।

আমার নতুন বন্ধু বলে চললেন, “এ লোকটিও জমিদার ছিল একজন, আর বেশ ধনী জমিদারই, কিন্তু ও নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে — এখন তাই আমার সঙ্গে থাকে। কিন্তু ওর দিনকালে সারা প্রদেশে সব থেকে প্রাণবন্ত লোক বলেই ওকে মনে করা হত, দুটি বিবাহিতা নারীকে নিয়ে ও পালিয়ে গেছল, অনেক গায়ক গায়িকা রেখেছিল, নিজেও গান গাইত, নাচত রীতিমত পারদর্শী শিল্পীর মতো... কিন্তু একটুখানি ভদকা পান করবেন না আপনি? খাবার এই হল বলে।”

একটি তরুণী এল ঘরে, বাগানে একেই দেখেছিলাম এক ঝলক।

রাদীলভ মাথাটা একটুখানি ঘুরিয়ে বলল, “আর এই হল ওল্‌গা। পরিচয় করিয়ে দিই ... আচ্ছা, চলুন খেতে বসি গিয়ে।”

গিয়ে বসলাম খাবার টেবিলে। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে আসনে বসছি, দেখলুম ফিওদর মিখেইচ “দক্ষিণার” ফলে উজ্জ্বল চোখ আর নাক লাল করে গাইছে “জয়ধ্বনি করো”, তার জন্যে এক কোণে একটি ছোটো নিরাবরণ টেবিলে খাবার দেওয়া হল। গরীব বৃদ্ধ বেচারীর অভ্যাস-টভ্যাস-গুলো খুব শোভন ছিল না, কাজেই লোকজনের সমাজ থেকে তাকে একটু দূরে দূরেই রাখা হত। বুকে ক্রুশের চিহ্ন করে, একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে সে হাঙ্গরের মতো খেতে লাগল। ভোজের আয়োজনটি বাস্তবিক মন্দ ছিল না, আর রবিবার বলে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল টাটকা জেলি এবং স্পেনদেশীয় পেস্ট্রির রাশি। রাদীলভ এক পদাতিক বাহিনীতে কাজ করেছেন দশ বছর, তুরস্ক ঘুরে এসেছেন; খাবার টেবিলে বসে নানা ঘটনা তিনি বর্ণনা করে যেতে লাগলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলাম তাঁর কথা আর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম ওল্‌গাকে। খুব সুন্দরী সে নয়; কিন্তু

তার মুখের শান্ত দৃঢ় অভিব্যক্তিটি, তার শুভ্র প্রশস্ত কপাল, তার ঘন চুল এবং বিশেষ করে তার বাদামী চোখ দুটি — খুব বড়ো নয় চোখ দুটি, কিন্তু স্বচ্ছ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রাণবন্ত — আমার জায়গায় অন্য যে কোনো লোকের মনেও রেখাপাত করত। রাদীলভের উচ্চারিত প্রতিটি কথা যেন সে মন দিয়ে শুনছে — সংবেদনা নয়, মুখের ওপর ফুটে উঠেছে নিবিড় একটি অভিনিবেশের ভাব। বয়সের হিসাবে বিচার করলে রাদীলভ তার বাবা হতে পারেন, রাদীলভ ডাকছেনও তাকে তার আদ্য নাম ধরে, কিন্তু এক মুহূর্তে আমি আঁচ করে ফেললাম যে সে তাঁর কন্যা নয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মৃতা পত্নীর কথা উল্লেখ করলেন, — ওল্‌গাকে দেখিয়ে বললেন, "ওর বোন," আচমকা সে খুব লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল। এক মুহূর্ত থামলেন রাদীলভ তারপর বিষয় পরিবর্তন করলেন। খাওয়া দাওয়ার পুরো সময়টার মধ্যে একটি কথাও বললেন না বৃদ্ধা; নিজে প্রায় খেলেন না কিছুই, আমাকেও বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন না খেতে। তাঁর চোখে মুখে একটি ভীরু আশাহত প্রতীক্ষার ছাপ, বার্ধক্যের সেই বিষণ্ণ অভিব্যক্তি যা দেখলে মর্ম বিদীর্ণ হয়ে যায়। খাওয়া শেষ হলে ফিওদর মিখেইচ গৃহকর্তা এবং অতিথিদের "প্রশংসা" করার উদ্যোগ করছিল, কিন্তু রাদীলভ আমার দিকে তাকিয়ে তাকে নিরস্ত হতে বললেন; বৃদ্ধ তার ঠোঁটের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিল, চোখ পিট পিট করে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল, তারপর আবার গিয়ে বসল, এবার কিন্তু চেয়ারের একেবারে এক প্রান্তে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাদীলভের সঙ্গে এলুম তাঁর পড়ার ঘরে।

একটি আইডিয়ায় কিংবা একটি আবেগে যাদের মনোযোগ ও চিন্তা নিরত এবং তীক্ষ্নভাবে নিবদ্ধ থাকে, গুণাগুণে, যোগ্যতায়, সামাজিক মর্যাদায় এবং শিক্ষা দীক্ষায় যতই কেন না তারা পৃথক হোক, তাদের চালচলনে বাইরে থেকে একটি সাদৃশ্য, একটা কিছু না কিছু সমানুরূপ ভাব দেখা যায়। রাদীলভকে যতই দেখছিলাম ততই আমার মনে হচ্ছিল তিনি ওই শ্রেণীর লোক। তিনি কথা বললেন কৃষিকর্ম সম্পর্কে, শস্যাদি সম্পর্কে, যুদ্ধের সম্পর্কে, জেলার নানা গুজব গল্প এবং আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে, তাঁর কথার মধ্যে কোনো কুণ্ঠা ছিল না, এমন কি বেশ আগ্রহ নিয়েই কথা বলছিলেন; কিন্তু সহসা হয়ত দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চেয়ারে বসে পড়বেন ধপ করে,

মুখের ওপর হাত বুলোবেন, যেন কষ্টকর একটা দায়িত্ব পালন করে তিনি বড়ো ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর সমস্ত প্রকৃতি — যদিও তা সহৃদয় এবং আন্তরিক — তবু যেন তা কোনো বিশেষ একটি অনুভূতিতে পরিপূর্ণ, আবিষ্ট। অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর মধ্যে কোনো আসক্তি আবিষ্কার করতে পারিনি, না খাওয়ার প্রতি আসক্তি, না মদের প্রতি, না শিকার, না কুর্স্কের নাইটিঙ্গেল, না মৃগীরোগী পায়রার প্রতি, না রুশীয় সাহিত্যের প্রতি আসক্তি, না দ্রুতগামী ঘোড়ার প্রতি, না হাঙ্গেরীয় কোট, না তাস, না বিলিয়ার্ড, না নাচের প্রতি, না প্রাদেশিক শহর বা রাজধানীতে সফরের প্রতি আসক্তি, না কাগজ কল আর বীট চিনি শোধনাগারের প্রতি, না রঙীন মণ্ডপের প্রতি আসক্তি, না চায়ের প্রতি, না সেই জোতে-জোড়া অশ্বের প্রতি যারা মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে শেখে, তাঁর কোনো আসক্তি দেখলাম না এমন কি সেই মোটা কোচম্যানদের প্রতিও, যারা একেবারে বগল থেকে বেল্ট মুড়ি দিয়ে থাকে — সেই সব চমৎকার কোচম্যান যাদের চোখ কী যেন রহস্যময় কারণে মনে হয় ঘুরছে, আর প্রতি মুহূর্তে যেন কপাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে ... ভাবলুম, "তবে কেমনতর জমিদার ইনি?" আবার এ কথাও ঠিক যে, তিনি তাঁর অদৃষ্ট নিয়ে অসন্তুষ্ট এমন বিমর্ষভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ করেননি, মনে হয় তাঁর মধ্যে রয়েছে নির্বিশেষ শুভেচ্ছা, অমায়িকতায় তিনি পরিপূর্ণ, এমন কি যার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হোক না কেন তারই সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার জন্য তাঁর আগ্রহটি উৎকট বলেই মনে হয়। আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বোধ করবেন, বাস্তবিকই তিনি কারু বন্ধু হতে পারেন না, বাস্তবিক অন্তরঙ্গ হতে পারেন না কারু সঙ্গে, আর তা হতে পারেন না তার কারণ এই নয় যে তিনি অন্য লোক থেকে খুব স্বতন্ত্র, তার কারণ এক একটা সময় তাঁর সমস্ত সত্তা অন্তর্মুখীন হয়ে পড়ত। রাদীলভকে দেখে তাঁকে তখন কিংবা অন্য কোনো সময়ও সুখী বলে কল্পনা করতে পারিনি। তিনি বিশেষ সুদর্শনও ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চোখে, তাঁর হাসিতে, তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে কিছু একটা ছিল যা রহস্যময় এবং বিশেষ আকর্ষণীয় — হ্যাঁ, ঠিক রহস্যময়ই ছিল তা। আর সেটা এমনই যে তাঁকে আরো ভালো করে জানবার ইচ্ছে হবে আপনার, ভালোবাসতে চাইবেন তাঁকে। অবশ্য সময় সময় তাঁর মধ্য থেকে উঁকি

মারত স্তেপভূমির জমিদার এবং সাধারণ লোক, তবু যাই হোক না কেন তিনি ছিলেন চমৎকার লোক।

আমরা জেলার নতুন মার্শালের প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা শুরু করছিলাম, হঠাৎ দুয়ারে ওল্‌গার গলা শোনা গেল, "চা হয়ে গেছে।" গেলুম বৈঠকখানা ঘরে। ফিওদর মিখেইচ আগের মতোই বসে আছে ছোটো জানালা আর দোরের মাঝে তার কোণটিতে, পা দুখানা তার বাঁকা হয়ে রয়েছে। রাদীলভের মা মোজা বুনছিলেন। খোলা জানালা দিয়ে আসছে হেমন্তের নতুন আমেজ আর আপেলের গন্ধ। ওল্‌গা চা ঢেলে দিতে ব্যস্ত। খাওয়া দাওয়ার সময়ের থেকে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে এবার আমি দেখলুম তাকে। সাধারণত প্রাদেশিক অঞ্চলের মেয়েদের মতো সে কথা বলে খুব কম, কিন্তু সে যাই হোক. একটা কিছু মজার কথা, ভালো কথা বলতে হবে — তাদের এমন উদ্বেগ ওল্‌গার মধ্যে আমি দেখিনি, তাদের মূঢ়তা এবং অসহায়তার করুণ সচেতনতাও তার মধ্যে নেই; যেন অনির্বচনীয় ভাবাবেগের চাপ থেকে আসছে এমনভাবে সে দীর্ঘশ্বাস মোচন করত না, চোখ মেলে ধরত না, অস্পষ্ট এবং স্বপ্নমাখা হাসিও সে হাসত না। তার দৃষ্টিতে ছিল স্থির প্রশান্ত আত্মপ্রত্যয়ের অঙ্গীকার, যেন বিপুল সুখের শেষে কিংবা প্রচন্ড উত্তেজনার পর নিশ্বাস টেনে নিচ্ছে। তার চালচলন, চলাফেরা দৃঢ় এবং স্বচ্ছন্দ। আমার খুব ভালো লেগেছিল তাকে।

আবার রাদীলভের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম। সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার চাইতেও মানুষের ওপর বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে তুচ্ছতম জিনিস — এই সুপরিজ্ঞাত বক্তব্যটিতে আমরা কী করে উপনীত হলাম আজ তা আর মনে নেই।

কথাটি মেনে নিয়ে রাদীলভ বললেন, "হ্যাঁ, এটা আমি আমার নিজের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি জানেন, আমার বিয়ে হয়েছিল। বেশি দিন স্থায়ী হয়নি তা—মাত্র তিন বছর, স্ত্রী আমার মারা যান সন্তান প্রসব করতে গিয়ে। মনে হয়েছিল তাঁকে হারিয়ে আমি আর বেঁচে থাকব না, নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়েছিলাম, ভেঙে পড়েছিলাম, কিন্তু কাঁদতে পারিনি আমি, আবিষ্টের মতো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। যথারীতি তাঁকে সাজিয়ে টেবিলের ওপর শোয়ালো — এই ঘরটাতেই, বুঝলেন? পাদ্রী এলেন, এলেন

ডীকনরা, তাঁরা পুজো করতে লাগলেন, প্রার্থনা করলেন, ধূপ জ্বালাতে লাগলেন, আমি মাটিতে মাথা নিচু করে রাখলাম, কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়ল না আমার চোখ দিয়ে। হৃদয় যেন পাথর হয়ে গেছে, আমার মাথাটাও তেমনি — সারা দেহ যেন আমার অবশ। এমনি করে কাটল প্রথম দিনটি। বিশ্বাস করবেন আপনি — রাত্রে আমি ঘুমিয়েও ছিলাম। পরদিন সকাল বেলা দেখতে গেলুম স্ত্রীকে: দিনটা ছিল গ্রীষ্মকালের দিন, তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পড়েছে সূর্যরশ্মি, আর কী উজ্জ্বল তা! অকস্মাৎ দেখলুম ...” (রাদীলভ এবার একান্ত অনিচ্ছায় কেঁপে উঠলেন।) “কী ভাবুন তো? তাঁর একটি চোখ সম্পূর্ণ বোজানো নয়, আর সে চোখে সড় সড় করে হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা মাছি ... অবশ হয়ে পড়ে গেলুম; জ্ঞান যখন ফিরে এল কাঁদতে লাগলুম... কান্না আর থামে না...”

রাদীলভ থামলেন। তাকালুম তাঁর দিকে, তারপর ওল্‌গার দিকে ... তার মুখের সে অভিব্যক্তি আমি ভুলতে পারি না কখনো। বৃদ্ধা হাঁটুর ওপর মোজা নামিয়ে রেখেছেন, গেঁজে থেকে তুলে নিয়েছেন একখানা রুমাল, লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মুছে ফেলছিলেন তিনি। সহসা ফিওদর মিখেইচ উঠে দাঁড়াল, তার বেহালাটি টেনে নিল, তারপর উৎকট কর্কশ স্বরে গান গাইতে শুরু করল। আমাদের মন মেজাজ চাঙ্গা করে দিতে চাইছিল সে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার প্রথম সুরেই আমরা কেঁপে উঠলাম থর থর করে, রাদীলভ তখন থামতে বললেন তাকে।

তারপর তিনি বলে চললেন, “তবু যা অতীত তা অতীতই, যা অতীত তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না, আর পরিণামে...” দ্রুতবেগে তিনি যোগ করলেন, “যেমন মনে হয় ভলতেয়ার বলেছিলেন, আমাদের এই দুনিয়াতে সবকিছু ভালোরই জন্যে।”

আমি বললুম, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। তাছাড়া, সব যন্ত্রণাই সহ্য করা তো যায়; আর এমন ভয়ংকর কোনো অবস্থাই হতে পারে না যার থেকে কোনো নিষ্কৃতি নেই।”

রাদীলভ বললেন, “তাই মনে করেন আপনি? তা, বোধহয় আপনি ঠিকই বলছেন। আমার মনে আছে একবার অর্ধমৃত অবস্থায় ছিলাম তুরস্কে হাসপাতালে, টাইফাস হয়েছিল। আর, আমাদের কোয়ার্টারের গর্ব করার মত

বস্তু কিছু ছিল না — যুদ্ধের সময়, বুঝতেই পারছেন — যা ছিল তারই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে হয়! হঠাৎ আরো অনেক রোগী নিয়ে এল — কোথায় রাখবে এদের? ডাক্তার এদিক ওদিক ঘুরে দেখলেন — না, কোথাও জায়গা নেই আর। আমার কাছে এলেন তিনি, পরিচারককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বেঁচে আছে?' পরিচারক জবাব দিল, 'আজ সকালে তো ছিলেন বেঁচে।' ডাক্তার নুয়ে পড়লেন, কান পেতে শুনলেন: আমার নিশ্বাস বইছে। সহৃদয় লোকটি না বলে পারলেন না, 'বাবা, কী অদ্ভুত শরীর, মরছে লোকটা; মরবে যে তাতে সন্দেহ নেই, তবু টিঁকে আছে কোনো রকমে, ধুক ধুক করে বেঁচে আছে, মিছিমিছি জায়গাটা দখল করে রয়েছে, অন্যান্যরা জায়গা পাচ্ছে না।' আচ্ছা, মনে মনে ভাবলুম, 'তাহলে অবস্থাটা খারাপ তোমার, মিখাইল মিখালীচ ...' কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে উঠলাম, আর আজো বেঁচে আছি, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। ঠিকই বলেছেন আপনি, তাতে আর ভুল নেই।"

আমি বললুম, "যাই বলুন, আমার কথাই ঠিক। আপনি যদি মরেও যেতেন তাহলেও তো আপনার সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতেন।"

টেবিলে প্রচণ্ড এক ঘুঁসি মেরে তিনি বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই। আসল কথাটা হল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ... ভয়ঙ্কর, বিশ্রী একটা অবস্থায় থেকে ফল কী ... দেরী করে কী লাভ, গড়িমসি করে লাভ কি?"

ওল্‌গা উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি, বেরিয়ে চলে গেল বাগানে।

রাদীলভ হেঁকে বললেন, "ওহে ফেদিয়া, নাচ হোক একখানা!"

ফেদিয়া লাফিয়ে উঠল, তারপর ঘরময় হেঁটে বেড়ালো এমন একটা কৃত্রিম এবং অদ্ভুত ভঙ্গীতে যা পোষা ভালুকের সঙ্গে খেলাচ্ছলে ছাগলের ভূমিকায় কোনো মানুষের পক্ষে মানায়। সঙ্গে সঙ্গে সে গাইল, "আমাদের ফটকের কাছে ..."

বাগানের পথে চলন্ত গাড়ির খট খট আওয়াজ শোনা গেল, কয়েক মুহূর্ত পরে একজন দীর্ঘাকৃতি, প্রশস্ত স্কন্ধ এবং হৃষ্টপুষ্ট লোক ঘরে প্রবেশ করল, লোকটি লাখেরাজদার অভসিয়ানিকভ। কিন্তু অভসিয়ানিকভ এমন একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অসামান্য ব্যক্তি যে তাঁর সম্পর্কে

আলোচনা, পাঠকের অনুমতি নিয়ে, আমরা পরবর্তী অধ্যায় পর্যন্ত স্থগিত রাখব। এখানে নিজের কথা শুধু এইটুকু বলব যে পরদিন অতি প্রত্যুষে ইয়েরমলাইকে নিয়ে আমি বেরুলাম শিকারে, তারপর দিনের শিকার শেষে বাড়ি ফিরে এলাম ... আরো বলব যে, এক সপ্তাহ পরে আবার আমি গিয়েছিলাম রাদীলভের বাড়িতে, কিন্তু তাঁকে বা ওল্‌গাকে দেখতে পাইনি, এক পক্ষ কালের মধ্যে শুনলাম তিনি উধাও হয়ে গেছেন, মাকে ফেলে রেখে শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছেন। সারা প্রদেশটা আলোড়িত হয়ে উঠল, এই ঘটনা নিয়ে নানা জটলা চলল, আর তখনই আমিও বুঝতে পারলাম সেদিন রাদীলভের গল্প বলার সময় ওল্‌গার মুখে যে ভাবটি ফুটে উঠেছিল তার মানে কি। তাতে কেবল দুঃখভোগের সহানুভূতি ছিল না: যেন ঈর্ষায় পুড়ে যাচ্ছে এমন ছিল সেই অভিব্যক্তি।

সে অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার আগে বৃদ্ধা মাদাম রাদীলভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা হল বৈঠকখানা ঘরে, ফিওদর মিখেইচের সঙ্গে তখন তিনি তাস খেলছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনার ছেলের কোনো খবর পেয়েছেন?"

বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। রাদীলভ সম্পর্কে আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করিনি।

লাখেরাজদার অভসিয়ানিকভ

ভদ্র পাঠক মহোদয়গণ, মনে মনে কল্পনা করে নিন সত্তর বছর বয়স্ক একজন হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘদেহ মানুষ, মুখখানা তার অনেকটা আমাদের উপকথার লেখক ক্রীলোভের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, ঘন ভ্রূ যুগলের নিচে চোখ দুটি স্বচ্ছ আর বুদ্ধিদীপ্ত, চালচলনে বেশ একটি মর্যাদা প্রকাশ পায়, কথাবার্তা ধীর, চলাফেরা সতর্ক: এমনি একটি লোকই হচ্ছে অভসিয়ানিকভ। পরনে তার প্রকান্ড একটি নীল ওভারকোট, আস্তিনগুলো লম্বা, আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত বোতাম আঁটা, গলায় জড়ানো একখানা লালচে রেশমী রুমাল, পায়ে ফিতে লাগানো ঝকঝকে বুটজুতো, দেখতে মোটামুটি বেশ একজন সম্পন্ন বণিকের মতো। হাত দুখানা সুন্দর, নরম, শাদা, কথা বলার সময় প্রায়ই সে কোটের বোতাম হাতড়ে বেড়াত। অভসিয়ানিকভের মর্যাদা ও স্থৈর্য, তার কান্ডজ্ঞান ও ঢিলেমি, তার সততা এবং একগুঁয়েমি, সব মিলিয়ে মনে করিয়ে দিত মহান পিটারের আমলের আগেকার রুশী বয়ারদের কথা ... জাতীয় ছুটির দিনের পোষাক তাকে মানাত। পুরনো দিনের অবশিষ্ট শেষ লোকদের একজন ছিল সে। তার প্রতি ছিল সব প্রতিবেশীর দারুণ শ্রদ্ধা, তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারা একটা সম্মানের বস্তু বলে তারা মনে করত। অন্যান্য লাখেরাজদাররা প্রায় পুজো করত তাকে, দূর থেকে তাকে দেখে টুপি খুলে ফেলত, তাকে নিয়ে গর্ব বোধ করত। সাধারণত বলতে গেলে, আজকাল কে লাখেরাজদার, কে চাষী বোঝা শক্ত; তার কৃষিকর্ম চাষীর চাইতেও প্রায় নিকৃষ্ট; গরুবাছুরগুলির অবস্থা শোচনীয়, ঘোড়াগুলি আধমরা, বল্‌গাগুলি দড়ির তৈরি। কিন্তু অভসিয়ানিকভ ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, অবশ্য

ধনীও বলা যায় না তাকে। ছোটো পরিচ্ছন্ন আরামপ্রদ একটি বাড়িতে সে একলা থাকত তার স্ত্রীকে নিয়ে; কয়েকজন চাকর-বাকর ছিল, তাদের রুশী কায়দায় সাজপোষাক পরাত আর বলত, ওরা তার "মজুর"। তার জমি চাষের কাজেও লাগানো হত ওদের। সম্ভ্রান্ত অভিজাত বলে চাল মারার কোনো চেষ্টা সে করত না; জমিদার সাজতে চাইত না, যাকে বলে আত্মবিস্মৃত হওয়া, তা কখনো হত না; প্রথম এক বার বললেই সে আসন গ্রহণ করত না, নতুন কোনো অভ্যাগতের আগমনে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে কখনো ভুলত না, সেই উঠে দাঁড়ানোর মধ্যে এমন একটি মর্যাদা, এমন একটি গরিমায় মেশানো বিনয় প্রকাশ পেত যে অভ্যাগত তাঁর নিজের অজান্তে তাকে একটু বেশি সম্মান জানিয়ে নমস্কার জানাতেন। সব প্রাচীন দস্তুর অভসিয়ানিকভ মেনে চলত, কিন্তু তা কুসংস্কারবশে নয়, অভ্যাসবশে (স্বভাবতই সে ছিল খানিকটা স্বাধীনচেতা)। যেমন, স্প্রিং-আঁটা গাড়ি সে পছন্দ করত না, কারণ তাতে তার আরাম হত না, দৌড়ের গাড়ি চেপে বেড়াতেই পছন্দ করত বেশি, নয়ত চামড়ার কুশন বসানো ছোটো সুন্দর একটি শকটে চেপে চলতে চাইত, আর পাটল বর্ণের ঘোড়া সে চালাত নিজে। (পাটল বর্ণের ঘোড়া ছাড়া আর কিছু সে রাখতই না।) তার কোচম্যানটি ছিল তরুণ, গালে তার গোলাপী আভা, চুল ছাঁটা গোল করে, গায়ে বেল্ট লাগানো গাঢ় নীল কোট, মাথায় ভেড়ার লোমের নিচু টুপি, সে অভসিয়ানিকভের পাশে বসে থাকত সসম্ভ্রম ভঙ্গীতে। খাওয়া দাওয়ার পর অভসিয়ানিকভের একটু নিদ্রা ছিল বাঁধা, প্রতি শনিবারে সে যেত স্নানাগারে, ধর্ম পুস্তক ছাড়া কিছু পড়ত না, আর পড়বার সময় গম্ভীরভাবে নাকের ওপর বসাত তার রুপোলী গোল চশমাখানা, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যেত, আর ঘুম থেকে উঠত সকাল সকাল। কিন্তু দাড়ি কামিয়ে ফেলত সে, চুল রাখত অপ্রচলিত কায়দায়। অতিথিদের আপ্যায়ন করত হৃদ্য এবং ভব্যভাবে, কিন্তু একেবারে মাটিতে ঝুঁকে পড়ে নমস্কার জানাত না, কিংবা তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি কিছু করত না, শুকনো নোন্তা প্রত্যেকটি সুখাদ্য খাবার জন্য অযথা পীড়াপীড়ি করত না। আসন ছেড়ে না উঠে, স্ত্রীর দিকে মাথাটি একটু ঘুরিয়ে জোর গলায় বলত, "গিন্নী, ভদ্রলোককে কিছু খেতে দাও তো।" গম বেচা সে পাপ বলে মনে করত: এ যে ঈশ্বরের দান। সে বছর চল্লিশ সালে, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এবং প্রচণ্ড অনটনের সময়টাতে সে আশে-

পাশের জমিদার এবং চাষীদের ভাগ দিয়েছিল তার সমস্ত সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে, পরের বছর তারা শস্যাদিতে তার দেনা শোধ করে দিয়েছে কৃতজ্ঞ চিত্তে। প্রতিবেশীরা প্রায়ই অভসিয়ানিকভকে ডাকত তাদের মধ্যে সালিশী এবং মধ্যস্থতা করার জন্য, আর প্রায় সব সময় তারা তার সিদ্ধান্তেই সায় দিয়ে যেত, তার উপদেশ শুনে চলত। তার মধ্যস্থতার ফলে অনেকেই নিজেদের জমির সীমানা-সংক্রান্ত গোলমালের মীমাংসা করে নিতে পেরেছিল চূড়ান্তভাবে। কিন্তু মেয়ে-জমিদারদের সঙ্গে দু'তিনবার একটু গোলমাল টানা-হ্যাঁচড়ার পর সে জানিয়ে দিল যে মেয়েদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবে না। মেয়েদের ছটফটানি আর উত্তেজনা, তাদের বকবকানি ও "বাড়াবাড়ি" বরদাস্ত হত না তার। একবার কী করে যেন বাড়িতে তার আগুন লেগেছিল। পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে একজন মজুর তাকে এসে চীৎকার করে বলতে লাগল, "আগুন, আগুন!" অভসিয়ানিকভ বলল শান্তস্বরে, "কী, চীৎকার করছ কেন? আমার টুপি আর ছড়িখানা দাও তো।" ঘোড়াগুলোকে সে নিজেই বাগ মানাতে ভালোবাসত। একবার একটা জেদী ঘোড়া তাকে নিয়ে ছুটে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল একেবারে খাড়াই-এর মাথায়। অভসিয়ানিকভ বেশ নরম সুরে তাকে বলল, "এই দেখ, এই, ব্যাটা ঘোড়ার বাচ্চা, মারা যাবি যে!" এক মুহূর্ত পরে খাড়াই বেয়ে গড়িয়ে পড়ল সে, ছুটন্ত গাড়িটি, পেছনে বসে-থাকা ছেলেটি এবং ঘোড়াটা। ভাগ্য ভালো যে, গিরিপথের তলদেশে ছিল বালির স্তূপ। কেউ আহত হল না, ঘোড়াটার কেবল একটা পা মচকে গিয়েছিল। মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা গলায় অভসিয়ানিকভ বলল, "দেখ, দেখলি তো, বলেছিলাম না।" বউটিও ছিল তার একেবারে জুড়ী। তাতিয়ানা ইলিনিচ্না অভসিয়ানিকভা দীর্ঘাঙ্গী, মর্যাদাময়ী এবং স্বভাবত স্বল্পভাষিণী মহিলা; সব সময় তাঁর মাথায় থাকত দারুচিনি রঙের রেশমী রুমাল। আচরণে-ব্যবহারে তাঁর একটি উদাসীন ভাব ছিল, কিন্তু কেউ তাঁকে রূঢ় বলে অভিযোগ করেনি, বরং বহু গরীব দুঃখী তাঁকে বলত মাইজী, মালক্ষ্মী। তাঁর সুঠাম চেহারা, নাক মুখ, বড়ো বড়ো কালো চোখ, পাৎলা ঠোঁট দুটি থেকে এখনো বোঝা যায় এক কালে তিনি নামকরা সুন্দরী ছিলেন। অভসিয়ানিকভের কোনো ছেলেপুলে ছিল না।

পাঠক জানেন, অভসিয়ানিকভের সঙ্গে আমার পরিচয় রাদীলভের বাড়িতে। প্রথম দেখার দু'দিন পরে দেখতে গিয়েছিলাম তাকে। বাড়িতেই পাওয়া গেল তাকে, দেখলুম বসে আছে বড়ো একটা চামড়ার আরাম-কেদারায়, আর পড়ছে "সাধু পুরুষদের জীবনী"। কাঁধের ওপর মেটে রঙের একটা বেড়াল ঘড় ঘড় করছে। আমাকে সে অভ্যর্থনা করল স্বভাবসিদ্ধ অভিজাত অমায়িকতায়। কথাবার্তা শুরু হল।

অন্যান্য অনেক কথার সঙ্গে তাকে বললাম, "কিন্তু সত্যি কথা বলুন তো লুকা পেত্রোভিচ, আগের কালে, আপনাদের সময় সবকিছু আরো ভালো ছিল না?"

অভসিয়ানিকভ বলল, "হ্যাঁ, তা এক রকম ছিল বৈকি ভালো। আরো অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল জীবনে, সবকিছুরই অনেক বেশি প্রাচুর্য ছিল। তা যাই হোক, এখনো ভালোই, আর ঈশ্বর করুন, ভবিষ্যতে, আপনার ছেলেপুলেদের কালে আরো ভালো হবে।"

"লুকা পেত্রোভিচ, আমি ভেবেছিলাম আপনি প্রাচীন কালের প্রশংসা করবেন।"

"না, আগের কালের প্রশংসা করার কোনো বিশেষ হেতু নেই আমার। যেমন ধরুন আপনি, আপনি জমিদার, ঠিক আপনার ঠাকুর্দা যেমন ছিলেন তেমন জমিদারই। কিন্তু তাঁর মতো ক্ষমতা আজ আপনার নেই — তাছাড়া, বাস্তবিক একই রকমের মানুষও আপনি নন। এখনো কিছু কিছু বড়োলোক এমন আছেন যাঁরা আমাদের নির্যাতন করেন, কিন্তু সে সব একেবারে তো আর পরিহার করা সম্ভব নয়। যাঁতা পিষলে পরেই না ময়দা। না, যৌবনকালে যা দেখেছি, এখন আর তা দেখা যায় না।"

"যেমন?"

"যেমন আপনার ঠাকুর্দার কথাই ধরা যাক। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত লোক ছিলেন; আমাদের মতো গরীব লোকদের উৎপীড়ন করতেন। বোধহয় জানেন — নিজের জমিদারী কি আর না জানবেন — চেপলীগিন থেকে মালিনিন পর্যন্ত যে জমির খণ্ডটা — আজকাল তাতে ওট ফলানো হয় — হ্যাঁ, এটা আমাদের — সবটাই আমাদের, জানেন। আপনার পিতামহ ওটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন; ঘোড়ায় চেপে এসে হাত দিয়ে জমিটা দেখালেন, বললেন,

'আমার সম্পত্তি,' তারপর দখল করে নিলেন। আমার বাবা (ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন!) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, মেজাজখানাও তাঁর চড়া ছিল, তিনি ব্যাপারটা মেনে নিতে চাইলেন না—আর বাস্তবিক, কে আর নিজের সম্পত্তি খোয়াতে চায়? তিনি একখানা আবেদন পাঠিয়ে দিলেন আদালতে। কিন্তু তিনি একলা পড়ে গেলেন: অন্যান্যরা কেউ এল না এগিয়ে— ভয় পেয়ে গেছল তারা সব। আপনার ঠাকুর্দার কাছে গিয়ে বলল যে 'পিওতর অভসিয়ানিকভ আদালতে এই বলে নালিশ করছে যে আপনি নাকি তার জমি কেড়ে নিয়েছেন।' সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক সঙ্গে করে তাঁর শিকারী বাউশকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার ঠাকুর্দা... তারা এসে পাকড়াও করল আমার বাবাকে, আপনাদের জমিদারীতে ধরে নিয়ে গেল তাঁকে। সে সময় আমি ছিলাম নিতান্ত বালক মাত্র, খালি পায়ে বাবার পেছন পেছন ছুটলাম। কী ঘটল জানেন? আপনাদের বাড়িতে নিয়ে এসে সোজা জানালার নিচে তাঁকে চাবকালো ওরা। অলিন্দে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার ঠাকুর্দা দেখলেন সব; জানালায় বসে আপনার ঠাকুমাও তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখলেন। বাবা চীৎকার করে বললেন, 'করুণাময়ী, মারিয়া ভাসিলিয়েভ্না, আমার পক্ষ নিয়ে কিছু বলুন আপনি! দয়া করুন!' জবাবে তিনি শুধু উঠে উঠে দেখতে লাগলেন বাবাকে। তখন বাবার কাছ থেকে কবুল করিয়ে নেওয়া হল যে জমিটা দিয়ে দেবেন তিনি, জ্যান্ত ফিরতে দেওয়া হয়েছে বলে তাঁকে কৃতার্থ হতে বলা হল। তারপর থেকে জমিটা আপনাদেরই। চাষীদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন — ও জমিটাকে কী বলে তারা জানেন? ওরা জমির নাম দিয়েছে 'ডাণ্ডামারা জমি', কারণ লাঠির দ্বারা ওটা দখল করা হয়েছিল। তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মতো দীনহীন লোকেরা আগেকার কালের জন্য খুব বেশি আফশোষ করতে পারে না।"

অভসিয়ানিকভকে কী জবাব দেব ভেবে পেলুম না, তার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাবার মত সাহস আমার ছিল না।

"সেকালে আমাদের মধ্যে এসে বসতি করেছিলেন আর একজন প্রতিবেশী; তাঁর নাম কোমভ, স্তেপান নিক্তপলিওনীচ কোমভ। ভদ্রলোকটি জ্বালিয়ে মারতেন বাবাকে; একটা না একটা কিছু লেগেই ছিল। লোকটি ছিলেন মদ্যপ, অন্যান্যদের আপ্যায়িত করতে ভালোবাসতেন; যখন মাতাল

হয়ে যেতেন তখন ফরাসী ভাষায় বলতেন, 'সে বোঁ,'* তারপর ঠোঁট চেটে নিয়ে দেবমূর্তিকেও রাঙিয়ে তুলতেন লজ্জায়। সমস্ত প্রতিবেশীকে তিনি নিজের কাছে ডেকে পাঠাতেন। সর্বদাই প্রস্তুত থাকত তাঁর ঘোড়াগুলি, আর যদি কেউ না যেত তাঁর ডাক শুনে তবে তৎক্ষণাৎ তিনি নিজেই চলে আসতেন তার কাছে! ... আর কী অদ্ভুত একটি লোক! প্রকৃতিস্থ থাকলে মিছে কথা তিনি বলতেন না; কিন্তু মাতাল হয়ে পড়লেই গল্প জুড়ে দিতেন পিটার্সবুর্গে তাঁর বাড়ি আছে তিনখানা — একটি লাল রঙের, একটি চিমনী তাতে; আর একখানা হলদে, তাতে দুটো চিমনী; আর তৃতীয়খানা নীল রঙের, চিমনী তাতে নেই; বলতেন তাঁর তিনটি ছেলে (যদিও বিয়েই তাঁর হয়নি কখনো), একটি আছে পদাতিক বাহিনীতে, একটি অশ্বারোহী বাহিনীতে, তৃতীয়টি সম্পূর্ণ স্বাধীন ... তারপর বলতেন, তিনটি বাড়ির একেকটিতে থাকে তাঁর একেকটি ছেলে; বড়ো ছেলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন নৌ-সেনাপতিরা, সেনানায়করা দেখা করতে আসেন মেজো ছেলের সঙ্গে, আর ছোটোটির সঙ্গে দেখা করে যায় কেবল ইংরেজরা! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'আমার বড়ো ছেলের স্বাস্থ্য কামনা করি, সে-ই সব থেকে কর্তব্যপরায়ণ।' এবার তিনি কাঁদতেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। স্বাস্থ্য কামনা করে মদ পান করতে যে অস্বীকার করত তার বরাত মন্দ! তিনি বলে উঠতেন, 'তোমাকে গুলি করে মারব আমি! কবর দিতেও দেব না!...' তারপর লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলতেন, 'ভালো মানুষের পো'রা এবারে নাচো তো, তোমাদের ফূর্তির আর আমার মন-মেজাজ বদলে দেবার জন্য নাচো এবার!' ব্যস, আর কী, তখন নাচতেই হবে; যদি মরেও যান তবু নাচতে হবে। ঝি-চাকরাণীদের একেবারে একশেষ করতেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে। এক এক সময় সারাটা রাত তারা গান গাইত একত্রে, সব থেকে চীৎকার গোলমাল যে করত সেই পেত পুরস্কার। ক্লান্ত হতে শুরু করলে তারা, হাত দুখানায় মাথা রেখে কঁকিয়ে কঁকিয়ে তিনি বলতে থাকতেন, 'হায় রে, আমি হতভাগা অনাথ! আমাকে ফেলে রেখে যেতে চায় ওরা!' আস্তাবলের লোকেরা তখন এসে মেয়েদের জাগিয়ে দিত ভালো করে। আমার বাবাকে কেন যেন তাঁর ভালো লেগেছিল; কী আর করেন? বাবাকে তিনি প্রায় মেরে ফেলেছিলেন, কবরেই বাস্তবিক নিয়ে ফেলতেন তাকে, কিন্তু (ঈশ্বর

* এটা ভাল।

ভরসা!) মারা গেলেন তিনি নিজেই, মত্ততার একটি ঝোঁকে পায়রা-ঘর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি ... বুঝলেন এবার, এমনিই ছিল আমাদের আদরের সব প্রতিবেশী!"

আমি মন্তব্য করলুম, "সময় বদলে গেছে কত!"

অভসিয়ানিকভ কথাটা মেনে নিয়ে বলল, "ঠিক, ঠিক, আর একটা কথা বলা যায় — আগের কালে অভিজাতরা আরো জাঁক-জমকের মধ্যে থাকতেন। প্রকৃত বনেদী পরিবারের কথা বলছি না। সেই তাঁদের আমি দেখেছিলাম মস্কোয়। লোকে বলে, তেমন লোক আজকাল আর নেই প্রায়।"

"মস্কোয় গেছেন আপনি?"

"বহু আগে, অনেক অনেক কাল আগে আমি থাকতুম সেখানে। এখন বয়স আমার তিয়াত্তর চলছে, মস্কোয় গিয়েছিলাম যখন আমার বয়েস ছিল ষোলো।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অভসিয়ানিকভ।

"কাদের দেখেছেন সেখানে?"

"বহু বহু অভিজাত ভদ্রলোক দেখলাম — সবাই দেখেছে তাঁদের, সবাইকে অবাক করে দিয়ে সকলের প্রশংসা পাবার জন্য তাঁরা বাড়িঘর খোলা রেখে দিতেন! কাউণ্ট আলেক্সেই গ্রিগোরিয়েভিচ অরলোভ-চেসমেনস্কির সামনে কেবল কেউ এসে দাঁড়াতে পারত না। আলেক্সেই গ্রিগোরিয়েভিচকে আমি দেখতাম প্রায়ই, আমার কাকা তাঁর পরিচারক ছিলেন। কাউণ্ট থাকতেন কালুগা গেটের কাছে শাবলভকায়। বড়ো চমৎকার উঁচুদরের ভদ্রলোক ছিলেন তিনি। এমন জমকাল রাজসিক ছিল তাঁর চালচলন, এমন তাঁর প্রসন্ন অনুগ্রহশীলতা, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না! আর তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর দেহটিই দামী বটে, আর তাঁর শক্তি, আর কী তাঁর চোখের দৃষ্টি! চিনবার জানবার আগে পর্যন্ত তাঁর কাছে যাবারই সাহস হত না — ভয় হত, বাস্তবিক আতঙ্ক হত, কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি আসতেন তাঁর কাছে অমনি যেন তিনি সূর্যকিরণের মতো সঞ্জীবিত করে তুলতেন আপনাকে, উৎফুল্ল করে তুলতেন। প্রত্যেকটি লোকেরই তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হবার অধিকার ছিল, সব রকম খেলাধুলোয় তিনি অনুরক্ত ছিলেন। ঘোড়দৌড়ে তিনি নিজেই ঘোড়া চালাতেন, আর সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী যদি অসন্তুষ্ট হয়

এই জন্য তিনি দৌড়ের শুরুতে কখনো সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন না; দূরত্ব কমাতেন না তিনি, একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে ছাড়িয়ে যেতেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে, আর কী যে মধুর ছিল তাঁর ব্যবহার—প্রতিদ্বন্দ্বীকে সান্ত্বনা দিতেন, তার ঘোড়াটির প্রশংসা করতেন। একেবারে প্রথম শ্রেণীর লোটন পায়রা পুষতেন। প্রাঙ্গণে এসে চেয়ারে বসে লোকজনকে বলতেন পায়রাগুলো ছেড়ে দিতে: তাঁর লোকেরা সব ছাতে গিয়ে দাঁড়াত বন্দুক হাতে বাজপাখিদের হটিয়ে রাখবার জন্য। কাউণ্টের পায়ের কাছে রাখা হত জলভরা বড়ো একটি রূপোর বেসিন, সেই জলে প্রতিফলিত পায়রাগুলোকে তিনি দেখতেন তাকিয়ে তাকিয়ে। শত শত ভিখিরী আর গরীব দুঃখী তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হত; আর কত টাকাকড়ি যে তিনি দান করে দিতেন! তিনি রাগলে পরে মনে হত যেন বজ্রের নির্ঘোষ। সবাই ত্রাসে কেঁপে উঠত, কিন্তু বিলাপ করারও ছিল না কিছু, এক মিনিট পরে আবার দেখুন তাকিয়ে, আবার তিনি হাসিখুশিতে বিগলিত হয়ে গেছেন! ভোজসভার আয়োজন যখন করতেন সারা মস্কোকে তখন নেশা করিয়ে ছাড়তেন! — আর দেখুন, কী চতুর ছিলেন তিনি! তুর্কীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই, জানেন তো? কুস্তীতেও তাঁর অনুরাগ ছিল, পালোয়ান লোক সব আসত তুলা থেকে, খারকভ থেকে, তামবোভ থেকে, সব জায়গা থেকে তাঁর কাছে আসত পালোয়ানেরা। কাউকে চিৎ করে ফেললে তিনি তাকে পুরস্কার দিতেন; আর যদি কেউ তাঁকে চিৎপটাং করে ফেলতে পারত তবে তো আর কথাই নেই, পুরস্কারে পুরস্কারে তাকে ঢেকে দিতেন একেবারে, আর ঠোঁটে তার চুম্বন করতেন ...

"আর একবার, আমি তখন মস্কোয় থাকতুম, এমন এক শিকারের পার্টির আয়োজন করলেন তিনি যেমনটি রাশিয়াতে পূর্বে কখনো দেখা যায়নি; গোটা সাম্রাজ্যের সমস্ত শিকারীর কাছে আমন্ত্রণ পাঠালেন, শিকারের একটি দিন স্থির করে সবাইকে তিন মাসের নোটিস দিলেন। তারা সব সঙ্গে করে নিয়ে এল কুকুর এবং সহিস ও ভৃত্যদের; বুঝলেন, সে একটা বাহিনী, একেবারে পাকা একটা বাহিনী! নিয়মমাফিক ভোজসভা হল একটি, তারপর তারা বেরিয়ে পড়ল মাঠে প্রান্তরে। লোক এসে জুটল হাজারে হাজারে! তারপর কী হল মনে করছেন? ... আপনার ঠাকুর্দার কুকুরটা দৌড়ে সবাইকে দিলে হারিয়ে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সেটা মিলভিদ্‌কা নয়?"

"মিলভিদ্‌কা, মিলভিদ্‌কা!... কাউণ্ট এবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনার কুকুরটা দিন আমাকে, তার বদলে নিন আপনার যা খুশি।' তিনি বললেন, 'না কাউণ্ট, আমি তো ব্যাপারী নই; জীবনে আমি একখণ্ড ন্যাকড়াও বিক্রী করিনি; সম্মানের খাতিরে কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকেও ছাড়তে প্রস্তুত, কিন্তু মিলভিদ্‌কাকে আমি ছেড়ে দেব না কিছুতেই। তার আগে আমি বরং গোলাম হব।' আলেক্সেই গ্রিগোরিয়েভিচ শুনে তাঁর প্রশংসাই করলেন। বললেন, 'এ কথা বলেছেন বলে আপনাকে আমার ভালো লেগেছে।' আপনার ঠাকুর্দা কুকুরটাকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন গাড়িতে, মিলভিদ্‌কা যখন মারা গেল বাগানে তাকে কবর দিয়েছিলেন, অন্ত্যেষ্টির বাজনাও বেজেছিল — হ্যাঁ, হ্যাঁ, কবরের ওপরে একটি ফলকও বসানো হয়েছিল, তাতে কুকুরটার সম্পর্কে একটি উৎসর্গ-বাণী খোদিত করে দেওয়া হয়েছিল।"

আমি মন্তব্য করলাম, "তাহলে আলেক্সেই গ্রিগোরিয়েভিচ কাউকে উৎপীড়ন করেননি।"

"হ্যাঁ, এমনিই হয়ে থাকে সব সময়: কোনো রকমে যারা ভেসে থাকতে পারে অপরকে নিচে টেনে আনে তারাই।"

অল্প একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, এই বাউশ কী ধরণের লোক ছিল?"

"কেন, আপনি মিলভিদ্‌কার কথা শুনেছেন আর বাউশের কথা শোনেননি, তা কি করে হয়? সে ছিল আপনার ঠাকুর্দার প্রধান শিকারী আর হুইপার-ইন। আপনার ঠাকুর্দা মিলভিদ্‌কাকে যেমন ভালোবাসতেন ওকেও ঠিক তেমনি ভালোবাসতেন। ও ছিল ভারি বেপরোয়া লোক, আপনার ঠাকুর্দা তাকে যে-কোনো নির্দেশ দিতেন তা-ই মুহূর্তের মধ্যে পালন করত — তাঁর কথায় নিজের গায়ে সে তলোয়ারও বিঁধিয়ে দিতে পারত... আর যখন সে লে-লে করে ডাকত তখন তার গলার আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরে বনের মধ্যে শোনা যেত। তারপর অকস্মাৎ তার জেদ চেপে যেত, নেমে পড়ত ঘোড়া থেকে এবং শুয়ে পড়ত মাটিতে... আর তার গলার আওয়াজ যখনই কুকুরগুলো শুনতে পেত না, তখনই সব শেষ! তখন তীব্র গন্ধ পেলেও আর তারা এগুত

না, কিছুতেই আর শিকার খুঁজে বেড়াত না। হা, হা, আপনার ঠাকুর্দা বাস্তবিক রেগে যেতেন! 'বদমাসটাকে ফাঁসিতে না লটকাতে পারলে ধিক আমাকে! ওকে তছনছ করে ওর সবকিছু আমি ওলট পালট করে দেব, খ্রীষ্টদ্রোহী কোথাকার! ওর পা দুটো গলায় ঢুকিয়ে দেব, পাষণ্ড!' এত সবের পর তিনি গিয়ে দেখতেন কী চাচ্ছে ও; কেন শিকারী কুত্তাগুলোকে লে-লে করছে না? সাধারণত এ সব সময় বাউশ কিছু ভদ্‌কা চাইত, তারপর তা খেয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসে আবার আগের মতো জোরে জোরে শিকারের ডাক দিতে শুরু করে দিত।

"আপনিও তো শিকার করতে ভালোবাসেন মনে হয়, লুকা পেত্রোভিচ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, — অবশ্যই ভালোবাসতাম, এখন আর না; এখন আমার কাল শেষ হয়ে এসেছে — কিন্তু যৌবনে ... কিন্তু আপনি জানেন আমার মতো অবস্থার লোকের পক্ষে ব্যাপারটা সহজ ছিল না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পেছন পেছন চলা, তাদের অনুকরণ করা আমাদের মতো লোকের শোভা পায় না। আমাদের সমাজেও নিশ্চয় এমন অকেজো মাতাল লোক পাবেন যে অভিজাত ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে—কিন্তু ও একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ উপভোগ। ও রকম করে সে কেবল নিজের ওপরই ধিক্কার নিয়ে আসে। তারা ওকে তুলে বসায় একটা হতচ্ছাড়া হোঁচট খাওয়া টাট্টু ঘোড়ার ওপর, তারপর বারংবার তার টুপি ফেলে দিতে থাকে মাটিতে, তার গা কেটে চালিয়ে দেয় চাবুক, এমন ভান করে যেন ঘোড়াকে চাবুক মারছে; তাকে সবকিছুতে হাসতে হয় আর এমনি করে সে অন্য সকলের উপহাসের পাত্র হয়। না, আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, মানুষের অবস্থান সমাজের যত নিচে, আচরণ ব্যবহারে তাকে তত আরো গাম্ভীর্য রেখে চলতে হবে, নইলে খোলাখুলি অপমানিত হতে হয়।"

একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে অভসিয়ানিকভ আবার বলে চলল, "হ্যাঁ, দুনিয়ায় যখন চলে-ফিরে বাস করতাম তারপর সাগর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে; আজকালকার সময় বদলে গেছে। বিশেষ করে অভিজাত সম্ভ্রান্তদের মধ্যে বড়ো পরিবর্তন দেখতে পাই। ক্ষুদে জমিদাররা হয় রাজকর্মচারী হয়েছেন নয়ত, কারণ যাই হোক, এখানে আর থাকেন না; বড়োদের কথা যদি বলেন, তাদের বোঝা মুশকিল। তাদের সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আছে আমার—বড়ো জমিদারদের কথা বলছি—সীমানার বিবাদ মেটাতে গিয়ে

অভিজ্ঞতা হয়েছে। হ্যাঁ আপনাকে বলি, তাঁদের দেখলে আমার বেশ ভালো লাগে: তাঁরা এখন বেশ ভদ্র এবং বিনয়ী। কেবল অবাক লাগে দেখে: তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান সব পড়ে ফেলেছেন, এমন প্রাঞ্জলভাবে কথা বলেন যে শুনলে হৃদয় গলে যায়, কিন্তু ঠিক কাজের কাজটি তাঁরা বোঝেন না; নিজের স্বার্থ কী তাও উপলব্ধি করেন না; গোমস্তা বা বাঁধা-পড়া চাকর তাঁদের যেমন খুশি চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। করোলিওভ — আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচ করোলিওভ — তাঁর কথাই ধরুন; বোধহয় আপনি চেনেন তাঁকে — একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত অভিজাত নন তিনি? দেখতে সুন্দর, পয়সা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন, মনে হয় বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, সহজ সরল তাঁর কথাবার্তা, আমাদের সবার সঙ্গে তিনি করমর্দন করেন। চেনেন তাঁকে? ... বেশ, তাহলে শুনুন। গেল সপ্তাহে সালিশ নিকিফর ইলিচের ডাক পেয়ে আমরা জমেছিলাম বেরিওজভ্‌কায়। সালিশ নিকিফর ইলিচ আমাদের বললেন, 'মশায়রা, আমাদের সীমানার মীমাংসা করে দিতে হবে; ভারি বিশ্রী ব্যাপার; আমাদের জেলা সব থেকে পেছনে পড়ে আছে; আমাদের কাজ শুরু করে দিতে হবে।' অতএব, কাজে লেগে গেলুম আমরা। যেমন হয়ে থাকে, আলাপ আলোচনা চলল, মত পার্থক্যও দেখা দিল, আমাদের এটর্ণী আপত্তি পেশ করতে থাকলেন। কিন্তু হৈচৈ প্রথমে করলেন পরফিরি অভ্‌চিন্নিকভ ... আর কী নিয়ে তাঁর এত হৈচৈ? ... তাঁর তো এক একরও জমি নেই; তিনি তাঁর ভাই-এর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন মাত্র। গাঁক গাঁক করে বললেন, 'না, আমার ওপর কিছুতেই চাপিয়ে দেওয়া চলবে না! না, আমাকে দিয়ে তা কিছুতেই করানো চলবে না! দেখি দেখি, প্ল্যানগুলো দেখি! সার্ভেয়ারের প্ল্যান কোথায়, জুডাস-এর প্ল্যান কই দেখি!' 'কিন্তু কী তবে আপনার দাবি?' 'ওঃ, ভেবেছেন আমি বোকা! বটে! ভেবেছেন চট করে হঠাৎ আপনাদের সামনে আমার দাবির কথা খুলে বলব? না, আগে আমাকে প্ল্যানগুলো দিন এখানে — তা-ই আমি চাই!' অথচ সর্বক্ষণ প্ল্যানগুলোর ওপরে নিজে ঘুষি মেরে যাচ্ছেন তিনি। এরপর মার্ফা দ্মিত্রিয়েভ্‌নাকে হঠাৎ ভয়ানক অপমান করলেন। ভদ্রমহিলা চীৎকার করে বললেন, 'আমার সুনামে কালি দিচ্ছেন, এত বড়ো স্পর্ধা?' জবাবে অভ্‌চিন্নিকভ বলে উঠলেন, 'আপনার সুনাম, আপনার মতো খ্যাতি আমার লালচে হলুদ রঙের মাদী ঘোড়াটার জন্যও কামনা করি না

আমি।' শেষ পর্যন্ত কিছু মাদেইরা দিয়ে তবে তাঁকে শান্ত করা হয়; এরপর গোলমাল লাগিয়ে দিল অন্যান্যরা। আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচ করোলিওভ, ভদ্রলোক এক কোণে এসে তাঁর ছড়ির হাতলটি কামড়াচ্ছিলেন আর কেবল মাথা নাড়াচ্ছিলেন। আমি লজ্জিত বোধ করলাম; আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। মনে মনে বললাম, 'উনি কী ভাবছেন আমাদের?' হঠাৎ, আরে! আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচ উঠে দাঁড়ালেন, আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগলেন তিনি বলতে চান। সালিশ নিজেই যথাসাধ্য চেষ্টায় বললেন, 'মশায়রা, ও মশায়রা, আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচ বলতে চাইছেন।' হ্যাঁ, এটুকু স্বীকার করতে হবে: সবাই তারা একসঙ্গে চট করে চুপ করে গেল। আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচ শুরু করলেন এবার, বললেন, 'আমরা সবাই কেন এখানে এসেছি তা বোধহয় আমরা ভুলে গেছি; বাস্তবিক সীমানা নির্দিষ্ট করা যে জমির মালিকদের পক্ষে সুবিধাজনক তাতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু আসলে উদ্দেশ্যটা কী? চাষীর পক্ষে ব্যাপারটি সহজ করে দেওয়া, যাতে সে কাজ করতে পারে এবং আরো সুবিধামতো দেনা-চৈনা মিটিয়ে দিতে পারে, চাষী তো প্রায় তার নিজের জমিটাই চেনে না, ফলে প্রায়ই সে কাজ করতে যায় পাঁচ মাইল দূরে; কাজেই তার কাছ থেকে বেশি কিছু আশাও করা যায় না।' তারপর আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচ বললেন, 'নিজের চাষীদের কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকা জমিদারের পক্ষে একটা লজ্জার বিষয়; আর ঠিক মতো বিচার করে দেখলে, পরিণামে তাদের আর আমাদের স্বার্থ তো অবিচ্ছেদ্য; তারা সচ্ছল হলে আমরাও সচ্ছল, তাদের অবস্থা খারাপ হলে আমাদের অবস্থাও খারাপ হবে, কাজেই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য হওয়াটা অবিবেচনার কাজ এবং অন্যায়'... ইত্যাদি, ইত্যাদি ... হ্যাঁ, কী ভাবে যে বললেন! মনে হচ্ছিল একেবারে হৃদয়ে পেঁৗছে যাচ্ছে কথাগুলো ... সব ভদ্রলোকেরা মাথা নিচু করে রইলেন; আমি নিজে. কী বলব বিশ্বাস করুন, আমার প্রায় জল এসে গিয়েছিল চোখে। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর মতো কথা আপনি প্রাচীন পুঁথিপত্রেও পাবেন না ... কিন্তু কী ফল হল শেষ পর্যন্ত? তিনি নিজেই চার একর পাঁটভরা জলাভূমি ছেড়ে দিতে চাইলেন না, বিক্রী করতেও রাজী নন। বললেন, 'আমি আমার লোকজনকে দিয়ে ওই বিলটা পরিষ্কার করে ফেলব, ওখানে একটা কাপড়-কল বসাবো, তাতে সর্বাধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জাম সব থাকবে।

জায়গাটা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি; ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে চিন্তে আমি পরিকল্পনাও করে ফেলেছি।' এটা যদি খাঁটি সত্যি কথা হত, তাহলে বেশ কোনো কথা ছিল না; কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচের প্রতিবেশী আন্তোন কারাসিকভ করোলিওভের গোমস্তার হাত থেকে একশ রুবল দিয়ে ওটা কিনতে অস্বীকার করেছিলেন। কাজেই কোনো কিছু না ঠিক করেই আমাদের জমায়েতটি গেল ভেঙে। কিন্তু আজো পর্যন্ত আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচ মনে করেন যে, তাঁর বক্তব্যই ঠিক, এখনো তিনি কাপড়-কলের গল্প করেন; কিন্তু বিল থেকে জল বার করে নিতে শুরুও করেননি।"

"নিজের জমিদারী কেমন চালান তিনি?"

"সব সময় নতুন নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। চাষীরা তাঁর বিষয়ে ভালো বলে না—কিন্তু তাদের কথা শোনা নিরর্থক। আলেক্সান্দ্র ভ্লাদিমিরভিচ ঠিকই করছেন।"

"সে কি লুকা পেত্রোভিচ? আমি ভেবেছিলাম আপনি পুরনো পদ্ধতিরই পক্ষে।"

"আমি—সে অন্য কথা। আপনি জানেন, আমি অভিজাতও নই, জমিদারও নই। আমার আবার কী ধরনের ব্যবস্থাপনা?... তাছাড়া নানা রকমে কাজ করতে আমি জানি না। আমি চলতে চেষ্টা করি ন্যায় মেনে, আইন মেনে, আর সব ছেড়ে দিই ঈশ্বরের হাতে! নব্য ভদ্রলোকেরা পুরনো পদ্ধতি পছন্দ করেন না; আমার মনে হয়, ঠিকই করেন তাঁরা... নতুন নতুন আইডিয়ার সময় এসেছে এখন। কেবল আক্ষেপ এই, নব্য বাবুরা বড়ো বেশি কেতাবী, তাত্ত্বিক। তাঁরা কৃষকের সঙ্গে এমন আচরণ করেন যেন পুতুল তারা; তাদের এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে থাকেন; তাদের বেঁকেচুরে তারপর ভাগিয়ে দেন। তারপর তাঁদের গোমস্তা, সে হয়ত ভূমিদাস, অথবা কোনো জার্মান ওভারসিয়ার, আবার কৃষককে তাঁবে নিয়ে ফেলে। হ্যাঁ, নব্য ভদ্রলোকদের কোনো একজন যদি আমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমাদের দেখিয়ে দিতেন, 'এই যে দেখে নাও কী ভাবে ম্যানেজ করতে হয়!'... কী হবে শেষটা? নতুন পদ্ধতিগুলো না দেখেই মরে যাবো, তাই কি হতে পারে? প্রাচীন যেটা সেটা মৃত, কিন্তু নতুনের জন্ম হল না, এটা কী ব্যাপার?"

অভসিয়ানিকভকে কী জবাব দেবো বুঝলাম না। সে চারদিকে তাকাল, আমার আরো কাছে এগিয়ে এল, তারপর গলা নামিয়ে বলল:

"ভাসিলি নিকলাইচ লিউবজ্‌ভোনভের বিষয়ে কথাবার্তা আপনি শুনেছেন?"

"না শুনিনি।"

"আমাকে বুঝিয়ে দিন তো দয়া করে, কী রকম অদ্ভুত ধরনের লোক তিনি। আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা কৃষকদের কাছে শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের কথা থেকেও কিছু আমার বোধগম্য হয় না। ছোকরা তিনি, জানেন; খুব বেশি দিন হয়নি মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছেন। যাই হোক, তিনি এলেন তাঁর জমিদারীতে। মনিবকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখবার জন্য চাষীদের সব জড়ো করা হল। ভাসিলি নিকলাইচ বেরিয়ে এলেন তাদের সামনে। চাষীরা তাকাল তাঁর দিকে —বলতেও অদ্ভুত লাগে! মনিব পরেছেন সহিসের মতো প্লাসের পাৎলুন; তাঁর বুটজুতোর মাথায় ট্রিমিং করা; গায়ে লাল শার্ট এবং সহিসের লম্বা কোটও; দাড়ি না কামানোতে তা বেড়ে উঠেছে, আর এমন অদ্ভুত টুপিটা আর অদ্ভুত মুখখানা— মদ খেয়েছেন নাকি? না, মাতাল নন, তবু তাকে ঠিক প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল না। তিনি বললেন, 'তোমাদের নিরোগ স্বাস্থ্য কামনা করি, বাছারা! ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন!' চাষীরা মাটিতে মাথা নুইয়ে নমস্কার করল, কিন্তু কোনো কথা না বলে, বুঝলেন, তারা ভয় পাচ্ছিল। আর তাঁকেও ভীরু বলে মনে হচ্ছিল। এবার তিনি তাদের বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। বললেন, 'আমি একজন রুশ, তোমরাও রুশ, রুশ সবকিছু আমি ভালোবাসি ... রাশিয়া আমার হৃদয় আর আমার রক্তও রুশ রক্ত ...' হঠাৎ এরপর তিনি হুকুম দিলেন: 'এসো বাছারা, একটি রুশী জাতীয় সঙ্গীত গাও!' চাষীদের পা তো ভয়ে কেঁপে উঠল থর থর করে, সম্পূর্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেছে তারা। সাহসী এক বীরপুঙ্গব গান গাইতে শুরু করলও বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই সে বসে পড়ল মাটিতে, অন্যান্য সকলের পেছনে গিয়ে লুকালো... আর আশ্চর্যের বিষয়টি কি জানেন: ও রকম জমিদার আমরা দেখেছি আরো; বেপরোয়া মহাশয় ব্যক্তিরা সব, একেবারে লম্পট আর কি; তাঁরা প্রায় সহিসদের মতোই সাজ-পোষাক করেন, নিজেরা নাচেন আর গীটার বাজান, গান গেয়ে যান আর গৃহদাসদের সঙ্গে মদ

খান একত্রে এবং চাষীদের নিয়ে আমোদ-ভোজন করেন; কিন্তু এই ভাসিলি নিকলাইচ যেন ঠিক একটি মেয়ে; সর্বদাই তিনি বই পড়ছেন বা লিখছেন, আর নয়ত জোরে জোরে কবিতা পড়ছেন বক্তৃতার মতো করে — কখনো কাউকে তিনি সম্বোধন করেন না, লাজুক প্রকৃতির লোক, বাগানে ঘুরে বেড়ান একলা একলা, মনে হয় তিনি বিরক্ত কিংবা বিষণ্ণ। আগেকার গোমস্তা প্রথমটা দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল; ভাসিলি নিকলাইচের আসবার পূর্বে সে ঘুরে এসেছে কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, তাদের সবাইকে গিয়ে নমস্কার করেছে — বোঝা যাচ্ছিল বেড়াল জানে কার মাখন সে খেয়েছে! আর চাষীরা তো নেচে উঠল আশায়, তারা ভাবল, 'কলাকচু বন্ধু! — বোঝো এবার তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে; এবার খাবে নাকানি-চোবানি, ডাকাত কোথাকার!...' কিন্তু এর বদলে ব্যাপার দাঁড়াল — কী ভাবে আপনাকে বলে বোঝাবো? — কী যে ঘটে গেল তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও অনুমান করতে পারেননি! ভাসিলি নিকলাইচ গোমস্তাকে ডেকে এনে বললেন, লাল হয়ে উঠে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমার চাকরীতে অকপট হবে, সাধু হবে, কাউকে উৎপীড়ন কোরো না — শুনছো?' সেদিনের পর থেকে তিনি আর তাকে নিজের কাছে তলব করেননি! নিজের জমিদারীতে তিনি থাকেন একজন আগন্তুকের মতো। যাই হোক, গোমস্তা আবার তার নিজ মূর্তি ধারণ করল কিন্তু চাষীরা ভাসিলি নিকলাইচের কাছে যেতে সাহস করল না; তারা গেছে ভয় পেয়ে। আরো অবাক কাণ্ডটা দেখুন: মনিব এমন কি তাদের সামনে পর্যন্ত মাথা নিচু করেন, তাদের দিকে তাকান প্রসন্ন দৃষ্টিতে, কিন্তু ভয়ে তাদের যেন পেট গুলিয়ে ওঠে! এ ধরনের কাণ্ডকারখানাকে কী বলবেন হুজুর? হয় আমি বুড়ো বয়সে বোকা হয়ে গেছি, নতুবা কিছু ... আমি বুঝতে পারি না।"

অভসিয়ানিকভকে বললাম, "মিঃ লিউবজ্‌ভোনভ নিশ্চয়ই অসুস্থ।"

"অসুস্থ, বটে! কী লম্বা চওড়া তাঁর দেহ, ঈশ্বর তাঁকে ভাল রাখুন! আর কী গরিমায় মাথা মুখখানা, যদিও মাত্র তরুণ বয়স ... কী জানি, ঈশ্বরই জানেন!" এই বলে অভসিয়ানিকভ এক দীর্ঘশ্বাস মোচন করল।

আমি শুরু করলাম, "আচ্ছা, এবার অভিজাত ভদ্রলোকদের কথা যাক, লুকা পেত্রোভিচ, লাখেরাজদারদের সম্পর্কে কী বলেন আপনি?"

সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, ও কথা আমায় বলতে বলবেন না। অবশ্য...

আমি বলতে পারতুম আপনাকে... কিন্তু কী লাভ!" অভসিয়ানিকভ হাতখানা নাড়ল। "তার চেয়ে বরং একটু চা খাই আসুন... আমরা তো সামান্য চাষী, তার বেশি কিছু নই; কিন্তু ভেবে দেখলে, আর কী-ই বা হতে পারি আমরা?"

কথা বন্ধ করল সে। চা দেওয়া হল। তাতিয়ানা ইলিনিচনা তাঁর আসন ছেড়ে আমাদের আরো কাছে এসে বসলেন। সন্ধ্যার সময় কয়েকবার তিনি নিঃশব্দে বাইরে গেছেন আবার ফিরে এসেছেন তেমনি নিঃশব্দে। কক্ষে বিরাজ করছে নীরবতা। অভসিয়ানিকভ কাপের পর কাপ চা খেয়ে গেল গম্ভীরভাবে, ধীরেসুস্থে।

তাতিয়ানা ইলিনিচনা মৃদুস্বরে বললেন, "আজ মিতিয়া এসেছিল আমাদের বাড়ি।"

ভ্রূ কুঞ্চল অভসিয়ানিকভ।

"কী চায় সে?"

"ক্ষমা চাইতে এসেছিল।"

মাথা নাড়ল অভসিয়ানিকভ।

আমার দিকে ফিরে এবার বলতে লাগল, "আচ্ছা, বলুন তো আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে কী করা যায়? একেবারে ত্যাগ করা তো আর সম্ভব নয়... দেখুন, ঈশ্বর আমাকে একটি ভাইপো দিয়েছেন। ছোকরার মাথা আছে—বেশ চালাক চতুর ছেলে — তা আমি অস্বীকার করি না; লেখাপড়াও ভালোই শিখেছে, কিন্তু খুব কিছু একটা করবে সে এমন আশা আমি করি না। এক সরকারী অফিসে ঢুকেছিল; ছেড়ে দিল চাকরীটা—ঠিকমতো লেগে থেকে এগুতে পারল না, বলতে পারেন ... সে কি মনে করে যে সে অভিজাতদের একজন? আর অভিজাতরাও তো একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল হয়ে ওঠে না। কাজেই এখন কোনো চাকরী-বাকরী তার নেই। এমন কি তাতেও কিছু বিশেষ এসে যেত না — কিন্তু মামলাবাজ হয়ে উঠেছে সে! চাষীদের হয়ে সে দরখাস্ত বানিয়ে দেয়, আরজি লিখে দেয়; গ্রাম প্রতিনিধিদের উপদেশ দেয়, সার্ভেয়ারদের উদ্ঘাটন করে, হামেশাই গিয়ে ঢোকে পানশালায়, শহরের লোকজন এবং ধাঙড়দের সঙ্গে তাকে দেখা যায় শুঁড়িখানায়। কপালে তার দুঃখ আছে, আর তার বেশি দেরীও নেই। এর মধ্যেই একাধিকবার কনস্টেবল এবং পুলিস ক্যাপ্টেনরা তাকে শাসিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যিস সে জানে এড়িয়ে

যেতে—তাদের সে হাসায়, কিন্তু পরে তাদের কলা দেখায়...” এবার স্ত্রীর দিকে ঘুরে সে বলল, “কিন্তু কি, সে এখন তোমার ছোটো ঘরে বসে নেই? আমি তোমাকে চিনি, বুঝেছো; এমন তোমার কোমল মন—তুমি বরাবর তার পক্ষই নেবে।”

তাতিয়ানা ইলিনিচনা চোখ নামিয়ে মুচকে হাসলেন, তারপর লাল হয়ে উঠলেন।

অভসিয়ানিকভ বলে চলল, “হ্যাঁ, তা-ই দেখছি। ধিক! ছেলেটাকে নষ্ট করছ তুমি। যাক, তাকে এবার আসতে বলো... তাই হোক, তাহলে, আমাদের এই সজ্জন অতিথির সম্মানে মুর্খ ছেলেটাকে ক্ষমাই করে দেব। যাও, তাকে আসতে বলো গিয়ে।”

তাতিয়ানা ইলিনিচনা দোরের সামনে গিয়ে ডাকলেন, “মিতিয়া!”

মিতিয়া আঠাশ বছরের তরুণ, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ তার, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ঘরে এল ছেলেটি, তারপর আমাকে দেখে দোরের মুখে থমকে দাঁড়াল। তার গায়ের পোষাকটি জার্মান কায়দায় তৈরি, কিন্তু কাঁধের ওপরে পাফগুলোর অস্বাভাবিক সাইজ দেখলেই বোঝা যায় নিঃসন্দেহে, যে দর্জি এটি কেটেছে সে নির্ঘাৎ রুশী।

বুড়ো শুরু করল, “আচ্ছা, এসো, ভেতরে এসো, লজ্জা পাচ্ছ কেন? তোমার খুড়ীমাকে ধন্যবাদ দাও—তোমায় মাপ করা হয়েছে।” এবার মিতিয়াকে দেখিয়ে সে বলল, “এই যে, আজ্ঞে হুজুর, আপনার কাছে আমি ওকে পেশ করছি, আপনি দেখুন: ও আমার নিজের ভাইপো, কিন্তু ওর সঙ্গে মানিয়ে চলতে একেবারে পারি না আমি। দুনিয়ার অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে!” (আমরা পরস্পরকে নমস্কার করলাম)। “আচ্ছা, এবার বলো তো, এসব কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছো তুমি? কী অভিযোগ করছে তোমার বিরুদ্ধে? আমাদের বল্যে বুঝিয়ে।”

নিজেকে সাধু প্রমাণ করবার জন্য আমার সামনে সবকিছু খুলে বুঝিয়ে বলায় তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

বিড়বিড় করে সে বলল, “পরে বলব, কাকা।”

বুড়ো জেদ করে বলল, “না, পরে নয়, এখুনি বলো... ভদ্রলোকের সামনে

লজ্জা পেয়েছ দেখতে পাচ্ছি; তা তো আরো ভালোই — এ-ই তোমার প্রাপ্য। বলো, বলো বলছি, আমরা কান পেতে আছি।”

মাথাটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে মেজাজ দেখিয়ে মিতিয়া বলল, “লজ্জিত হবার মতো আমি কিছু করিনি। আপনি কাকা নিজেই বিচার করে দেখুন না। রেশেতিলভোর কয়েকজন লাখেরাজদার আমার কাছে এসে বলল, ‘আমাদের বাঁচান, দাদা। ‘কী ব্যাপার?’ ‘ব্যাপার হচ্ছে: আমাদের শস্যের গোলাগুলো সব ছিল বিলকুল ঠিকঠাক — বস্তুত তার থেকে ভালো আর হতেই পারে না; আচমকা এক সরকারী ইনস্‌পেক্‌টার আমাদের কাছে এলেন গোলা পরিদর্শনের এক তলব নিয়ে। দেখেশুনে তিনি বললেন, ‘তোমাদের এসব একেবারে গোলমেলে বিশৃংখল হয়ে আছে — গুরুতর অবহেলা; কর্তাদের কাছে এ সব রিপোর্ট করাই আমার কর্তব্য।’ ‘কিন্তু কিসে অবহেলা দেখলেন?’ তিনি বললেন, ‘সে দেখা তো আমার কাজ।’ একজোট হয়ে সবাই স্থির করলাম কর্মচারীটিকে যথারীতি দক্ষিণা দিতে হবে; কিন্তু বুড়ো প্রোখরীচ আমাদের বাধা দিল। সে বলল, ‘না, ওতে ওর লোভ যাবে আরো বেড়ে। ও সব থাক, আমাদের কি আদৌ কোনো বিচারই নেই?’ বুড়োর কথা মানলুম আমরা; কর্মচারী মশাই কিন্তু গেলেন রেগে, তিনি এক নালিশ রুজু করে দিলেন, লিখে দিলেন রিপোর্ট। এখন তাই আমাদের তাঁর অভিযোগের জবাব দিতে ডাকা হয়েছে।’ ‘কিন্তু তোমাদের গোলাঘরগুলো সত্যি ঠিক ঠিক আছে তো?’ আমার জিজ্ঞাসার জবাবে তারা বলল, ‘ঈশ্বর জানেন, ঠিক আছে; আইনে যে পরিমাণ শস্য থাকার কথা তা আছে।’ আমি বললাম, ‘বেশ, তবে ভয়ের কিছু নেই’; তাদের হয়ে একটি দলিল খসড়া করে দিলাম। যদিও এখনো জানা যায়নি — কার পক্ষে হবে মীমাংসাটা। আর ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার নামে যে নালিশ আপনাকে করেছে — বিষয়টি বুঝতে কষ্ট হয় না যে—প্রত্যেক লোকের জামা তো নিজের চামড়ার সঙ্গেই লেপটে থাকে।”

নিচুস্বরে বুড়ো বলল, “প্রত্যেকেরই বটে — কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার নয়। কিন্তু শুতলোমভের চাষীদের নিয়ে আবার কী ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছ?”

“এ সম্পর্কে আপনি কিছু জানলেন কী করে?”

“যেতে দাও ও কথা, জানি আমি।”

"ও ব্যাপারেও আমি ঠিকই করেছি — আবার নিজেই আপনি দেখুন বিচার করে। প্রতিবেশী এক জমিদার বেস্পান্দিন শুতলোমভের চাষীদের জমির চার একরেরও বেশি চাষ করে ফেলেছেন। তিনি বলেন, 'ও জমি আমার।' শুতলোমভের লোকেদের হচ্ছে খাজনা প্রথা; তাদের জমিদার গেছেন বিদেশে — তাদের পক্ষে দাঁড়ায় কে? আপনিই বলুন না আমাকে? কিন্তু জমি যে তাদের এতে কোনো সন্দেহ নেই; যুগের পর যুগ ধরে তারা বাঁধা ওই জমিতে। তাই তারা আমায় এসে বলল, 'আমাদের একটা দরখাস্ত লিখে দিন।' কাজে কাজেই আমি লিখে দিলাম একখানা দরখাস্ত। আর বেসপান্দিন এ কথা শুনে আমাকে শাসাতে লাগলেন। 'মিতিয়ার দেহের প্রত্যেকখানি হাড় আমি ভাঙব, কাঁধের ওপর থেকে ওর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেব আমি।' দেখব আমরা কী করে উনি মাথা ছেঁড়েন; এখন পর্যন্ত চলছে ব্যাপারটা, এই তো।"

বুড়ো বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, আর দেমাক দেখিয়ো না; বিপদেরই কথা, হ্যাঁ তোমার মাথাটির কথাই বলা হচ্ছে। একেবারে বদ্ধ পাগল তুমি!"

"কেন কাকা, আপনি নিজে আমায় কী বলেছিলেন?"

অভসিয়ানিকভ বাধা দিয়ে বলল, "জানি, তুমি কী বলবে, আমি জানি। মানুষকে অবশ্যই বাঁচতে হবে সাধুভাবে আর প্রতিবেশীদের উপকার করতে হবেই। কখনো কখনো নিজেকেও মানুষের রেহাই দেওয়া চলে না। কিন্তু সর্বদাই কি চলে সেভাবে? তোমাকে ওরা পানশালায় নিয়ে যায় না, য়্যাঁ? তোমাকে খাওয়ায় না, মাথা নুয়ে নমস্কার করে না, য়্যাঁ? তারা বলে, 'দমিত্রি আলেক্সেইচ, আমাদের সাহায্য করো, আমরাও তোমার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেব।' এই বলে একটি রুপোর রুবল বা নোট ফেলে দেয় না তোমার হাতে। য়্যাঁ? তাই হয় না বলো, হয় না তা?"

একটু থতমত খেয়ে মিতিয়া বলল, "তাতে আমার নিশ্চয়ই দোষ আছে; কিন্তু গরীবদের কাছ থেকে আমি কিছুই নিই না, আর বিবেকের বিরুদ্ধে আমি কোনো কাজ করি না।"

"আজ নাও না তাদের কাছ থেকে, কিন্তু যখন নিজের অবস্থা খারাপ হবে, তখন নেবেই। বিবেকের বিরুদ্ধে চলো না, ধিক তোমাকে! যাদের পক্ষ তুমি নিয়ে থাক তারা তো সবাই সাধুপুরুষ! ... বরিস পেরেখোদভকে ভুলে গেছ? তার তদ্বির-তদারক করেছিল কে? কে তাঁকে রক্ষা করেছিল, য়্যাঁ?"

"পেরেখোনস্ত তার নিজের দোষেই দুঃখ পেয়েছিল নিশ্চয়।"

"সে জনসাধারণের টাকা মেরেছিল। চালাকি নয়!"

"কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, কাকা, তার দারিদ্র্য, তার পরিবারের কথাটা ভেবে দেখুন।"

"দারিদ্র্য, দারিদ্র্য... সে তো মাতাল, কুঁদুলে লোকটা, তা-ই নয়?"

গলা নামিয়ে মিতিয়া বলল, "কষ্টে পড়ে সে মদ ধরেছিল।"

"কষ্টে পড়েই বটে! তা তোমার হৃদয়ে যদি তার জন্য এত সহানুভূতি তাহলে তাকে সাহায্য করতে পারতে, কিন্তু ওই মাতালটার সঙ্গে নিজে গিয়ে মদের আড্ডায় বসার প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য তার কথাবার্তা এত চমৎকার... তাজ্জব লোক সত্যি!"

"খুব ভালো লোক ছিল সে।"

"তোমার কাছে প্রত্যেকেই তো ভালো। কিন্তু তুমি কি ওকে পাঠিয়েছিলে?..." স্ত্রীর দিকে ফিরে বলে চলল অভসিয়ানিকভ, "হ্যাঁ বলো, তুমি জানো?"

তাতিয়ানা ইলিনিচনা মাথা নাড়লেন।

বুড়ো আবার শুরু করল, "হালে কোথায় ছিলে তুমি?"

"শহরে গিয়েছিলাম।"

"কিছু না করে কেবল বিলিয়ার্ড খেলছিলে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আর চা গিলছিলে, আর গীটার বাজাচ্ছিলে আর ছুটোছুটি করছিলে সরকারী দপ্তরের এদিকে ওদিকে, পিছ-কুঠরীতে বসে দরখাস্ত খসড়া করে দিচ্ছিলে, আর বণিক ব্যাপারীদের ছেলেদের সঙ্গে জাঁক দেখিয়ে চলছিলে? তাই নিশ্চয়? কি বলো!"

মিতিয়া একটু মুচকে হেসে বলল, "বোধহয় তাই। ও হো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম—ফুস্তিকভ, আন্তোন পার্ফেনীচ ফুস্তিকভ রোববার আপনাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেছেন।"

"বুড়ো জালাটার কাছে আমি যাব না। দামী দামী মাছ দেবে খেতে আর তাতে মাখন দেবে পচা। ঈশ্বর দেখুন তাকে!"

"ফেদোসিয়া মিখাইলভ্‌নার সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছিল।"

"কোন্ ফেদোসিয়া?"

"তার মনিব হচ্ছেন জমিদার গাপেন্‌চেঙ্কো, মিকুলিনো যিনি নীলামে ডেকে নিয়েছেন। ফেদোসিয়ার বাড়ি মিকুলিনোতে। মস্কোতে ছিল, পোষাক বানাত, কাজের বদলে দাম দিত টাকায়, একেবারে ঠিক ঠিক হিসাব করে দাম দিত — বছরে একশ সাড়ে বিরাশী রুবল... আর নিজের কাজটি সে জানে; মস্কোয় ভালো অর্ডার পেত। কিন্তু এখন গার্পেনচেঙ্কো তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, এখানেই রাখেন তাকে, অথচ কোনো কাজের যোগাড় করে দেন না। সে টাকা দিয়ে নিজের মুক্তি আদায় করে নিতে প্রস্তুত, মনিবকে তা বলেওছে, কিন্তু মনিব কোনো পাকা জবাব দেবেন না। আপনার তো, কাকা, গার্পেন্‌চেঙ্কোর সঙ্গে জানাশোনা আছে ... আপনি তাকে একটা কথা বলতে পারেন না? ফেদোসিয়া নিজের মুক্তির জন্য বেশ ভালো দামই দেবে।"

"তোমার টাকা দিয়ে নয়, আশা করি? কি হে? আচ্ছা, বেশ ঠিক আছে; আমি বলব তাঁকে, বলব। কিন্তু কি হবে জানি না," বুড়ো বিব্রত মুখে বলে চলল, "এই গার্পেন্‌চেঙ্কো একটি হাঙর বিশেষ, ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন! তিনি ঋণ কর্জা খরিদ করেন, সুদে টাকা ধার দেন, জমিদারীর পর জমিদারী কিনে নেন নীলামে... আর কে আনল তাঁকে আমাদের এই অঞ্চলে? উঃ, এই নয়া আদমীদের আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না! খুব সহজে তাঁর কাছ থেকে জবাব পাওয়া যাবে না। তবু যাই হোক, দেখা যাবে।"

"ব্যাপারটার একটা সুরাহার চেষ্টা করুন কাকা।"

"বেশ বেশ, দেখব আমি। তুমি শুধু সাবধান হও; নিজের সম্পর্কে সতর্ক থাকো! এই যে, এই, নিজের হয়ে আর কথা বলো না। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন! ঈশ্বর দয়া করুন তোমায়! ভবিষ্যতের বিষয়ে কিন্তু সাবধান হও, আর নইলে, মিতিয়া, শুনে রাখো আমার কথা, তোমার ভালো হবে না। সত্যি বলছি, তোমার কপালে দুঃখু আছে। বরাবর আমি তোমাকে আড়াল করে রাখতে পারব না... তাছাড়া আমি তো প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোক নই। আচ্ছা, এবার যাও, ঈশ্বর দেখুন তোমাকে!"

মিতিয়া চলে গেল। তার পেছন পেছন তাতিয়ানা ইলিনিচনা বেরিয়ে গেলেন।

অভসিয়ানিকভ তাঁকে ডেকে বলল, "ওগো করুণাময়ী, ওকে একটু চা দাও।" তারপর বলল,"ছেলেটা বোকা নয়। অন্তঃকরণটিও ভালো, কিন্তু ওর

জন্য আমার ভয় হয় ... আপনাকে কিন্তু এ সব খুঁটিনাটিতে আটকে রাখলাম এতক্ষণ, আমাকে ক্ষমা করুন।"

হলের দরজাটা খুলে গেল। ভেলভেটের কোট-পরা ছোটোখাটো একটি ধূসর রঙের লোক প্রবেশ করল।

অভসিয়ানিকভ বলে উঠল, "আরে, ফ্রানৎস ইভানীচ! আসুন, সুপ্রভাত। আপনার মঙ্গল তো ঈশ্বরের অনুগ্রহে?"

সহৃদয় পাঠক, এই ভদ্রলোকটির পরিচয় দিতে দিন আমাকে।

ফ্রানৎস ইভানীচ লেঝেন আমার প্রতিবেশী, অরেল প্রদেশের একজন জমিদার, রুশী অভিজাতের সম্মানিত স্থানটি অর্জন করেছে সে, এ মর্যাদা খুব মামুলীভাবে অবশ্য অর্জন করেনি। জন্মেছিল অরলিনসে, পিতা মাতা ফরাসী, নেপোলিয়নের সঙ্গে ড্রাম বাজনার কাজে নিযুক্ত হয়ে সে এসেছিল রাশিয়া আক্রমণে। প্রথমে সবকিছু গেল বেশ ভালোয় ভালোয়, মাথা উঁচু করে মস্কোয় এল আমাদের ফরাসী বীর। কিন্তু ফেরার পথে বেচারা মঁসিয়ে লেঝেন শীতে অর্ধেক জমে গিয়েছিল, ড্রামটিও গেল তার, স্মলেনস্কের কয়েকজন চাষীর হাতে ধরা পড়ল সে। রাত্রির মতো চাষীরা তাকে আটকে রাখল ফাঁকা একটা কাপড়-কলে। পরদিন সকালে তারা তাকে নিয়ে এল বাঁধের কাছে বরফ-ঢাকা গর্তের সামনে, তারপর মহামাননীয় সেনাবাহিনীর ড্রাম বাদককে বলতে লাগল, এবার সে তাদের বাধিত করুক, অর্থাৎ বরফের নিচে সাঁতার কাটুক। মঁসিয়ে লেঝেন তাদের কথায় রাজী হতে পারল না, উল্টে স্মলেনস্কের চাষীদের ফরাসী ভাষায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে চাইল যেন তারা তাকে অরলিনসে চলে যেতে দেয়। বলল, "মশাইরা শুনছেন, আমার মা বেঁচে আছেন, une tendre mere*।" কিন্তু চাষীরা নিশ্চয় অরলিনসের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল, আর তাই তারা কেবল তাকে বক্রকুটিল গ্নিলোতিওর্কা নদীর প্রবাহ ধরে জলের তলায় যাবার পথই দেখিয়ে দিতে লাগল, আর ঘাড় এবং মেরুদণ্ডের ওপর দু'চারটি সামান্য চাটি মেরে তাকে উৎসাহিতও করতে শুরু করছিল, কিন্তু অকস্মাৎ ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল, লেঝেনের অবর্ণনীয় আনন্দের মাঝে বাঁধের ওপর দিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড

* আমার স্নেহময়ী মা।

স্লেজ, পিছনের জায়গাটা অতিরিক্ত উ'চু, সে জায়গাটির ওপরে বিছানো একখানা রঙীন গালিচা, স্লেজে জোতা তিনটি ডোরাকাটা ঘোড়া। স্লেজের ওপর বসে আছেন মোটাসোটা লালমুখো একজন জমিদার, গায়ে তাঁর নেকড়ের চামড়ার বড়ো ওভারকোট।

চাষীদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কী করছ তোমরা?"

"আজ্ঞে, একটা ফরাসীকে জলে ডুবোচ্ছি, হুজুর।"

জমিদার নির্লিপ্ত জবাব দিলেন, "আহ্!" তারপর ফিরলেন।

সে বেচারী তখন আর্তনাদ করে উঠল, "ম'সিয়ে! ম'সিয়ে!"

নেকড়ের চামড়ার ওভারকোট তখন বললেন ভৎ'সনা করে, "আঃ হা! বিশটা জাতির লোক নিয়ে তোমরা রাশিয়ায় এসেছ, পুড়িয়ে দিয়েছ মস্কো, পাষণ্ড বিধর্মী! — ইভান দি গ্রেট-এর ক্রুশ ছি'ড়ে ফেলে দিয়েছ, আর এখন বড় — মোসু, মোসু, বলিহারি! এখন ল্যাজ গুটিয়েছ! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে! ... চালাও ফিল্‌কা!"

ঘোড়াগুলো শুরু করছিল চলতে।

কিন্তু জমিদার বললেন, "আচ্ছা, থামো তো দেখি! ওহে এই মোসু গানবাজনা কিছু জানা আছে?"

লেঝেন বলল বারবার, "Sauvez-moi, sauvez-moi, mon bon monsieur!"*

"এই দেখো, দেখছ কী হতভাগা লোকগুলো! একটাও জানে না রুশ ভাষা! মিউজিক, মিউজিক, সাভে মিউজিক ভু? সাভে? বলো তো! কোম্প্রেনে? সাভে মিউজিক ভু? পিয়ানো ঝুএ সাভে?"

জমিদার কী বলতে চান, লেঝেন শেষ পর্যন্ত বুঝল, তারপর একাদিক্রমে মাথা নাড়াতে লাগল।

"Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue tous les instruments possibles! Oui, monsieur... Sauvez moi, monsieur!"**

* আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান, দয়ালু মশাই! (ফরাসী ভাষা)

** হ্যাঁ, মশাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বাজিয়ে; আমি সব রকমেরই যন্ত্র বাজাই! হ্যাঁ, মশাই ... আমাকে বাঁচান, মশাই! (ফরাসী ভাষা)

জমিদার বললেন, "যাক, তোমার বরাত ভালো! বাছারা, যেতে দাও ওকে; আর এই নাও বিশ কোপেক, ভদকা খেয়ো।"

"আজ্ঞে হুজুর, ধন্যবাদ হুজুর। ওকে আপনি নিয়ে যান কর্তা।"

লেঝেনকে তারা স্লেজে বসিয়ে দিল। আনন্দে সে হাঁপিয়ে উঠছিল, কেঁদে ফেলছিল, কাঁপছিল, মাথা নুয়ে নমস্কার করছিল, জমিদারকে, তাঁর সহিসকে, চাষীদের, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। পরনে তার ছিল মাত্র পাটল রঙের রিবন আঁটা একটি সবুজ জ্যাকেট, অথচ তখন বরফ জমে যাচ্ছিল পাথরের মতো কঠিন হয়ে। জমিদার নীরবে তার নীল হয়ে যাওয়া অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বেচারীকে নিজের ওভারকোটের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাড়ির লোকজন সব ছুটে এল। ফরাসীটিকে একটু উষ্ণ উত্তপ্ত করে, খাইয়ে দাইয়ে কাপড় চোপড়ে সাজাতে বেশি দেরী লাগল না। বাড়ির মনিব তখন তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেয়েদের কাছে।

তাদের তিনি বললেন, "এই যে, বাছারা, তোমাদের শিক্ষক পাওয়া গেছে একজন। গান শেখাতে আর ফরাসী বুলি শেখাতে বারবার বলতে তোমরা এই একজন ফরাসী নিয়ে এসেছি, এ পিয়ানোও বাজাতে পারে... "আসুন মোসু!" বলে তিনি দেখালেন একটি ছোটো হতচ্ছাড়া গোছের যন্ত্র। সেটা তিনি কিনেছিলেন পাঁচ বছর আগে একজন ইহুদীর কাছ থেকে, সে ইহুদীর ব্যবসার বিশেষ লাইন অবশ্য ছিল ইউ-ডি-কোলোন, জমিদার বললেন, "তোমার শিল্প-নিদর্শন কিছু আমাদের দেখাও; ঝুএ!"

লেঝেনের তো প্রায় প্রাণ উড়ে যাবার যোগাড়, তবু সে গিয়ে বসল বাজানোর টুলে, জীবনে কখনো পিয়ানো ছোঁয়নি সে।

জমিদার আবার বললেন, "ঝুএ, ঝুএ!"

মরীয়া হয়ে হতভাগ্য ভদ্রলোক ড্রাম বাজানোর কায়দায় পিয়ানোর ঘাটগুলো পিটিয়ে চলল, একেবারে আবোল তাবোল বাজাল। পরে ও বলেছে, "আমি মনে মনে এ কথাই স্থির ভাবছিলাম যে, এবার আমার পরিত্রাতা আমার কলারটা টেনে ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন আমাকে।" কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অনিচ্ছুক সেই সঙ্গীত-স্রষ্টাকে অবাক করে দিয়ে বেশ খোসমেজাজে তার কাঁধটি তিনি চাপড়ে দিলেন।

বললেন, "বেশ বেশ, তোমার পারদর্শিতার প্রমাণ পেলাম আমি, এবার যাও, গিয়ে বিশ্রাম করো।"

এক পক্ষকালের মধ্যে লেঝেন এই জমিদারের বাড়ি ছেড়ে গেল অন্য আর একজন ধনী, সংস্কৃতিবান জমিদারের বাড়িতে। দিব্য ভদ্র আচরণের গুণে তাঁর বন্ধুত্ব অর্জন করল, তাঁরই একটি আশ্রিতাকে বিয়ে করে লেঝেন একটা সরকারী অফিসে ঢুকল, তারপর অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন হয়ে মেয়ের বিয়ে দিল অরেলের একজন জমিদার, অবসরভোগী অশ্বারোহী, পদ্য লেখক লবীজানিয়েভের সঙ্গে এবং অরেলে একটি জমিদারীতে এসে বসতি করল।

এই সেই লেঝেন, যাকে আজকাল বলা হয় ফ্রানৎস ইভানীচ, আমি থাকতে থাকতে সে-ই এল অভসিয়ানিকভের সঙ্গে দেখা করতে, অভসিয়ানিকভের সঙ্গে তার খাতির ছিল।

কিন্তু পাঠক বোধহয় এতক্ষণ আমার সঙ্গে অভসিয়ানিকভের বাড়িতে বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন, এবার আমি তাই বাগ্মিতাসহকারে নীরব হয়ে যাব।

ল্গোভ

"চল্ন ল্গোভে যাই," একদিন আমায় বলল ইয়েরমলাই, তাকে পাঠক ইতিমধ্যে চিনেছেন; "সেখানে প্রাণভরে হাঁস মারা যাবে।"

ব্নো হাঁসের প্রতি খাঁটি শিকারীর বিশেষ কোনো আকর্ষণ অবশ্য নেই, তব্ সে সময়টায় আর কোনো শিকার যখন পাওয়া যাবে না (সবে তখন সেপ্টেম্বরের শ্র্; তখনো কাদাখোঁচারা উড়ে চলতে আরম্ভ করেনি, আর তিতিরের পেছনে মাঠে মাঠে ছ্টে বেড়িয়ে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম) তখন আমার শিকারীর পরামর্শ শ্নলাম, গেলাম দ্জনে ল্গোভে।

স্তেপভূমির একটি বড়ো গ্রাম এই ল্গোভ, পাথরে তৈরি অতি প্রাতন একটি গির্জা আছে, গির্জার একটিমাত্র গম্ব্জ, আর বাদায় ভরা ছোটো রসোতা নদীটির পারে দ্টি মিল। ল্গোভ থেকে পাঁচ মাইল দ্রে এই নদীটা পরিণত হয়ে গেছে বিস্তৃত একটি দীঘিতে, তার কিনারাগ্লো ঘন শরে ঢেকে গেছে, কোথাও কোথাও দীঘির মাঝখানেও খাগড়া বনে ছেয়ে গেছে। এই শরবনের ফাঁকে ফাঁকে খাড়িতে বাস আর বংশবৃদ্ধি করে অসংখ্য জাতের হাঁস — কোয়েকার, হাফ-কোয়েকার, পিনটেল, বালি হাঁস, পানকৌড়ি প্রভৃতি। ছোটো ছোটো ঝাঁক সর্বদাই বিচরণ করছে, জলের ওপর সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, বন্দ্কের আওয়াজ পেলেই একেবারে মেঘের মতো তারা উড়ে আকাশ এমন ছেয়ে ফেলে যে শিকারী একান্ত অনিচ্ছায় হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেন তাঁর টুপিটা, তারপর ম্খ থেকে দীর্ঘ একটি শব্দ বের হয় "ফ্ঃ!" ইয়েরমলাই-এর সঙ্গে পাড় দিয়ে হেঁটে চললাম, কিন্তু প্রথমত হাঁস অতি সতর্ক পাখি, পাড়ের খ্ব কাছাকাছি তাদের পাওয়া যায় না; তাছাড়া দল ছেড়ে ছিটকে পড়ে কোনো অনভিজ্ঞ বালি হাঁস যদি আমাদের গ্লির ম্খে পড়ে প্রাণ হারায়ও তব্ কুকুরগ্লো ঘন শরবনের মধ্য থেকে তাদের টেনে তুলে আনতে পারে না;

প্রচণ্ড অধ্যবসায় ও চেষ্টা সত্ত্বেও কুকুরগুলো না পারে সাঁতরাতে, না পারে জলের নিচের মাটিতে পা রেখে এগুতে, কেবল তীক্ষ্ম শরে লেগে মিছিমিছি ওদের মহামূল্য নাক কেটে ছিঁড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত ইয়েরমলাই বলল, "না, এ চলবে না; একটা নৌকো যোগাড় করে নিতে হবে। চলুন ল্গোভে ফিরে যাই।"

ফিরে চললাম। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি সহসা একটা হতভাগা চেহারার শিকারী কুকুর একটা ঝোপওয়ালা উইলোর পেছন থেকে বেরিয়ে এল আমাদের সামনে, আর তার পেছন পেছন এল একটি মাঝারি আকারের লোক, গায়ে নীল বহু পুরাতন গ্রেট-কোট, হলুদ রঙের একটি ওয়েস্ট-কোট, পরনের পাৎলুন সাধারণ ধূসর বর্ণের, পাৎলুনের প্রান্তভাগ তাড়াতাড়ি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ছেঁড়া, ফুটো উঁচু বুটজুতোর মধ্যে; লোকটির গলায় জড়ানো একখানা লাল রুমাল, কাঁধে একটি একনলা বন্দুক। আমাদের কুকুরগুলো তাদের জাতের অদ্ভুত মামুলী চীনা কায়দায় তাদের নতুন আগন্তুককে শুঁকতে লাগল, ও কুকুরটা এদিকে ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল, ল্যাজটা তার ইতিমধ্যে দু'পায়ের মাঝখানে গিয়ে গুটিয়েছে, কান দুটো পেছন দিকে নেমে পড়েছে আর সে বার বার ঘুরছে এদিক ওদিক আর দাঁত বার করছে—আগন্তুক লোকটি তখন এগিয়ে এল আমাদের পানে এবং চূড়ান্ত বিনয়ে নুয়ে পড়ে নমস্কার করল। তার বয়স প্রায় পঁচিশ হবে; ক্ভাসে একেবারে চুপ্‌চুপে তার লম্বা কালো চুল শক্ত ঝুঁটিতে খাড়া হয়ে আছে; ক্ষুদে বাদামী চোখ দুটি বেশ সহর্ষে পিট পিট করছে; মুখখানা তার বাঁধা একটি কালো রুমালে, যেন দাঁতের ব্যথার জন্য, কিন্তু মুখমণ্ডল হাসি এবং ভদ্রতায় মাখানো।

নরম অর্থপূর্ণ গলায় সে বলতে লাগল, "আমার পরিচয় দিচ্ছি আপনাদের; আমি এ অঞ্চলের একজন শিকারী — ভ্লাদিমির... আপনি এসেছেন শুনে, আর আমাদের দীঘির পাড়ে আসছেন জানতে পেরে আপনার কাজে লাগব ঠিক করেছি, অবশ্য আপনি যদি তাতে অসন্তুষ্ট না হন।"

শিকারী ভ্লাদিমির এই কথাগুলো উচ্চারণ করল এমনভাবে যেন কোনো মফঃস্বলের অভিনেতা প্রেমিক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তার প্রস্তাবে আমি রাজী হলাম, তারপর ল্গোভে পেঁৗছে যাবার আগেই আমি তার গোটা ইতিহাসটি জেনে নিতে পারলাম। সে ছিল একজন ঘর-গোলাম, এখন মুক্তি

পেয়েছে; কৈশোরে তাকে সঙ্গীত শেখানো হয়েছিল, তারপর পরিচারকের কাজ করেছে, লিখতে পড়তে জানে, এ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম—কিছু বাজে বই-টই পড়েছে, এখন তার হাতে একটি কপর্দকও নেই, এই অবস্থাতেই সে আছে, যেমন আছে রাশিয়ায় বহু বহু লোক, নিয়মিত কোনো চাকরী-বাকরী তার নেই; স্বর্গের শিশির খেয়ে কিংবা তার চেয়ে কিছু কম শোচনীয় গোছের এমন কোনো খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে। অসাধারণ নিপুণ সুষমায় সে তার কথা প্রকাশ করল, নিজের আচার-আচরণ সম্পর্কে স্পষ্টতই আত্মশ্লাঘা আছে; সে নিশ্চয় মেয়েদেরও খুব ভক্ত, আর খুব সম্ভব তাদের বেশ প্রিয়: রুশী মেয়েরা মার্জিত কথাবার্তা ভালোবাসে। অন্যান্য কথার মধ্যে সে আমায় জানাল যে, কখনো কখনো সে আশপাশের জমিদারদের কাছে গেছে, শহরে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কাটিয়েছে, প্রেফারেন্স খেলেছে, আর সদর শহরের লোকজনের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। তার হাসিটি একেবারে নিখুঁত এবং বহুরূপী; অন্য লোকের কথা শোনার সময় তার ঠোঁটে যে একটি বিনীত সংযত হাসি খেলত, তা সব চাইতে বিশেষভাবে তাকে মানাত। আপনার কথা সে শুনবে মন দিয়ে, পুরোপুরি স্বীকার করে নেবে আপনার কথা, কিন্তু তবু সে নিজের মর্যাদাটির খেয়াল হারাবে না, আর যেন এ রকম একটি ধারণা আপনার মনে সৃষ্টি করতে চাইবে যে প্রয়োজন হলে সে নিজে যা বিশ্বাস করে তা প্রকাশ করতে পারে। ইয়েরমলাই খুব বেশি মার্জিত নয়, "সূক্ষ্মতা"র লেশমাত্র নেই তাতে, সে স্থূল একটা সৌহার্দের ভাব নিয়ে ওকে সম্বোধন করতে লাগল। যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ নিয়ে ভ্লাদিমির "স্যার" বলে তার জবাব দিচ্ছিল তা বাস্তবিক দেখবার মতো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মুখ তোমার বাঁধা কেন? দাঁতে ব্যথা নাকি তোমার?"

সে বলল, "না, অসাবধানতার এ একটা সর্বনাশা পরিণতি। আমার এক বন্ধু ছিল, বড়ো ভালো লোক, কিন্তু মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায়, সে শিকারী ছিল না মোটে। যাই হোক, একদিন তো সে আমায় বলল, 'বন্ধু, আমাকে শিকারে নিয়ে চলো, এই খেলার মধ্যে কী আছে জানবার জন্য আমি উৎসুক।' বন্ধুর অনুরোধ অমান্য করতে নিশ্চয় ভালো লাগে না, আমি তাকে একটি বন্দুক যোগাড় করে দিয়ে নিয়ে গেলাম শিকারে। যা হোক, আমরা তো একটু

আধটু শিকার করলাম মামুলীভাবে, শেষে ভাবলুম যে একটু বিশ্রাম নেব। একটা গাছের নিচে আমি বসলাম, কিন্তু সে এদিকে করল কি, আমার দিকে তাগ করে বন্দুক নিয়ে খেলা করতে লাগল। আমি তাকে বললুম খেলা বন্ধ করতে, কিন্তু অনভিজ্ঞ সে আমার কথা কানে তুলল না, বন্দুক থেকে গেল গুলি বেরিয়ে, আর আমি আমার চোয়ালের অর্ধেকটা এবং ডান হাতের তর্জনীটি হারালাম।"

আমরা পেঁছিলাম ল্‌গোভে। ভ্‌লাদিমির এবং ইয়েরমলাই দুজনেই স্থির করে ফেলেছে যে, নৌকা ছাড়া আমাদের শিকার করা চলবে না।

ভ্‌লাদিমির বলল, "সুচোক-এর (তার মানে 'গাছের ডাল') একটা শালতি আছে। কিন্তু কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছে জানি না। তার কাছে যেতে হবে আমাদের।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কার কাছে?"

"লোকটি এখানেই থাকে, তার ডাকনাম সুচোক।"

ইয়েরমলাই-এর সঙ্গে ভ্‌লাদিমির গেল সুচোকের বাড়ি। ওদের বলে দিলাম, গির্জায় আমি অপেক্ষা করব তাদের জন্য। গির্জার প্রাঙ্গণে সমাধি-শিলাগুলি দেখে বেড়াচ্ছিলাম, অকস্মাৎ একটি কালো হয়ে যাওয়া, চারকোণা ভস্মাধার দেখলাম, তার একদিকে ফরাসী ভাষায় উৎকীর্ণ আছে: "Ci git Theophile Henry, vicomte de Blangy"*; অপর দিকে: "এই প্রস্তর খণ্ডের নিচে শুয়ে আছেন একজন ফরাসী প্রজা, নাম তাঁর কাউণ্ট ব্লানঝি, জন্ম ১৭৩৭, মৃত্যু ১৭৯৯, যখন তাঁর বয়স ৬২ বৎসর"; তৃতীয় দিকে: "তাঁর ভস্মাবশেষে শান্তি বিরাজ করুক", চতুর্থ দিকটিতে উৎকীর্ণ:

"এই পাথরের নিচে শয়ান ফরাসী এক বিদেশী।
উচ্চ তাঁহার বংশটি, প্রতিভাও ছিল।
পত্নী, বন্ধু খুন হল তাঁর, শোকে
পীড়নকারীর অত্যাচারে ছাড়লেন দেশ।
লাভ করলেন মিত্র দেশ, রুশ মাটিতে,
পেলেন হেথায় আতিথ্য আর সমাদর:
শিশুরা তাঁর শিক্ষা পেত, বাপমায়েরা নিরুদ্বেগ;
ঈশ্বর ইচ্ছায় এইখানে তাঁর শয্যা হল শান্তিতে।"

* এখানে শুয়ে আছেন তেওফিল হেনরী, কাউণ্ট ব্লানঝি।

এমন সময় ভ্লাদিমির আর সেই অদ্ভুত ডাকনাম-ওয়ালা লোকটি—স্চোককে সঙ্গে করে এসে পড়ল ইয়েরমলাই; আমার ধ্যান ভেঙে গেল।

খালি পা, পোষাক শতচ্ছিন্ন, অবিন্যস্ত স্চোককে দেখে মনে হল সে একজন কর্মচ্যুত ঘর-গোলাম, বয়স বোধহয় ষাট বছর।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি নৌকো আছে?"

ভাঙা কর্কশ স্বরে সে জবাব দিল, "নৌকো আছে আমার, কিন্তু বড়ো কাহিল তার অবস্থা।"

"কী রকম?"

"নৌকোর পাটাতনগুলো টুটে গেছে, চিড় খুলে জোড়া বেরিয়ে গেছে।"

মাঝখান থেকে ইয়েরমলাই বলল, "সে আর এমন কি ভয়ানক বিপর্যয়! ও আমরা দড়ি দিয়ে বন্ধ করে নিতে পারব।"

সায় দিয়ে স্চোক বলল, "অবশ্যই।"

"কিন্তু তুমি কে জানতে পারি?"

"আমি কর্ত্রীর জেলে।"

"তা কী করে হয়? বলছ তুমি জেলে, তবে তোমার নৌকোর অমন দুর্দশা কেন?"

"আমাদের নদীতে তো মাছ নেই।"

আমার শিকারী বিশেষজ্ঞের ভাব করে বলল, "মাছেরা আটাল বিল পছন্দ করে না।"

ইয়েরমলাইকে বল্লাম, "এই যে, যাও তো, গিয়ে কিছু দড়ি নিয়ে এসো, যত জলদি পারো নৌকোটা ঠিক করে ফেলো তো।"

চলে গেল ইয়েরমলাই।

আমি ভ্লাদিমিরকে বললাম, "তা, এই ভাবে আমরা একেবারে জলের তলায় গিয়েও পেঁছুতে পারি।"

সে বলল, "ঈশ্বর করুণাময়। তাছাড়া, পুকুরটা খুব গভীর নয় বলেই আশা করে নিতে হয়।"

"না, তা গভীর নয়," বলল স্চোক; কণ্ঠস্বরটি তার অদ্ভুত, দূরাগত, যেন সে স্বপ্নাবিষ্ট, "তাছাড়া, তলায় বাদার ঘাস আছে, পাঁক আছে, আর সর্বত্র তো ঘাসে ভর্তি। অবশ্য গভীর গর্তও আছে এখানে-ওখানে।"

ভ্লাদিমির বলল, "কিন্তু ঘাস যদি এত ঘন হয় তবে নৌকো বাওয়া অসম্ভব হবে।"

"শালতি-নৌকো বেয়ে চলবার কথা ভাবছে কে? শালতির মতোই চালাতে হয়। আপনাদের সঙ্গে আমি যাব, আমার লগি আছে—নয়ত কাঠের বৈঠাও ব্যবহার করা চলতে পারে।"

ভ্লাদিমির বলল, "বৈঠা দিয়ে কাজটা সহজ হবে না; জায়গায় জায়গায় তলার মাটি পাওয়া যাবে না হয়ত।"

"তা ঠিক, সহজ হবে না।"

একটি সমাধি-শিলার ওপর বসে আমি ইয়েরমলাই-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে সম্মান করে একটু দূরে সরে গিয়ে ভ্লাদিমিরও বসল। সুচোক দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়, পুরানো ঘর-গোলামদের অভ্যাস মতো তার মাথাটি নোয়ানো, হাত দুটি পেছনে জড়ানো।

আমি বলতে শুরু করলাম, "বলো তো, এদিকে অনেকদিন তুমি জেলের কাজ করেছ?"

একটু চমকে উঠে সে বলল, "আজ সাত বছর।"

"তার আগে কী করতে?"

"আগে সহিস ছিলাম।"

"সহিসের কাজ থেকে বরখাস্ত কে করল?"

"নতুন কর্ত্রী।"

"কে তিনি?"

"আমাদের যিনি কিনে নিয়েছিলেন। আপনি তাঁকে আজ্ঞে চেনেন না হুজুর, তাঁর নাম আলিয়োনা তিমফেয়েভনা, এমন মোটা তিনি ... মানে তরুণী নন।"

"তিনি তোমাকে জেলে করবেন বলে স্থির করলেন কেন?"

"ঈশ্বর জানেন। তামবোভে তাঁর জমিদারী থেকে এলেন এখানে, বাড়ির সবাইকে জড়ো হতে বললেন, আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। প্রথমে আমরা তাঁর করচুম্বন করলুম, তিনি বললেন না কিছু; রাগ করেননি তিনি। ... তারপর এক এক করে আমাদের তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'কী কাজে আছ তোমরা? কী কী কাজ করতে হয় তোমাদের?' আমার পালা এল, তিনি

জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কাজ করছ? আমি বললাম, 'সহিসের কাজ।' 'সহিস? বাঃ, খুব একজন সহিস; নিজের দিকে একবার দেখো তাকিয়ে! তুমি সহিসের উপযুক্ত নও, এবার আমার জেলে হও তুমি, আর দাড়ি কেটে ফেলো। আমি যখন আসব তখন খাবার মাছ যোগাড় করে দেবে, শুনেছ?' ... কাজেই তখন থেকে আমি জেলে হয়েছি। 'আর খেয়াল রেখো, আমার দীঘিটা যেন ঠিক থাকে।' কিন্তু কী ভাবে ঠিক রাখব পুকুর?"

"আগে কার অধীনে ছিলে?"

"সের্গেই সের্গেইচ পেখ্‌তেরেভ-এর। তাঁর অধীন হয়েছিলাম বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রে। কিন্তু বেশি দিন তিনি আমাদের রাখেননি; মাত্র ছ'বছর রেখেছিলেন। আমি ছিলুম তাঁর সহিস ... কিন্তু শহরে নয়, সেখানে তাঁর অন্য সহিস ছিল — আমি কেবল গ্রামেই ছিলাম।"

"যুবক বয়স থেকে কি বরাবরই তুমি সহিস ছিলে?"

"বরাবর সহিস? আজ্ঞে না! সহিস হলাম সের্গেই সের্গেইচের আমলে; কিন্তু তার আগে আমি ছিলাম পাচক — কিন্তু শহরের পাচক নয়, গ্রামের মাত্র।"

"কার পাচক ছিলে তখন?"

"আজ্ঞে আমার আগের মনিবের, সের্গেই সের্গেইচের কাকা আফানাসি নেফিওদীচের। ল্‌গোভ কিনে নিয়েছিলেন তিনিই, তারপর আফানাসি নেফিওদীচের কাছ থেকে তা সের্গেই সের্গেইচ পান উত্তরাধিকারসূত্রে।"

"কার কাছ থেকে কিনেছিলেন?"

"তাতিয়ানা ভাসিলিয়েভ্‌নার কাছ থেকে।"

"কোন তাতিয়ানা ভাসিলিয়েভ্‌না?"

"আজ্ঞে সেই যে, যিনি গত বছর বোলখভে মারা গেলেন... মানে কারাচেভ-এ বৃদ্ধা কুমারী একজন ... তিনি বিয়েই করেননি। আপনি তাঁকে চেনেন না? আমরা তাঁর কাছে এসেছিলাম তাঁর বাবা ভাসিলি সেমিওনীচের কাছ থেকে। তিনি আমাদের মালিক ছিলেন দীর্ঘকাল ... বিশ বছর।"

"তখন কি তাঁর পাচক ছিলে?"

"গোড়াতে, ঠিক বলতে গেলে, পাচকই ছিলাম, তারপর হলাম কফি-বেয়ারা।"

"কী হলে?"

"কফি-বেয়ারা।"

"সে আবার কী রকম কাজ?"

"জানিনে, আজ্ঞে। বুফেতে আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর আমাকে কুজ্‌মার বদলে ডাকা হত আন্তোন বলে। কর্ত্রী আদেশ দিলেন আমাকে ওই বলে ডাকতে হবে।"

"তাহলে তোমার আসল নাম কুজ্‌মা?"

"আজ্ঞে।"

"তুমি কি সব সময় কফি-বেয়ারাই ছিলে?"

"না, বরাবর নয়, আমি অভিনেতাও ছিলাম।"

"সত্যি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিলাম। ... থিয়েটারে আমি অভিনয় করেছি। আমাদের কর্ত্রী তাঁর নিজের এক থিয়েটার গড়েছিলেন।"

"কী ধরনের ভূমিকা নিতে তুমি?"

"আজ্ঞে কী বললেন?"

"থিয়েটারে কী করতে তুমি?"

"জানেন না? আমাকে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে দিত; আর যেমন যেমন দরকার সেজেগুজে আমি ঘুরে বেড়াতাম হয়ত, কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতাম বা বসে পড়তাম কখনো, ওরা বলত, 'এই যে দেখো, তোমাকে এই সব বলতে হবে,' আমি বলে যেতাম। একবার আমি এক অন্ধ সেজেছিলাম ... আমার চোখের পাতার নিচে ছোটো ছোটো মটরদানা রেখে দিয়েছিল ওরা ... হ্যাঁ, সত্যি।"

"তারপর কী হলে তুমি?"

"আবার আমি পাচক হয়ে গেলাম।"

"তোমাকে ওঁরা পাচকের স্তরে নামিয়ে দিলেন কেন?"

"আমার ভাই পালিয়ে গিয়েছিল।"

"ও, তা তোমার প্রথম কর্ত্রীর বাবার অধীনে কী করতে তুমি?"

"নানান কাজ ছিল আমার, — গোড়াতে হলুম পরিচারক, তার পরে পর পর গাড়িচালক, মালী, এবং কোড়াদার।"

"কোড়াদার? ... তুমি কি শিকারী কুকুর নিয়ে বেরুতে ঘোড়ায় চেপে?"

"হ্যাঁ, শিকারী কুত্তা নিয়ে বেরুতাম আমি; প্রায় মারা গিয়েছিলাম একবার, ঘোড়ার ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, ঘোড়াটাও জখম হয়েছিল। আমাদের বুড়ো কর্তা চটে আগুন, আমাকে চাবকাবার হুকুম দিলেন, বললেন আমায় মস্কোয় পাঠিয়ে দিতে, মুচীর কাছে কাজ শেখার জন্য।"

"কাজ শেখার জন্য? কিন্তু তখন তো তুমি কোড়াদার, ছেলেমানুষ ছিলে বলে তো মনে হয় না!"

"তখন আমার বয়স বিশ বছরের কিছু বেশি।"

"বিশ বছরে কাজ শেখা যায়? পেরেছ তুমি?"

"পারা যায় হয়ত, কর্তা তো হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যিস তিনি মারা গেলেন এর একটু পরেই, তখন ওরা আবার আমায় দেশে পাঠিয়ে দিল।"

"এরপর রান্নার কাজ তোমাকে শেখানো হল কখন?"

সুচোক তার পাতলা, হলদে গোছের ছোটো মুখটি তুলে দাঁত বার করে হাসল একটু।

"ও কি আর শেখাতে হয়?... মেয়েরাও পারে রান্না করতে।"

আমি মন্তব্য করলাম, "তা বেশ, তোমার কালে তুমি অনেক কিছু দেখেছ, কুজ্মা! এখন তো মাছ-টাছ কিছু পাওয়া যায় না, এখন জেলে হয়ে কী করছ?"

"ওঃ, তা হুজুর আমি কোনো নালিশ করি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে ওঁরা জেলে বানালেন। দেখুন না, আমার মতো আর এক বুড়ো — আন্দ্রেই পুপীরকে — কর্ত্রী হুকুম দিয়েছিলেন কাগজ-কলে ল্যাডলারের কাজে দিতে। তিনি বললেন, 'বসে বসে অন্ন ধ্বংস করা পাপ।' পুপীর আবার অনুগ্রহেরও আশা করেছিল, তার এক দূর সম্পর্কের ভাইপো কর্ত্রীর হিসেব-ঘরে কেরাণীর কাজ করত, সে বলেছিল কর্ত্রীর কাছে কাকার নামটা পাঠিয়ে দেবে, তাকে মনে রাখবে বলে কথা দিয়েছিল; চমৎকার মনে রাখা বটে!... পুপীর আমার চোখের সামনেই ভাইপোর কাছে হাঁটু গেড়েছিল।"

"তোমার পরিবার-পরিজন আছে? বিয়ে হয়েছে?"

"আজ্ঞে না, হুজুর, আমার বিয়ে হয়নি। তাতিয়ানা ভাসিলিয়েভ্না — ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন — তিনি কাউকে বিয়ে করার অনুমতি দিতেন

না। কখনো কখনো তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর বাঁচান! এই তো আমি বিয়ে করিনি, কী হ্যাংলামি! ওরা ভাবে কী?'"

"এখন তোমার জীবনধারণের উপায় কি? মজুরী পাও?"

"মজুরী হুজুর! ... আমাকে খোরাকি দেওয়া হয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি বেশ সন্তুষ্ট। ঈশ্বর আমাদের কর্ত্রীকে দীর্ঘ জীবন দিন!"

ইয়েরমলাই ফিরে এল।

সে জানাল, "নৌকো সারানো হয়েছে। এবার লগি নিয়ে এসো দেখি, — এই যে!"

সুচোক দৌড়ল লগি নিয়ে আসতে। আমি যতক্ষণ গরীব বেচারীর সঙ্গে কথা বলছিলাম ততক্ষণ শিকারী ভ্লাদিমির একটা অবজ্ঞার হাসি নিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে।

সে যখন চলে গেল ভ্লাদিমির বলল, "লোকটা বোকা; একেবারে অশিক্ষিত চাষা একটা, আর কিছু নয়। ওকে গৃহ-দাসও বলা চলে না; আর ও কিনা সারা সময়টা ধরে কেবল দেমাক দেখিয়ে গেল। কী করে সে অভিনেতা হতে পারে, আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন না? ওর সঙ্গে কথা কয়ে মিছিমিছি কষ্টই হল আপনার।"

পনের মিনিট পরে আমরা বসলাম গিয়ে সুচোকের শালতিতে। কুকুরগুলোকে রেখে গেলাম আমার সহিসের জিম্মায় একটা কুটিরে আটকে রেখে। খুব আরাম লাগছিল না আমাদের, কিন্তু শিকারীরা খুঁৎখুঁতে জাতের নয়। পেছনের দিকটা চেপটা আর সোজা, সেখানে দাঁড়িয়ে সুচোক লগি ঠেলে শালতি চালাতে লাগল; নৌকোর ওপর আড়াআড়ি করে বিছানো পাটাতনের ওপর ভ্লাদিমিরকে নিয়ে বসলাম আমি, আর ইয়েরমলাই সাবধানে বসল গিয়ে সামনে, একেবারে গলুই-এর ওপর। দড়ির বাঁধন সত্ত্বেও শীগ্গিরই আমাদের পায়ের তলায় জল দেখা দিল। ভাগ্যিস আবহাওয়া ছিল শান্ত, পুকুরটা যেন ঘুমুচ্ছিল।

বেশ একটু ধীরে ধীরেই আমরা ভেসে চললাম। ঘন এঁটেল কাদা থেকে লম্বা লগিটা টেনে তুলতে বুড়োর কষ্ট হচ্ছিল, লগিটা উঠল জোলো-ঘাসের সবুজ সুতোয় লতায় একেবারে জড়িয়ে, জল-পদ্মের চেপটা গোল পাতাগুলোও নৌকো চলতে বাধা দিচ্ছিল। শেষটায় আমরা গিয়ে পেঁছিলাম নল-খাগড়া

বনের কাছে, আর তখন শুরু হল মজা। পুকুর থেকে ঝটপট শব্দ করে হাঁসগুলো উঠল, ওদের রাজত্বে আমাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে ভয় পেয়ে গেছে; উড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেছনে গুলির আওয়াজ ফেটে পড়ল, ছোটো ল্যাজ শিকারগুলি শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে ঝপাৎ করে জলে পড়ছে, দেখতে চমৎকার লাগছিল। অবশ্য, যতগুলো গুলি করা হল ততগুলো হাঁসই আমরা পাইনি; অল্প আহত যেগুলো তারা সাঁতরে সরে পড়ল, মরা হাঁসগুলোর মধ্যেও কতকগুলি এমন ঘন শর-ঝোপের ভিতরে গিয়ে পড়ল যে, এমন কি ইয়েরমলাই-এর বনবিড়ালের মতো তীক্ষ্ম দৃষ্টিও তাদের আবিষ্কার করতে পারল না; তবু খাওয়ার সময় এলে দেখা গেল আমাদের নৌকো একেবারে শিকারে পুরো বোঝাই হয়ে গেছে।

ইয়েরমলাই ভারি খুশি, ভ্লাদিমির মোটেই ভালো করে বন্দুক চালাতে পারেনি, শিকার গুলিবিদ্ধ করতে না পেরে প্রত্যেকবার সে যেন অবাক হয়ে গিয়েছে, বন্দুকের দিকে তাকিয়েছে আর নলের মধ্যে ফুঁ দিয়েছে, যেন বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে, তারপর শেষে আমাদের বুঝিয়েছে তার ব্যর্থতার কারণ। ইয়েরমলাই কিন্তু বরাবরের মতোই সফলভাবে গুলি চালিয়েছে; আমি, আমার যা রীতি সে অনুযায়ী, খারাপই শিকার করেছি। সুচোক আমাদের দিকে দেখছিল এমন একজনের চোখ নিয়ে যে ছোটোবেলা থেকেই অন্য লোকের ভৃত্য, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ, ওই, ওই যে আর একটা ছোটো হাঁস"; আর অনবরত ও নিজের পিঠটা রগড়েছে, তা আবার হাত দিয়ে নয়, স্কন্ধাস্থি দিয়ে অদ্ভুত এক রকম করে নড়িয়ে নড়িয়ে রগড়েছে। আবহাওয়াটা চমৎকার: আঁকাবাঁকা শাদা মেঘ আমাদের মাথার ওপরে বহু উঁচুতে নীরবে উড়ে যাচ্ছিল, জলে তার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব, চারদিকে শরবনের ফিসফিসানি, এখানে ওখানে পুকুরটা সূর্যালোকে ঝকমক করছিল ইস্পাতের মতো। গ্রামে ফিরব বলে তৈরি হচ্ছি এমন সময় অকস্মাৎ একটা অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে গেল।

বহুক্ষণ থেকেই টের পাচ্ছিলাম যে ধীরে ধীরে আমাদের শালতি জলে ভরে উঠছে। ভ্লাদিমিরকে ভার দেওয়া হয়েছিল হাতা দিয়ে জল সেঁচে ফেলতে; আমার সতর্ক শিকারী একটা হাতা চুরি করে এনে তৈরি রেখেছিল; এক কৃষক মেয়ের জিনিস ওটা, সে যখন অন্যদিকে তাকিয়েছিল তখন ওটা চুরি করে। ভ্লাদিমির যতক্ষণ তার কাজে অবহেলা করেনি ততক্ষণ বেশ

ভালোই চলছিল। কিন্তু একেবারে শেষ সময়টায়, যেন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য, এমন ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস উঠল যে আমাদের বন্দুকে গুলি ভরারই প্রায় সময় থাকল না। শিকারের নেশায় আমাদের শালতির অবস্থার দিকে কোনো খেয়াল ছিল না — হঠাৎ ইয়েরমলাই একটা আহত হাঁস ধরতে গিয়ে নৌকোর একেবারে কিনারে গিয়ে সমস্ত দেহের ভারটা চাপিয়ে দিল; তার অতি-উৎসাহে আমাদের পুরানো কেঠোটা একদিকে হেলে পড়ল, সাঁ-সাঁ করে জল ঢুকতে লাগল তাতে, তারপর বেশ জমকাল ভঙ্গীতে সেটা একেবারে ডুবে গিয়ে মাটির তলা ছুঁয়ে ফেলল, কিন্তু ভাগ্য ভালো জায়গাটা তেমন গভীর নয়। আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, কিন্তু তখন আর সময় নেই; মুহূর্তের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম একেবারে গলা জলে, চারদিকে ভাসতে লাগল গুলি করে মারা হাঁসগুলি। আমার সঙ্গীদের তখনকার আতঙ্কিত শাদা হয়ে যাওয়া মুখের কথা মনে পড়লে আমি আজ না হেসে ফেলে পারি না (সেই মুহূর্তে আমার নিজের মুখখানাও বোধহয় খুব গোলাপী ছিল না), কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই সে সময় মজা পাবার কথাটা আমার মাথায়ই আসেনি। আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের বন্দুক তুলে ধরলাম মাথার ওপরে, সুচোকের অভ্যাস তার মনিবদের অনুকরণ করা — সে তাই তার লগিটা তুলল ঊর্ধ্বে। ইয়েরমলাই-ই প্রথম নীরবতা ভাঙ্গল।

জলে থুথু ফেলে ও বিড় বিড় করল, "জ্বালাতন! এবার হল তো!" তারপর রেগে সুচোকের দিকে ফিরে আবার বলল, "এ সবের জন্য দায়ী তুমি, বুড়ো শয়তান কোথাকার! এমন একটা নৌকো তোমার!"

বুড়ো তোৎলাতে-তোৎলাতে বলল, "সব আমারই দোষ।"

"হ্যাঁ," বলল আমার শিকারী; তারপর ভ্লাদিমিরের দিকে মাথা ঘুরিয়ে ফের বলল, "আর তুমি তো বড়ো চমৎকার লোক, কী ভাবছিলে? জল সেঁচে ফেলছিলে না কেন?"

কিন্তু ভ্লাদিমিরের তখন জবাব দেবার ক্ষমতা নেই: পাতার মতো থরথর করে কাঁপছে, দাঁতে দাঁতে লেগে খটখট করছে তার, ঠোঁটের হাসিটা একেবারে অর্থহীন। কী হল তার চমৎকার কথা বলার ভাষার, সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যের প্রতি দরদের, তার আত্মমর্যাদার!

লক্ষ্মীছাড়া শালতিটা আমাদের পায়ের নিচে মৃদুমন্দ দুলছিল। ঠিক

ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে জলটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছিল, কিন্তু শীগ্‌গিরই তা গা-সওয়া হয়ে গেল। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে আমি চতুর্দিকে তাকালাম, আমাদের থেকে হাত দশেক দূরে নল-খাগড়াগুলো মাথা উঁচিয়ে উঠেছে চক্রাকারে, ওগুলোর মাথার ওপর দিয়ে দূরে কূল দেখা যায়। মনে মনে ভাবলাম, "খারাপ লাগছে ব্যাপারটা।"

ইয়েরমলাইকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী করি এবার?"

সে বলল, "কি আর, চারদিক তাকিয়ে একটু দেখে নিতে হবে; এখানে তো আর রাত কাটানো যায় না।" ভ্‌লাদিমিরকে বলল, "এই যে, ওহে, নাও আমার বন্দুকটা ধরো।"

ভ্‌লাদিমির তার কথা শুনল একটিও কথা না বলে।

এরপর ইয়েরমলাই বলল, "আমি গিয়ে পার হবার জায়গাটা খুঁজে দেখি," যেন প্রত্যেক পুকুরে এরকম জায়গা একেবারে না থেকে কিছুতেই যায় না; সুচোকের কাছ থেকে লগিটা নিয়ে সে পারের দিকে চলল, যেতে যেতে সাবধানে জলের গভীরতা আন্দাজ করতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সাঁতার কাটতে জানো?"

খাগড়ার আড়াল থেকে তার জবাব এল কানে, "না, পারি না।"

"তাহলে ডুবে মরবে," নির্লিপ্ত মন্তব্য করল সুচোক। প্রথমটা সে একেবারে আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, আতঙ্কটা বিপদের জন্য নয়, আমাদের রাগ দেখে, কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত; মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস টেনে নিচ্ছে আর তার জায়গা থেকে নড়বার যেন কোনো প্রয়োজন বোধ করছে না।

ওর কথার সঙ্গে ভ্‌লাদিমির জুড়ে দিল করুণাভরে, "ও মরবে, কিন্তু কোনো লাভ হবে না।"

এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল ইয়েরমলাই ফিরছে না। সেই একটা ঘণ্টা আমাদের কাছে মনে হল যেন অনন্তকাল। গোড়াতে জোরে জোরে চীৎকার করে ডেকে তার সাড়া নিচ্ছিলাম; তারপর তার সাড়া অনেক কম পাওয়া যেতে লাগল; শেষটা আর কোনো সাড়া-শব্দ রইল না তার। গ্রামে সান্ধ্য-আরাধনার ঘণ্টা বাজতে লাগল। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা তেমন চলছে না; বস্তুত এ ওর দিকে না তাকাবার চেষ্টাই করছিলাম। হাঁসগুলো মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল; কতকগুলো যেন আমাদের কাছেই বাসা নিতে চায়, কিন্তু

হঠাৎ ওরা শূন্যে উড়ে গেল তারপর উড়ে চলে গেল দূরে প্যাঁক্‌ প্যাঁক্‌ করতে করতে। আমরা যেমন অসাড় হয়ে যেতে লাগলাম। সুচোক চোখ বুজল, যেন সে নিজেকে নিদ্রার কাছে সঁপে দিচ্ছে।

অবশেষে আমাদের অবর্ণনীয় আনন্দ সৃষ্টি করে ফিরে এল ইয়েরমলাই।

"কী হল?"

"তীরে গিয়েছিলাম, জায়গা পেয়েছি খুঁজে। চলুন এবার যাই।"

আমরা তৎক্ষণাৎ চলতে চাইছিলাম, কিন্তু সে প্রথমে জলের তলায় তার পকেট থেকে বার করল সুতো খানিকটা, নিহত হাঁসগুলোর পায়ে পায়ে বাঁধল তাই দিয়ে, দাঁত দিয়ে কামড়ে নিল দুটো দিক তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হল সামনের দিকে; তার পেছনে ভ্‌লাদিমির, আমি চললাম ভ্‌লাদিমিরের পেছনে, আর সব শেষে সুচোক। পাড় থেকে আর দু'শ পা বাকি। ইয়েরমলাই (এত ভালো করে পথ চিনে নিয়েছে সে) একটুও না থেমে গট গট করে হেঁটে চলল, মাঝে মাঝে কেবল আমাদের ডেকে বলতে লাগল, "আর একটু বাঁ দিক চেপে—এর ডান দিকে একটা গর্ত আছে!" কিংবা "ডান দিক চেপে আসুন, বাঁয়ে গেলে ডুবে যাবেন একেবারে..." কোথাও কোথাও জল একেবারে আমাদের গলা পর্যন্ত; দুবার সুচোকের মুখে জল ঢুকে গেল, সে জল নিয়ে বিড়বিড় করল, সে ছিল আমাদের চাইতে একটু বেঁটে। ইয়েরমলাই তাকে ডেকে রূঢ়ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, "এসো, এদিকে, এসো!" আর সুচোক লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে পেঁছিল অনেকটা চটান জায়গায়, কিন্তু একেবারে চূড়ান্ত মরীয়া অবস্থায়ও সে আমার কোটের অগ্রভাগটুকু আঁকড়ে ধরতে সাহস পায়নি। শেষ পর্যন্ত শ্রান্ত কান্ত অবস্থায় জলে ভিজে কাদা মেখে আমরা পারে এসে পেঁছিলাম।

দু'ঘণ্টা পরে, অবস্থা অনুযায়ী যতটা শুকিয়ে নিতে পারা যায় ততটা শুকনো হয়ে আমরা সবাই গিয়ে বসলাম বড়ো একটা খড়ের গাদায়, নৈশ-আহারের প্রতীক্ষা করছিলাম। সহিস ইয়েগুদিইল লোকটি অত্যন্ত স্থিরবুদ্ধি বিচক্ষণ, চলতে-ফিরতে ভারি মন্থর, খুব সতর্ক এবং নিদ্রালু, সে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে সুচোককে নস্যি দিচ্ছে (আমি লক্ষ্য করেছি, রাশিয়াতে

সাহিসেরা খুব তাড়াতাড়ি দোস্তি জমিয়ে ফেলে); সুচোক নস্যি নিচ্ছে অতি দ্রুত ব্যস্ততায়, নিচ্ছে এত বেশি পরিমাণে যে তাতে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা; নস্যি টেনে থুথু ফেলছে অনবরত, হাঁচছে এবং মনে হয় প্রচুর আমোদ উপভোগ করছে। ভ্লাদিমির ক্লান্তির ভাব মুখে এনেছে; মাথাটি একদিকে হেলানো, কথাবার্তা প্রায় বলছেই না। ইয়েরমলাই বন্দুক সাফ করছে। কুকুরগুলো বেশি বেশি করে ল্যাজ নাড়ছে পোরিজের আশায়; বাইরে ঘোড়ার পা-দাপানির শব্দ আর ডাক। ... সূর্য অস্ত গেছে, তার শেষ রশ্মি ভেঙে গিয়ে পরিণত হয়ে উঠেছে প্রশস্ত ধূমল রঙের স্তরে; আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে স্বর্ণমেঘ, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে মেঘখণ্ড বিস্তৃত হয়ে হয়ে গেছে, যেন ভেড়ার লোম ধুয়ে পেঁজা হয়েছে। ... গ্রামে গানের শব্দ শোনা গেল।

বেঝিন মাঠ

জুলাই মাসের উজ্জ্বল একটা দিন। একটানা সুন্দর আবহাওয়ার পরেই কেবল এমন এক একটা দিনের সাক্ষাৎ মেলে। ভোর থেকেই আকাশ পরিষ্কার, সূর্য উঠেছে কিন্তু আগুন ছড়াচ্ছে না। পূবের আকাশ কোমল একটা গোলাপী আভায় রঙীন। সূর্য আগুনের মতো নয়, অনাবৃষ্টির সময় দম আটকানোর মতো তপ্ত লাল টকটকে নয়, আবার ঝড়ের পূর্বের সেই মেটে তামাটেও নয়, লম্বা সরু এক চিলতে মেঘের আড়ালে থেকে উজ্জ্বল আর নম্র দ্যুতিময় সূর্য উঠছে শান্তিতে, মেঘের কোল থেকে তরুণ সূর্য ঝকঝক করে উঁঠছে, আবার লালচে-শাদা কুয়াশার মধ্যে ডুব দিচ্ছে। মেঘের উপরের অতি সূক্ষ্ম পাড়টুকুন, সাপের আঁকাবাঁকা বর্ণে বর্ণে তা ঝলমল করে উঠছে; রজতের মতো তার দীপ্তি। কিন্তু ঐ দেখো, নৃত্যময়ী রশ্মিমালা আবার ঝলমলিয়ে উঠেছে; গভীর একটি আনন্দে ঊর্ধ্বলোকে উড্ডীন হবার মতো উদিত হচ্ছে বিশাল একটি জ্যোতির্মণ্ডল। দুপুরের দিকে দেখা যায়, আকাশে দূর শূন্যে সুষমা মেঘের মেলা, সোনা মাখানো ধূসর তাদের বর্ণ, আর পাড়গুলোতে কোমল শুভ্রতা। কূলপ্লাবী নদী ইতস্তত ছড়ানো ছোটো ছোটো দ্বীপগুলিকে যেমন তার স্বচ্ছ ঘন সুনীল অখণ্ডতায় স্নান করিয়ে দেয়, এ মেঘখণ্ডগুলিও তেমনি দ্বীপের মতো, প্রায় একটুও নড়ে না; আরো দূরে আকাশের গায়ে নিচু দিকটায় মেঘ গতিময়, খণ্ড খণ্ড ঘন হয়ে জমে উঠছে; এই বার ওই মেঘগুলির মাঝখানে আর নীলের চিহ্ন নেই, কিন্তু মেঘগুলিই প্রায় আকাশের মতো নীল হয়ে গেছে, আলোকে উত্তাপে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। দিগন্তের লালচে-শাদা রঙটি বদলায় না সারাদিন, সমগ্র দিকবলয়

জুড়ে সেই একই রঙের সমারোহ; কোথাও ঝড় জমাট বেঁধে উঠছে না, ঝড়ে কালো হয়ে উঠছে না; কোথায় যেন কেবল আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে নীলাভ বর্ণের রশ্মিমালা, প্রায় বোঝা যায় না এমনি মৃদু বৃষ্টি সেটা। সন্ধ্যায় এ মেঘমালা অদৃশ্য হয়ে যায়, শেষ মেঘখণ্ডগুলি থাকে কালচে ধোঁয়ার মতো আকৃতিহীন হয়ে, তাতে ছিট ছিট পাটল রঙের দাগ ছড়ানো, অস্তরবির মুখোমুখি থাকে সে মেঘগুলি; ঠিক যে ভাবে উদয় হয়েছিল তেমনি শান্তভাবে সূর্য যেখানে অস্ত গেছে সেখানে অন্ধকার হয়ে-ওঠা পৃথিবীর উপরিতলে অল্পকাল লেগে থাকে একটি রক্তিম দীপ্তি, আর তারপর সাবধানে সঞ্চালিত মোমবাতির মতো ধীরে ধীরে সান্ধ্য আকাশে ঝকমক করে ওঠে তারাগুলি। এমনি দিনে সমস্ত বর্ণলেপ থাকে মৃদু, তা উজ্জ্বল কিন্তু চোখ ধাঁধানো নয়; সবকিছু যেন একটি কমনীয় মমতার স্পর্শে ছেয়ে থাকে। এমন দিনে মাঝে মাঝে গরম লাগে ভয়ানক; প্রায়ই মাঠ প্রান্তরের ঢালুতে এমন কি যেন "ধোঁয়া" উড়তে থাকে, কিন্তু এই জমাট হতে থাকা গুমোট উড়িয়ে নেয় হাওয়ায়, আর—স্থির, চমৎকার আবহাওয়ার নিশ্চিত সংকেত—সেই ধুলোর ঘূর্ণীপাক উঁচু শাদা স্তম্ভের আকারে রাস্তার ওপর দিয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। নির্মল শুকনো হাওয়ায় গন্ধ পাওয়া যায় সোমরাজের, কাটা রাই-এর আর বাকহুইটের; রাত্রি সমাগমের একঘণ্টা আগেও বাতাসে আর্দ্রতার লেশমাত্র থাকে না। গম কাটার জন্য এমনি আবহাওয়ারই প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষক...

এমনই একটি দিনে আমি একবার তুলা প্রদেশের চের্ণ জেলায় বনমোরগ শিকারে বেরিয়েছিলাম। বেশ কিছু শিকার করলাম; শিকারের ঝোলাটা ভর্তি হয়ে আমার কাঁধে একেবারে নির্মমভাবে কেটে বসেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে সায়াহ্নের দীপ্তিটুকু নিভে গেছে, প্রদোষের স্নিগ্ধ ছায়া ঘন হয়ে উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলতে শুরু করেছে, সে আকাশ তখনো উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে অস্তরবির রশ্মির আলোর আভা আর নেই, আমি তখন বাড়ি ফিরব ঠিক করলাম। দ্রুত পা চালিয়ে পার হয়ে এলাম ঝোপঝাপের "স্কোয়ার", হেঁটে উঠলাম একটা টিলার ওপরে, কিন্তু সেই পরিচিত সমতলভূমিটি কোথায় গেল, যার ডান পাশে সেই ওক বন আর দূরে সেই ছোটো শাদা গির্জাটি! সামনে দেখি সম্পূর্ণ পৃথক একটি দৃশ্য, সে দৃশ্য আমার অচেনা। আমার পদপ্রান্তে সরু একটি উপত্যকা

আর ঠিক আমার সামনে একটা পুরু প্রাচীরের মতো খাড়া উঠে গেছে আস্পেন গাছের একটি ঘন নিবিড় অরণ্য। স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম হতভম্ভ হয়ে, চারদিকে তাকালাম... ভাবলাম, "আহা! রাস্তা ভুল হয়ে গেছে কী করে, খুব বেশি ডান দিকে এসে গেছি;" ভুলের জন্য খানিকটা অবাক হলাম, তারপর তাড়াতাড়ি টিলা বেয়ে নামতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে অবাঞ্ছিত একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে ডুবে গেলাম, ঠিক যেন একটা চোরকুঠরীতে প্রবেশ করেছি: উপত্যকার তলদেশে উঁচু নিবিড় ঘাস বন শিশিরে ভিজে গেছে, দেখাচ্ছে শাদা, মসৃণ একখানি টেবিল-ক্লথের মতো: ওর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে কেমন ভয় লাগে। অন্য দিকটায় যাবার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালালাম, হাঁটতে লাগলাম আস্পেন বনের পাশ দিয়ে, চললাম বাঁ দিক ঘেঁসে। তন্দ্রামগ্ন তরুশীর্ষে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বাদুড়ের সঞ্চরণ, মুক্ত আকাশের অস্পষ্টতায় ওরা রহস্যজনকভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে ইতস্তত, কাঁপছে; একটি তরুণ বিলম্বিত বাজপাখি দ্রুতপক্ষে সোজা উড়ে গেল ঊর্ধ্বদিকে, কুলায় ফিরে গেল তাড়াতাড়ি। মনে মনে ভাবলুম, "এই যে, এই বার আমি এই কোণটিতে যাব, এখুনি পেয়ে যাব পথ; কিন্তু আমার রাস্তা ছেড়ে আধ মাইল দূরে সরে এসেছি!"

অবশেষে বনের প্রান্তে এসে পেঁছিলাম, কিন্তু সেখানে কোনো রকম পথ নেই, সম্মুখে দেখলাম লম্বা ঘাসে ঢেকে যাওয়া নিচু গোছের ঝোপ দূর বিস্তৃত হয়ে রয়েছে; তার পেছনে দূরে, অনেক দূরে অস্পষ্ট দেখা যায় পরিত্যক্ত ভূমির রেখা। আবার থামলাম। "আচ্ছা! কোথায় আমি?" সারাদিন কী ভাবে এবং কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছি ভাবতে লাগলাম মাথা ঘামিয়ে ... তারপর শেষকালে চেঁচিয়ে উঠলাম, "ওঃ হো! এতো সেই পারাখিনের ঝোপ-জঙ্গল। হ্যাঁ ঠিক! তাহলে এটা নিশ্চয় সিন্দেয়েভ বন। কিন্তু কী করে এলুম এখানে? এত দূরে? ... আশ্চর্য! এবার আমাকে আবার চলতে হবে ডান দিক ঘেঁসে।"

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়েই ডান দিকে চললাম। ততক্ষণে রাত্রি হয়ে এসেছে, ঝড়ের মেঘের মতো জমাট হয়ে উঠেছে; মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যার সেই কুয়াশার সঙ্গে অন্ধকার চারদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, ওপর থেকে ঝরে পড়ছে। একটা ছোটো অব্যবহৃত জংলা পথের মতো জায়গায় এসে পড়লাম; সে পথ দিয়েই হেঁটে চললাম সামনে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে। অনতিবিলম্বে আমার

চতুর্দিকে ঘিরে উঠল ঘন কালো আর নিবিড় নীরবতা — কেবল থেকে থেকে ভারুই পাখির ডাক শোনা যেতে লাগল। ছোটো একটি কী রাত-পাখি নরম পাখায় ভর করে নিঃশব্দে মাটির কাছ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে প্রায় আমার গায়ে এসে আছড়ে পড়ল, তারপর ভয় পেয়ে ঝট্‌পট্‌ করে উড়ে চলে গেল। ঝোপঝাড়ের আরো খানিকটা দূরে এসে পড়লাম তারপর পা চালালাম বেড়ার পাশ দিয়ে মাঠ বরাবর। এতক্ষণে দূরের জিনিস প্রায় দেখাই যায় না, চারিপাশে মাঠখানাকে দেখাচ্ছে অস্পষ্ট শাদা, আর তা ছাড়িয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে বিরস অন্ধকার, মনে হয় তা প্রতি মুহূর্তে বিশাল স্তরে স্তরে সামনে ঘন হয়ে এগিয়ে আসছে। হাওয়া ধীরে শীতল, আরো শীতল হয়ে উঠছে, সেই শীতল বাতাসে আমার পদশব্দে কেমন একটা চাপা শব্দ হচ্ছে। ফ্যাকাশে আকাশটা আবার নীল হয়ে উঠতে লাগল — কিন্তু সেটা রাত্রির নীল রঙ। ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি নীল আকাশে ঝকমক করছে, টিপ টিপ করছে।

যাকে বন মনে করছিলাম আসলে তা দেখলাম কালো গোল একটি টিলা। "কিন্তু কোথায় তাহলে আমি?" বলে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, এই তিন বারের মতো স্থির হয়ে দাঁড়ালাম, তাকালাম জায়গাটার দিকে অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে, প্রশ্নভরা চোখ নিয়ে তাকালাম ফুট ফুট দাগওয়ালা হলদে ইংরেজী কুকুরটার দিকে যার নাম দিয়াঙ্কা, চতুস্পদ প্রাণীর মধ্যে সব থেকে যে বুদ্ধিমান। কিন্তু সব থেকে বুদ্ধিমান চতুস্পদটি কেবল ল্যাজটা নাড়ল, নিরুৎসাহে ক্লান্ত চোখ দুটি পিট পিট করল, আমাকে কোনো কান্ডজ্ঞান-সম্পন্ন উপদেশ দিল না। ওর চোখে ছোটো হয়ে গিয়েছি মনে হল, মরীয়া হয়ে সামনের দিকে চলতে লাগলাম, যেন হঠাৎ ঠিক পথ ঠাহর করে নিতে পেরেছি, টিলা টপকে এসে দেখলুম একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়েছি, জায়গাটা গভীর বেশি নয়, চার দিকে চষা। অদ্ভুত একটি শিহরণ জাগল আমার। ফাঁকা জায়গাটার আকৃতি অবিকল কটাহের মতো, পাশগুলো ঢালু হয়ে নেমেছে; তলদেশে বড়ো বড়ো শাদা একরকম পাথর সোজা খাড়া হয়ে রয়েছে — মনে হচ্ছে ওরা যেন একটা গোপন পরামর্শ-সভার জন্য গুঁড়ি মেরে এসেছে ওখানে — আর কী নৈঃশব্দ আর অন্ধকার, ওর ওপরে উদ্যত আকাশটাকে মনে হচ্ছে এমন চিতানো এবং মূক মৌন, এমন ভয়ঙ্কর এবং অনৈসর্গিক যে আমার বুকটা দমে গেল। কী একটা ক্ষুদ্র প্রাণী পাথরগুলোর মধ্যে মৃদু এবং করুণভাবে ঘ্যান ঘ্যান করল।

তাড়াতাড়ি আবার টিলার উপরে উঠে আসতে চেষ্টা করলুম। তখন পর্যন্ত বাড়ি ফেরার পথ পাবার সব আশা ত্যাগ করিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তে একেবারে শেষ বারের মতো স্থির করে বসলাম যে না, হারিয়েই গেছি আমি, তখন চারিদিক অন্ধকারে ডুবে গেছে, আশপাশের কোনো কিছু দেখে বুঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমি হাঁটলুম সোজা সামনে, দিকবিদিক খেয়াল না রেখে, শুধু তারার আলোর সাহায্যে... প্রায় আধ ঘণ্টা চললুম এই ভাবে, যদিও এক পায়ের সামনে আর এক পা এগিয়ে দিতে পারছিলাম না প্রায়। মনে হল জীবনে কখনো এমন শূন্য পরিত্যক্ত জায়গায় আর আসিনি; কোথাও আগুনের একটি আভা চোখে পড়ে না, কোথাও শোনা যায় না একটি শব্দ। একটির পর একটি ঢালু পাহাড়গাত্র, মাঠের পর মাঠের বিস্তার অন্তহীন; ঝোপঝাড়গুলো যেন আমার নাকের ডগার সামনে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। হাঁটছি তো হাঁটছিই, ভাবছি সকাল না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকব কোথাও, সহসা দেখি ভয়ঙ্কর একটা ভৃগুদেশের একেবারে কিনারে এসে পড়েছি।

পা তুলেছিলাম, তাড়াতাড়ি পেছিয়ে নিলাম, চারদিকে ঘোর অন্ধকার, তারই মধ্যে দিয়ে দেখলাম বহু নিচে বিস্তৃত একটি বিরাট সমতলভূমি। তাকে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে বয়ে যাচ্ছে একটি চওড়া নদী, সেটি আমার দিক থেকে দূরে বেঁকে গেছে; জলের স্বচ্ছ কালো প্রতিফলন তখনো আবছাভাবে এখানে ওখানে চকচকিয়ে উঠছে, ওই দেখে নদীর গতিপথ বুঝতে পারা যেত। যে পাহাড়টির উপর আমি রয়েছি সেটি আচমকা এসে শেষ হয়েছে প্রায় খাড়া ঝুলে-পড়া একটি ভৃগুদেশে, তার বিশাল আকৃতি-রেখাটি আকাশের গাঢ় নীল শূন্যের পটভূমিকায় কালো হয়ে উঠেছে, ঠিক আমার নিচু দিয়ে কালো নিথর আর্শীর মতো নদীটি কাছের সমতলভূমি এবং ভৃগুদেশের মাঝখানে একটি যে কোণ তৈরি হয়েছে সেখানে, পাহাড়ের রক্ষিত আশ্রয়স্থলের নিচে পাশাপাশি দুটো আগুন থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে আর রক্তশিখা লকলক করে উঠছে। আগুনের চারদিকে নড়াচড়া করছে লোকজন, তাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে, কাঁপছে, আর কখনো কখনো ছোটো একটি কোঁকড়া চুলভর্তি মাথার সামনের দিকটা আগুনের আভায় আলোকিত হয়ে উঠছে।

অবশেষে বুঝতে পারলুম কোথায় এসে পড়েছি। এই সমতলভূমিটি আমাদের অঞ্চলে বেঝিন মাঠ নামে সুপরিচিত... কিন্তু বাড়ি ফেরার কোনো

সম্ভাবনাই নেই, বিশেষ করে রাত্রিবেলা; ক্লান্তিতে পা দুটো ভেঙে আসছে। ঠিক করলাম নিচে নেমে যাব আগুনের কাছে, তারপর ওই লোকগুলোর সাহচর্যে প্রতীক্ষা করব প্রত্যুষের, লোকগুলিকে আমি ঘোড়া বেচা রাখাল বলে আন্দাজ করে নিলাম। নামলুম বিনা বিঘ্নে, কিন্তু হাত দিয়ে আঁকড়ে থাকা শেষ শাখাটি ছেড়ে দিতে না দিতে হঠাৎ দুটো বড়ো লোমশ শাদা কুত্তা ক্রুদ্ধ চীৎকার করতে করতে আমার দিকে ছুটে এল। আগুনের কাছ থেকে বালক কণ্ঠের মুখর স্বর শোনা গেল; দু'তিনটি ছেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মাটি থেকে। তাদের প্রশ্নভরা চীৎকারের জবাবে আমি জানান দিলুম চেঁচিয়ে। ওরা দৌড়ে এল আমার কাছে, কুকুর দুটোকে ডেকে সরিয়ে নিল তৎক্ষণাৎ, কুত্তা দুটো বিশেষ করে অবাক হয়ে গেল আমার দিয়াঙ্কাকে দেখে। আমি নেমে এলুম ওদের কাছে।

আগুন ঘিরে বসে থাকা ওদের রাখাল মনে করে ভুল করেছিলাম। ওরা পাশের গ্রামের কৃষক ছেলে কয়েকটি মাত্র, এক পাল ঘোড়ার ভার পড়েছে ওদের ওপর। তপ্ত গ্রীষ্মের রাত্রিতে ঘোড়া নিয়ে এসে মাঠে চরায় ওরা: দিনের বেলা মাছি আর মশা একদণ্ড শান্তি দেয় না; সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ার পাল বার করে নিয়ে আসে আর সকালে ফিরিয়ে নিয়ে যায় — চাষী ছেলেদের এ একটা মহা স্ফূর্তির ব্যাপার। খালি মাথায়, ভেড়ার লোমের পুরানো কোট গায়ে দিয়ে তারা তেজী টাট্টু ঘোড়ায় চেপে ইতস্তত ছুটে বেড়ায় এবং খুশির চীৎকারে, হুট হুট শব্দে, আর হাসিতে মেতে উঠে হাত-পাগুলো ঘোরাতে থাকে আর লাফিয়ে ওঠে শূন্যে। পাতলা ধুলো উড়ে যায় হলুদ মেঘের মতো, পথ ধরে ধূলিস্তর এগিয়ে চলে; দূরে একতালে শব্দ প্রতিশব্দ হয় ঘোড়ার খুরের; ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে ছুটে চলে; সবার সামনে বেগে লাফায় একটা বাদামী লোমশ ঘোড়া, ল্যাজটা তার খাড়া আর ল্যাজের জটিল কেশরে কাঁটা গাছ লাগানো, যত চলে তত তার গতি বদলায়।

ছেলেদের বললুম আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। তারা আমাকে একটু জায়গা করে দিল, আমি বসে পড়লুম তাদের সঙ্গে। আমি কোত্থেকে আসছি জিজ্ঞেস করল ওরা, তারপর চুপ করে রইল একটুক্ষণ। আবার আমরা একটু কথাবার্তা বললুম এরপর। আমি শুয়ে পড়লুম একটি ঝোপের নিচে, ঝোপটির নতুন পাতা অঙ্কুর সব ছেঁটে ফেলা হয়েছে, শুয়ে পড়ে চারদিকে

তাকাতে লাগলুম। চমৎকার একটি দৃশ্য: আগুন ঘিরে আলোর একটি রক্তিম বেষ্টনী নাচছে আর মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারের পটভূমিকার আলিঙ্গনে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে; মাঝে মাঝে শিখা জ্বলে উঠছে, আর এই বেষ্টনীটির পরিধি ছাড়িয়ে ঝলকে ঝলকে আলোর রশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছে, আলোর একটি সরু লকলকে জিহ্বা শুকনো ডাল লেহন করে নিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে নিভে যাচ্ছে: মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য দেখা দিচ্ছে দীর্ঘ সরু ছায়া, একেবারে আগুন পর্যন্ত গিয়ে নাচছে ছায়াগুলি; আলোর সঙ্গে লড়াই চলছে অন্ধকারের। কখনো, আগুনের তেজ যখন নিচু, আলোর বেষ্টনীটি যখন সংকুচিত, হঠাৎ তখন ক্রম অগ্রসরমান অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে একটি ঘোড়ার মাথা, পাটল বর্ণের ঘোড়াটা, ডোরাকাটা, কিংবা পুরো শাদা, শূন্য নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঘোড়াটা তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, তারপর পরমুহূর্তেই মাথাটা সরিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কেবল ওর ঘাস চিবোনোর শব্দ আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শোনা যায়। আলোর বেষ্টনীর মধ্য থেকে বোঝা শক্ত কী হচ্ছে অন্ধকারে; হাতের কাছের প্রত্যেকটি জিনিস যেন প্রায় নিকষ কালো যবনিকায় মুছে গেছে মনে হয়; কিন্তু আরো দূরে অস্পষ্ট দেখা যায় দিগন্তে দীর্ঘ অস্বচ্ছ ছায়ার মতো পাহাড় আর বন।

মেঘশূন্য কালো আকাশটা কল্পনাতীত বিশাল, আমাদের মাথার উপর তার সমস্ত রহস্যমাখা মহিমায় গৌরবে স্থির হয়ে আছে। হৃদয়ে অনুভব করা যায় একটি মিঠা যন্ত্রণা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে পাওয়া যায় সেই বিচিত্র, অভিভূত করা, তাজা সৌরভটি — রাশিয়ার গ্রীষ্ম রাত্রির সৌরভ। একটিও শব্দ প্রায় শোনা যায় না চারদিকে। কেবল কখনো কখনো কাছের নদীতে বড়ো মাছ লাফিয়ে ওঠার আওয়াজ আর ক্ষুদ্র তরঙ্গ স্পর্শে সঞ্চালিত নদীতটের শেকড় নড়ে উঠবার আবছা শব্দ কানে আসে। আগুনের মধ্যে কেবল মৃদু একটি চড় চড় শব্দ লেগে থাকে।

ছেলেগুলি আগুন ঘিরে বসে আছে; সেখানে বসে রয়েছে কুকুর দুটোও, যারা আমাকে গিলে খাবার জন্য অমন ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওরা আমার উপস্থিতি মেনে নিতে পারছিল না, তন্দ্রায় জড়ানো পিটপিটে চোখে তাকাচ্ছিল আগুনের দিকে, আর মাঝে মাঝে আপন মর্যাদার একটি অনভ্যস্ত অনুভূতি নিয়ে গর গর করে উঠছিল; প্রথমে গর গর করল, তারপর

কেঁউ কেঁউ করে কোঁকাল একটু, যেন ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব দেখে আক্ষেপ করছে। ছেলে ছিল সবশুদ্ধ পাঁচটি: ফেদিয়া, পাভলুশা, ইলিউশা, কোস্তিয়া আর ভানিয়া। (ওদের কথাবার্তা থেকে নামগুলো জেনেছি, এবার ওদের পরিচিত করিয়ে দিতে চাই পাঠকের কাছে।)

সব থেকে বড়োটি ফেদিয়া, ওর বয়েস চৌদ্দ বছর বলে মনে হবে। বেশ সুগঠিত দেহ. নাক মুখ চোখ ক্ষুদ্র, নম্র, সুদর্শন, কোঁকড়া হালকা রঙের চুল, উজ্জ্বল দৃষ্টি চোখের, আর সব সময় মুখে তার লেগে আছে একটি অর্ধ প্রফুল্ল, অর্ধ অসতর্ক হাসি। দেখে শুনে মনে হয় সে সম্পন্ন পরিবারের ছেলে, মাঠে এসেছে প্রয়োজনের তাগিদে নয়, মজা করার জন্য। গায়ে তার ঝকঝকে ছাপা সুতী শার্ট, তার চারদিকে হলুদ রঙের বেড় দেওয়া; গলায় ঝোলানো হ্রস্ব নতুন ওভারকোট ছোটো কাঁধটি থেকে প্রায় গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল; নীল বেল্টে গোঁজা রয়েছে একটি চিরুণী। বুটজুতো দুটো পায়ে একটু উপরেই উঠেছে, কিন্তু জুতো নিশ্চয় তারই — তার বাবার নয়। দ্বিতীয় ছেলেটি পাভলুশা, চুলগুলো এলোমেলো কালো, চোখ ধূসর কটা, চোয়াল প্রশস্ত, মুখখানা ফ্যাকাশে, তাতে বসন্তের দাগ, বড়ো কিন্তু সুসমঞ্জস মুখ, সব মিলিয়ে তার মাথাটি বড়ো — যাকে বলা হয় "মদের পিপের মতো মাথা" -- আর আকৃতি তার চৌকো এবং কি রকম যেন আনাড়ির মতন। ও ছেলেটি সুদর্শন নয় -- সে কথা অস্বীকার করা যায় না! — কিন্তু তবু ওকে আমার ভালো লাগল; ওকে দেখে মনে হয় বেশ কান্ডজ্ঞান-সম্পন্ন সরল অকপট প্রকৃতির ছেলে, তার গলার স্বরে বেশ সতেজ সুর আছে। সাজপোষাকে গর্ব করার তার ছিল না কিছু; গায়ে সামান্য একটি বাড়িতে তৈরি কাপড়ের শার্ট আর পরনে তালি-দেওয়া পাৎলুন। তৃতীয়টি ইলিউশা, তার মুখমন্ডলে আকর্ষণের তেমন কিছু বিশেষ নেই; লম্বা মুখখানা, পিটপিটে চোখ, আর নাকটা বাঁকা: সব কিছুর মধ্যে একটা নিরানন্দ, খুঁতখুঁতে অস্বস্তি; চেপে-আঁটা ঠোঁট দুটিকে শক্ত অনড় বলে মনে হয়; ভ্রূ জোড়া কুঁচকেই আছে, কখনো সোজা হয় না; আগুনের আলোয় যেন সে অনবরত মিট মিট করছে মনে হয়। তার শণের মতো — প্রায় শাদা — চুলগুলি নিচু ফেল্টের টুপির তলা দিয়ে ঝুলে পড়েছে সরু সরু আঁটি হয়ে, আর টুপিটা সে দু'হাত দিয়ে টেনে নামাচ্ছে কানের উপর। পায়ে তার নতুন বাস্ট জুতো আর পাদবস্ত্র; একটি

মোটা দড়ি গায়ের সঙ্গে তিন পাক জড়িয়ে রয়েছে, তাতে বাঁধা তার পরিচ্ছন্ন, কালো কুর্তি। তাকে কিংবা পাভলুশাকে দেখলে বারো বছরের বেশি বলে মনে হয় না। চতুর্থটি কোস্তিয়া, দশ বছরের ছেলেটি ভাব গম্ভীর বিষণ্ন দৃষ্টিতে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। সারা মুখখানা তার ছোটো, পাতলা, দাগে ভরা, থুৎনির কাছটিতে সরু চলো কাঠবিড়ালীর মতো; ঠোঁট প্রায় দেখাই যায় না; কিন্তু তার বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটি আর তার তরল দীপ্তিময়ী দৃষ্টি অদ্ভুত একটি রেখাপাত করে: মনে হয় সে চোখ এবং তার দৃষ্টি এমন কিছু একটা ব্যক্ত করতে চাইছে মুখে — অন্তত তার মুখে — যার কোনো ভাষা নেই। আকৃতি তার ক্ষুদ্র এবং সে দুর্বল, সাজপোষাক অকিঞ্চিৎকর। বাকি ছেলেটি, ভানিয়াকে, আমি লক্ষ্য করিনি প্রথমটা; সে মাটিতে একটি চৌকোণা মাদুরের তলায় শান্তিতে শুয়েছিল, কেবল মাঝে মাঝে বার করছিল বাদামী কোঁকড়া চুলভর্তি মাথাটি, এই ছেলেটির বয়স খুব বেশি হলে সাত বছর।

এমনি করে ঝোপের নিচে একপাশে আমি শুয়ে তাকিয়ে রইলাম ছেলেদের দিকে। আগুনের একটি কুণ্ডের ওপর ঝুলছে ছোটো একটি পাত্র; ওতে আলু রান্না হচ্ছে। ওটা দেখাশুনা করছে পাভলুশা, আর মাঝে মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে ফুটন্ত জলে এক টুকরো কাঠ ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে হল কিনা। ফেদিয়া কনুইয়ে ভর করে শুয়ে পড়ে, তার কোটের ধারগুলো ছড়িয়ে আছে। ইলিউশা বসে আছে কোস্তিয়ার পাশে, তখনো কেমন যেন বাধ্য হয়ে চোখ পিট পিট করে চলেছে। কোস্তিয়ার মাথাটি নিরাশ হয়ে ঝুঁকে পড়েছে, সে তাকিয়ে রয়েছে সুদূরের পানে। ভানিয়া মাদুরের তলায় নড়ছে না একটুও। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলুম। ধীরে ধীরে ছেলেরা আবার শুরু করল কথাবার্তা।

প্রথমে তারা এটা ওটা নিয়ে, কালকের কাজ, কিংবা ঘোড়াগুলোর বিষয়ে গালগল্প করে চলল; কিন্তু হঠাৎ ফেদিয়া ফিরল ইলিউশার দিকে, যেন পুরানো কথার জের টেনে তাকে জিজ্ঞেস করল:

"বল্ এবার, পিশাচটাকে দেখেছিস তুই?"

ইলিউশা জবাব দেয় দুর্বল ভাঙা গলায়, "না, আমি দেখিনি, কেউ দেখতে পায় না তাকে," তার গলার স্বরের সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তির অদ্ভুত মিল দেখা গেল; বলল, "আমি তার শব্দ শুনেছি। হ্যাঁ, আর আমি শুধু একলা নয়।"

পাভলুশা প্রশ্ন করল, "কোথায় থাকে সে — তোদের বাড়িতে?"

"পুরানো কাগজ-কলে।"

"বা, তুই কি ফ্যাকটরীতে যাস নাকি?"

"যাই বৈকি। আমার ভাই আভদিউশকা আর আমি যাই, আমরা কাগজ মসৃণ করার কাজ করি।"

"তাই নাকি? — ফ্যাক্টরী মজুর!"

ফেদিয়া প্রশ্ন করল, "বেশ, তারপর শব্দ শুনলি কি করে তার?"

"বলছি শোনো। ব্যাপার হল এই যে, আমি আর আমার ভাই আভদিউশকা, আর ফিওদর মিখেয়েভস্কি আর চোখ-ট্যারা ইভাশকা, আর লাল পাহাড়ের সেই আর এক ইভাশকা, আর ইভাশকা সুখরুকভও — আরো আরো ছেলেরাও ছিল সঙ্গে — সবশুদ্ধ আমরা ছিলুম দশজন — মানে পুরো শিফট্টা আর কি — ব্যাপার হল এই যে, আমরা রাত কাটালুম কাগজ-কলে; মানে, এমনি এমনি কাটাইনি, ওভারসিয়ার নাজারভ আমাদের আটকে রেখেছিল। বলল, 'ওহে ছেলেরা, বাড়ি গিয়ে সময় নষ্ট করবে কেন; কালকে কাজ আছে অনেক, কাজেই যেয়ো না বাড়ি, ওহে ছেলেরা।' কাজেই থেকে গেলুম আমরা, সবাই একসঙ্গে শুয়ে পড়লুম, তারপর আভদিউশকা শুরু করল বলতে, 'আচ্ছা, এখন যদি পিশাচ আসে?' বলা তার শেষ হবার আগেই কে যেন আমাদের মাথার ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল; আমরা নিচে শুয়েছিলাম, আর সে হাঁটতে লাগল আমাদের ওপরতলায়, যেখানে চাকা আছে। আমরা শুনলাম কান পেতে; সে হেঁটে চলল; পাটাতন এমন ক্যাঁচ্কোচ করছে, মনে হয় তার ভারে দুমড়ে যাচ্ছে, তারপর আমাদের মাথার ওপর দিয়েই সে এল অন্য দিকটায়; হঠাৎ চাকার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল; চাকাটা ঘড় ঘড় করেই চলল আর আবার আরম্ভ করল ঘুরতে, যদিও ওপরকার জলের নলের স্লুইসগুলো নামিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। আমরা অবাক হয়ে ভাবলাম কে তুলল ওগুলো, যাতে জল গড়িয়ে যেতে পারে; যাই হোক, চাকাটা কিন্তু আর একটু একটু ঘুরল, তারপর থেমে গেল। তখন সে গেল ওপরের দরজার কাছে, নিচে নেমে আসতে লাগল, নিচে নেমে এল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি না করে; সিঁড়িগুলিও যেন তার ভারে গুঙরে উঠল ... যাই হোক, সে এল তো এক্কেবারে আমাদের দোরের কাছে, তারপর অপেক্ষা করল, অপেক্ষাই

করল ... তারপর হঠাৎ দোরটা একেবারে সাঁ করে খুলে গেল কেবল। আমরা ভয় পেয়ে গেছি, তাকালাম ওদিকে — না কিছু নেই। হঠাৎ একটি বড়ো ভাণ্ডের উপরকার জাল নড়তে লাগল; ওটা উঠল ওখান থেকে, শূন্যে উঠতে লাগল, ডুবতে লাগল, চলতে লাগল, যেন ওটার সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে কেউ, তারপর আবার জায়গামতো গিয়ে স্থির হয়ে রইল ওটা। তারপর আর একটি ভাণ্ড, পেরেক থেকে একটা আঙটা খুলে এল, একটু পরে আবার গিয়ে আটকে রইল পেরেকে; তারপর মনে হল কে যেন এসেছে দরজায় আর ভেড়ার মতো কেশে সে হেঁচকি খেল, কিন্তু এত জোরে!... আমরা তো একেবারে দলা প্যাকিয়ে এ ওর গায়ে গায়ে লেগে রইলাম। ওঃ, কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম সে রাত্রে!"

পাভলুশা বিড় বিড় করে বলল, "আচ্ছা! সে কাশল কেন?"

"তা আমি জানি না; সম্ভবত ঠাণ্ডার জন্য।"

সবাই চুপ করে রইল একটুক্ষণ।

ফেদিয়া শুধাল, "কী, আলু সেদ্ধ হয়েছে?"

পাভলুশা দেখল পরীক্ষা করে।

"না, এখনো কাঁচা আছে ..." তারপর বলল নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে, "বাপ, কী ঝপাৎ শব্দ। নিশ্চয় একটা বড়ো মাছ ... ওই দেখ একটা তারা পড়ছে খসে।"

কোস্তিয়া বলল সরু তীক্ষ্ন গলায়, "শোন্, আমি তোদের বলতে পারি একটা কথা, শোন্ আমার বাবা সেদিন কী বলেছিলেন।"

ফেদিয়া একটু মাতব্বরির ঢং-এ বলল, "বল্, আমরা শুনছি।"

"গাভ্রিলাকে জানিস বোধহয়, সেই যে বড়ো গ্রামের ছুতোর গাভ্রিলা।"

"হ্যাঁ, জানি।"

"কিন্তু জানিস কেন সে সব সময় বিষণ্ন, কখনো কথা বলে না কেন? জানিস? কেন এমন বিষণ্ন সে, বলছি শোন্; একদিন, বাবা বলেছেন, বুঝলি, একদিন ও বনে গেছল বাদাম কুড়োতে। বনে বাদাম কুড়োতে কুড়োতে পথ হারিয়ে ফেলল; কিন্তু চলতেই লাগল — ঈশ্বরই জানেন যাচ্ছে কোথায়। কেবল চললই, চললই, বুঝলি — কিন্তু কোনো লাভ হল না! — পথ ও খুঁজে পেল না; সেই বাইরে থাকতে থাকতেই রাত্রি এসে পড়ল। ও তখন

বসে পড়ল একটি গাছের তলায়। ভাবল, 'সকালবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। এমনি করে ঘুমিয়ে পড়ছে যখন হঠাৎ তখন শুনল কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। চোখ খুলে তাকাল ও; না, কেউ নয়। আবার ঘুমিয়ে পড়ল, আবার সেই ডাক! বার বার ও তাকিয়ে দেখল; এবার সামনে দেখে গাছের শাখায় বসে বসে দুলছে এক মৎস্যকন্যা, ওকে ডাকছে কাছে আর হেসে আকুল হয়ে যাচ্ছে; সে কী তার হাসি!... চাঁদের আলো ফুটফুট করছিল, এমন পরিষ্কার, স্বচ্ছ ফুটফুটে জ্যোৎস্না — সর্বকিছু স্পষ্ট দেখা যায়, বুঝলি। ওকে ডাকল, আর শাখায় বসা তাকেও দেখা যাচ্ছিল বাটা মাছের মতো, নয়ত শৈল মাছের মতো কিংবা ছোটো মিঠা-জলের মাছের মতো, চকচকে আর শাদা, এমন শাদা আর চকচকে... ছুতোর গাভ্রিলা, বুঝলি কিনা, প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে না থেমে হেসেই চলল, আর ওকে এমনি করে কাছে ডাকতে লাগল। তখন গ্রাভ্রিলা উঠে সেই মৎস্যকন্যার কাছে যেতে মনস্থ করছিল, কিন্তু — নিশ্চয়ই ঈশ্বর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন — ও নিজের বুকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকল... আর সে ক্রুশ আঁকা কী যে শক্ত হয়েছিল তার পক্ষে, ভাই; ও বলেছে, 'হাতটা আমার যেন একেবারে পাথর একখানা; যেন নড়বে না।' উঃ, কী সাংঘাতিক ডাইনী!... তারপর বুঝলি, ও যখন ক্রুশ আঁকল তখন সেই মৎস্যকন্যা, ভাই, সে হাসি বন্ধ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কি কান্না তার!... সে কাঁদে, বুঝলি, আর চুল দিয়ে চোখের জল মোছে, তার সেই চুল ছিল ভাঙের মতো সবুজ। গাভ্রিলা তখন তার দিকে বার বার দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে, শেষে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। 'তুমি কাঁদছ কেন, বনের অপদেবী?' মৎস্যকন্যা তখন তাকে বলতে লাগল এই রকম: 'যদি নিজের বুকে তুমি ক্রুশ চিহ্ন না দিতে, তাহলে সারা জীবন ধরে তুমি আমার সঙ্গে বাস করতে পারতে মনের আনন্দে; আমি কাঁদছি, কারণ তুমি ক্রুশ এঁকেছ বলে আমি মর্মাহত হয়েছি; কিন্তু দুঃখু আমার একলারই হবে না; তুমিও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দুঃখু করবে।' এই বলেই না ভাই, সে তো গেল অদৃশ্য হয়ে, আর গাভ্রিলারও সঙ্গে সঙ্গে বন থেকে বেরুবার পথ স্পষ্ট মনে পড়ল... তারপর থেকেই সে সর্বদা বিষণ্ণ, যেমনটি তোরা দেখিস।"

অল্প একটু নীরব থেকে ফেদিয়া বলল, "উঃ! কিন্তু বনের অপদেবী

একটা ক্রিশ্চানের মনকে নষ্ট করে দেয় কী করে— সে তো তার কথা শোনেনি?"

কোস্তিয়া বলল, "অবাক, তাই না? গাব্রিলা বলেছে তার গলার স্বর ছিল ঠিক কোলাব্যাঙের মতো তীক্ষ্ন আর নালিশে ভরা।"

ফেদিয়া বলল, "তোর বাবা নিজে এ কথা বলেছেন?"

"হ্যাঁ। আমি স্টোভের তক্তায় শুয়েছিলাম, সব কথা আমি শুনেছি।"

"অদ্ভুত কান্ড। অমন বিষণ্ণ সে হবে কেন?... বোধহয় কন্যা তাকে পছন্দ করেছিল, নইলে ডাকবে কেন।"

ইলিউশা বলে উঠল, "হ্যাঁ, পছন্দ করেছিল! বটেই তো! সে তাকে কাতুকুতু দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তা-ই ছিল তার ইচ্ছে। এই সব কন্যারা তাই করে থাকে।"

ফেদিয়া মন্তব্য করল, "এখানেও মৎস্যকন্যারা হয়ত আছে আমার মনে হয়।"

কোস্তিয়া বলল জবাবে, "না। এ জায়গাটা খোলামেলা পরিচ্ছন্ন। অবশ্য একটা জিনিস -- নদীটা কাছে।"

সবাই চুপ। অকস্মাৎ দূর থেকে ভেসে এল একটা দীর্ঘ, প্রতিধ্বনিত, প্রায় বিলাপের ধ্বনি; রাত্রির সেই অবর্ণনীয় শব্দের একটি, যা গভীর নিঃশব্দের উপর সহসা ভেঙে পড়ে, ঊর্ধ্ব আকাশে ছড়িয়ে যায়, লেগে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর শেষে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। আপনি কান পেতে শোনেন: মনে হয় কোথাও কিছু নেই, তবু তখনো তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেন ঠিক দিগন্তে একজন কেউ টেনে টেনে কেঁদে উঠেছে, যেন আর একজন তার জবাবে বনের মধ্যে তীক্ষ্ন কর্কশ স্বরে হেসে উঠেছে খল খল করে, আর তারপর একটি যেন মৃদু অথচ ভাঙ্গা গলার হিস্-হিসানি নদীর ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে। ছেলেরা শিউরে উঠে তাকাল এদিক ওদিক...

ফিস ফিস করে ইলিউশা বলল, "যীশু আমাদের রক্ষা করুন!"

পাভলুশা বলল চেঁচিয়ে, "আঃ, কাপুরুষ ভীতু কাক কোথাকার! ভয়টা পেলি কিসে? দেখ্, আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে।" (ওরা সবাই এগিয়ে এল পাত্রটার দিকে, গরম গরম ধোঁয়া-ছড়ানো আলু খেতে লাগল, কেবল ভানিয়া নড়ল না।) পাভলুশা বলল, "কি রে, তুই যে আসছিস না?"

কিন্তু সে মাদুরের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এল না বেরিয়ে। শীগ্‌গিরই খালি হয়ে গেল পাত্রটি।

ইলিউশা শুরু করল, "জানিস তোরা, ভারনাভিৎসীতে কী হয়েছিল আমাদের?"

ফেদিয়া জিজ্ঞেস করল, "বাঁধের কাছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁধের কাছে, ভাঙা বাঁধটার কাছে। সে একটা ভূতুড়ে জায়গা, এমন একটা ভূতুড়ে জায়গা, আর কী নির্জন। চারদিকে কেবল গর্ত আর খাদ, গর্তে আবার সাপ থাকে সব সময়।"

"আচ্ছা, কী হয়েছিল? বল্ তো।"

"বলছি, হ্যাঁ, ঘটনাটা এই। ফেদিয়া, তুই বোধহয় জানিস না, ওখানে কবর দেওয়া হয়েছিল জলে ডুবে-মরা একটি লোককে; লোকটি মরে অনেক অনেক দিন আগে, জল তখন গভীর ছিল; এখন কেবল কবরটা দেখা যায়, কোনক্রমে দেখা যায় ... সামান্য একটা ছোটো স্তূপ মাত্র ... যাই হোক, একদিন শিকারী ইয়েরমিলকে ডেকে নাজির বলল, 'ইয়েরমিল, ডাকে যাও।' ইয়েরমিল আমাদের হয়ে বরাবর ডাকে যায়; সবগুলো কুকুরকে সে মরে যেতে দিয়েছে; তার সঙ্গে আর কুকুর থাকবে না কোনো কারণে, তার সঙ্গে থাকেওনি, যদিও সে খুব ভালো একজন শিকারী, সবাই তাকে পছন্দ করে। ইয়েরমিল তো গেল ডাকে, শহরে কাল কাটাল একটু, ফিরে যখন এল তখন সে একটু মাতাল। রাত্রি হয়েছে, চমৎকার রাতটি; চাঁদ হাসছে... ইয়েরমিল বাঁধ বরাবর আসছিল; ওখান দিয়েই তার পথ। ওখান দিয়ে সে আসছে, এমন সময় চোখে পড়ল সেই জলে ডুবে-মরা লোকটির কবরের ওপর একটি ভেড়ার বাচ্চা ছুটোছুটি করছে, চমৎকার শাদা সুন্দর বাচ্চা, গায়ের লোম কোঁকড়া। ইয়েরমিল ভাবল, 'ওটাকে নেব আমি,' এই ভেবে নামল ঘোড়া থেকে আর ভেড়ার বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। ওটার কিন্তু কোনো খেয়াল নেই। ইয়েরমিল ফিরে গেল ঘোড়াটার কাছে, ঘোড়াটা কিন্তু হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে, নাক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল, মাথা নাড়াল; কিন্তু সে ঘোড়াটাকে বলল 'উয়ো,' তারপর বাচ্চা ভেড়াটাকে নিয়ে চেপে বসল ঘোড়ায়, আবার চলতে লাগল; বাচ্চা ভেড়াটাকে ধরে রাখল সামনে। সে ওটার দিকে তাকায় আর বাচ্চাটিও তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সোজা, এই রকম করে। শিকারী ইয়েরমিল বিচলিত বোধ করল।

বলল, 'ভেড়া এমনি করে কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, এ রকম ব্যাপার তো মনে পড়ে না'; যাই হোক, সে তো ওর লোমে এমনি করে চাপড় মারতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'টাক! টাক্!' হঠাৎ তখন সেই ভেড়ার বাচ্চাটা দাঁত দেখাল আর বলে উঠল, 'টাক্! টাক্!'"

ছেলেটি গল্প বলতে বলতে শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করতে-না-করতেই সহসা দুটো কুকুরই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, এবং ক্ষেপার মতো ঘেউ ঘেউ করতে করতে আগুনের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেরা সবাই গেল ভয় পেয়ে। ভানিয়া মাদুরের তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। পাভলুশা চীৎকার করতে করতে ছুটে গেল কুকুর দুটোর পেছনে। দূরে ঘেউ ঘেউ শব্দটা মিলিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। আতঙ্কিত ঘোড়ার পালের এলোমেলো অস্বস্তিতে ভরা পায়ের শব্দ কানে এল। পাভলুশা জোরে চীৎকার করে উঠল, "হেই, সেরী! ঝুচ্‌কা!" কয়েক মিনিটের মধ্যে কুকুরের ডাক গেল থেমে; দূরে তখনো পাভলুশার গলা শোনা যাচ্ছে। আরো একটুখানি সময় কেটে গেল; ছেলেগুলি হতচকিত হয়ে তাকাচ্ছিল চারদিকে, যেন কিছু একটা ঘটবার জন্য অপেক্ষা করছে। সহসা একটা ঘোড়ার দৌড়ের শব্দ শোনা গেল; কাঠের স্তূপের সামনে এসে থেমে গেল ওটা, আর ঘোড়ার কেশর ধরে পাভলুশা দ্রুতবেগে লাফিয়ে পড়ল। কুকুর দুটোও ছুটে এসে পড়ল আগুনের দীপ্তির রেখা-বেষ্টনীর মধ্যে, তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল, ঝুলিয়ে দিল লাল জিভ।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার? ব্যাপার কি?"

ঘোড়াটার দিকে হাত বাড়িয়ে পাভলুশা বলল, "কিছু না। মনে হয়, কুকুর দুটো কোনো গন্ধ পেয়েছিল।" তারপর ধীরে শান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বলল, "ভেবেছিলাম একটা নেকড়ে বোধহয়।"

পাভলুশার তারিফ না করে পারিনি। সেই মুহূর্তে সে চমৎকার। তার কুশ্রী মুখ দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে জীবন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাতে কঠোরতা এবং দৃঢ়তার আভা। হাতে একটি ছড়ি না নিয়েও, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে রাত্রির অন্ধকারে ছুটে গিয়েছিল একলা একটা নেকড়ের মোকাবিলা করতে। তার দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলুম, "কী চমৎকার ছেলেটা!"

কাঁপতে কাঁপতে বলল কোস্তিয়া, "তাহলে নেকড়ে দেখেছিস তুই?"

পাভল্‌শা বলল, "এখানে বরাবরই তো অনেক নেকড়ে; কিন্তু জ্বালাতন করে কেবল শীতকালেই।"

আবার সে আগুনের সামনে গুটিসুটি মেরে বসল। মাটিতে বসে একটা কুকুরের লোমশ মাথায় হাতখানা রাখল। অনেকক্ষণ পশুটা আদর পেয়ে মাথাটা আর ঘোরাল না, পাভল্‌শার দিকে তাকিয়ে একপেশে হয়ে রইল কৃতজ্ঞতা মেশানো গর্ব নিয়ে।

ভানিয়া আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল মাদুরের তলায়।

ফেদিয়া সম্পন্ন কৃষকের ছেলে, তার ভূমিকা হল কথাবার্তা চালিয়ে নেওয়া; সে শুরু করল, "কী সব ভয়ানক গল্প আমাদের বলছিলি, ইলিউশা!" (ফেদিয়া নিজে বলে কম: নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় পাছে স্পষ্টত এই ভয়ে।) "আর তারপর কোন দত্যিদানা কুকুর দুটোকে ডাকিয়ে তুলল ... হ্যাঁ, আমি শুনেছি তোদের ওই জায়গাটা ভূতের বাসা।"

"ভারনাভিৎসী?... আমারও মনে হয় জায়গাটা ভূতুড়ে! লোকে বলে, একাধিকবার তারা সেখানে বুড়ো কর্তাকে দেখেছে -- বুড়ো কর্তা যিনি মারা গেছেন। তারা বলে, তিনি পরে থাকেন একটি লম্বা ঝুলনো কোট, আর এমনি করে কোঁকান, আর কী যেন খুঁজে বেড়ান মাটিতে। একবার তাঁর সঙ্গে ত্রফিমীচ দাদুর দেখা হয়েছিল। সে বলল, 'আজ্ঞে কর্তা ইভান ইভানীচ, মাটিতে আপনি আজ্ঞে কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন?' "

ফেদিয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "তাঁকে জিজ্ঞেস করল?"

"হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করল তাঁকে।"

"আচ্ছা! এরপর ত্রফিমীচকে আমি বীর পুরুষই বলব ... তারপর? ... তিনি কী বললেন?"

"তিনি বললেন, 'সেই শেকড়টা খুঁজছি যাতে সবকিছু চিরে যায়।' কিন্তু এমন ভারী গলায় কথা বলেন তিনি, এমন ভারী গলায়। 'কিন্তু হুজুর, সব-চেরা ও রকম শেকড় আপনি চাইছেন কেন?' 'কবরটা আমার ওপর চেপে বসেছে; চেপে বসেছে আমার ওপর, ত্রফিমীচ; আমি বেরিয়ে আসতে চাই -- পরিত্রাণ পেতে চাই।' "

ফেদিয়া বলল, "শোন কথা! বোধহয় বেঁচে থাকতে সব সাধ তাঁর পূরণ হয়নি।"

কোস্তিয়া বলল, "বা রে মজা! আমি ভেবেছিলাম মরাদের দেখা যায় কেবল অল হ্যালোজ ডে-তে।"

ইলিউশা মাঝখান থেকে বলে উঠল দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, "মরাদের যে কোনো সময় দেখা যায়।" যা লক্ষ্য করলাম তাতে মনে হল অন্যান্যদের চেয়ে গ্রামের কুসংস্কারগুলি ও বেশি জানে। "কিন্তু অল হ্যালোজ ডে-তে জীবিতদেরও দেখা যায়, তার মানে, যারা সে বছর মারা যাবে সেই সব জীবিত ব্যক্তিদের। কেবল গির্জার অলিন্দে বসে থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে। রাস্তা ধরে তারা আসবে পাশে, মানে যারা আর কি মারা যাবে সে বছর। গতবার বুড়ী উলিয়ানা গেছল অলিন্দে।"

কোস্তিয়া কৌতূহলভরে প্রশ্ন করল, "সে কি দেখেছিল কাউকে?"

"অবশ্য। প্রথমটা সে বসে রইল অনেক, অনেকক্ষণ ধরে, কাউকে দেখল না, শুনল না কিছু... কেবল মনে হতে লাগল যেন কোথায় একটা কুকুর কেঁউ কেঁউ করে চলেছে, কেঁউ কেঁউ করে চলেছে... হঠাৎ সে তাকাল চোখ তুলে: রাস্তা দিয়ে শুধু শার্ট গায়ে দিয়ে একটি ছেলে আসছে। তার দিকে তাকাল। ছেলেটি ইভাশকা ফেদসেয়েভ।"

ফেদিয়া বলল, "যে সেই বসন্তকালে মারা গেল?"

"হ্যাঁ, সে-ই। সে হেঁটে এগিয়ে এল কিন্তু একবারও মাথাটা তুলল না। কিন্তু উলিয়ানা তাকে চিনত। এরপর সে আবার চোখ তুলে তাকাল: একটি মেয়ে এল হেঁটে। সে তার দিকে তাকিয়ে রইল, আবার তাকাল... আহা! হা ঈশ্বর!... রাস্তা ধরে সে যে নিজেই আসছে, হ্যাঁ, উলিয়ানা নিজেই।"

ফেদিয়া বলল, "সে-ই নাকি?"

"হ্যাঁ, ঈশ্বর জানেন, সে-ই।"

"বেশ, কিন্তু ও তো এখনো মারা যায়নি?"

"বছর এখনো শেষ হয়নি! আর, ওকে চেয়ে দেখিস না কেন, ওর জীবনটা তো মাত্র একটি সুতোর ওপর নির্ভর করে আছে।"

আবার সবাই নীরব। পাভলুশা এক মুঠো শুকনো ডালপালা আগুনে ফেলে দিল। অকস্মাৎ লক্ লক্ করে ওঠা আগুনের শিখায় ওগুলো শীঘ্রই পুড়ে উঠল; কট্ কট্ করে উঠল কাঠগুলো, ধোঁয়া উঠল, তারপর জ্বলন্ত দিকগুলো বেঁকে উঠে কাঠগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যেতে লাগল। চারদিকে,

বিশেষ করে ওপর দিকে ঝলক দিতে লাগল আগুনের ভাঙা ভাঙা ঝকঝকে শিখাগুলি। সহসা শাদা একটি ঘুঘু উড়ে এল একেবারে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে, লাল আভায় রক্তিম হয়ে চারদিকে ভয়ে ঘুরতে লাগল পাখা ঝাপটে করে, তারপর পাখা ফুর্‌র্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাভলুশা বলল, "বোধহয় বাসা হারিয়ে ফেলেছে পাখিটা। এখন উড়েই চলবে যতক্ষণ কোথাও একটু আশ্রয় পায়, যেখানে ভোরবেলা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে পারে।"

কোস্তিয়া বলল, "কেন পাভলুশা, এটি স্বর্গে উড়ে যাওয়া কোন পুণ্যাত্মা হতে পারে না?"

পাভলুশা আর এক মুঠো কাঠ ফেলে দিল আগুনে।

শেষে বলল, "হয়ত।"

ফেদিয়া শুরু করল, "কিন্তু পাভলুশা, বলো তো, তোমরা কি শালামভোতেও স্বর্গীয় অলক্ষণ* দেখেছ?"

"যখন সূর্য আর দেখা যায় না? হ্যাঁ, দেখেছি বটে।"

"ভয়ও পেয়েছিলে?"

"পেয়েছিলাম; কিন্তু কেবল আমরাই ভয় পাইনি। আমাদের কর্তা আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন এক স্বর্গীয় অলক্ষণ দেখা দেবে, কিন্তু যখন আঁধার হল তখন, লোকে বলে, ভয়ে তাঁর বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছল। চাকর-বাকরদের কুটিরটায় বুড়ীটা অন্ধকার হতে-না-হতেই শিক দিয়ে উনুনে সবগুলো পাত্র ভেঙে ফেলেছিল। বলেছিল, 'কে আর খাবে এখন? শেষের সে দিন তো এসেছে।' সারা বাড়িতে ঝোল তরকারী সব কিছুর স্রোত বয়ে গেল। আর গ্রামে আমাদের মধ্যে কত রকম সব গল্প: শাদা নেকড়ে সব পৃথিবী চষে বেড়াবে আর মানুষ ধরে খাবে, আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে একটা শিকারী পাখি, তাছাড়া এমন কি ত্রিশকাকেও** দেখা যাবে।"

কোস্তিয়া জিজ্ঞাসা করল, "ত্রিশকা কী?"

* আমাদের অঞ্চলে সূর্যগ্রহণকে কৃষকরা বলে এই।—লেখক।

** সম্ভবত খ্রীষ্টদ্রোহী বিষয়ে কোনো কাহিনী থেকে ত্রিশকা সম্পর্কে লোকেদের ধারণা জন্মেছে। — লেখক।

বাধা দিয়ে উষ্ণ স্বরে ইলিউশা বলল, "কেন, জানিস না? কী ভাই, এমন কোথায় মানুষ হয়ে উঠেছিস যে ত্রিশকা জানিস না? তুই ঘরকুনো, গ্রামের একচোখোদের একজন বটে তুই! ত্রিশকা আশ্চর্য লোক, একদিন সে আসবে, আর এমন চমৎকার লোক সে যে অন্য লোকে তাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না, কেউ কখনো তার কিছু করতে পারবে না, এমন আশ্চর্য লোক। লোকজন তাকে ধরবার চেষ্টা করবে; যেমন ধর, লাঠি নিয়ে তারা ধাওয়া করবে, ঘিরে ধরবে তারা, কিন্তু সে তাদের চোখে ধুলো দেবে আর অন্ধের মতো তারা এর ওর গায়ে গিয়ে পড়বে। কিংবা ধর, তাকে ওরা হাজতে দেবে; সে তখন একটি বাটিতে করে খাবার জল চাইবে; নিয়ে আসবে বাটি, আর সে তখন ওতে ডুব দিয়ে তাদের কাছে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার হাত বাঁধবে শেকল দিয়ে, কিন্তু সে কেবল হাততালি দেবে — আর শেকল খুলে পড়ে যাবে। এমনি করে ত্রিশকা যাবে গ্রামে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, আর এই ত্রিশকা হবে সেয়ানা: সে খ্রীষ্টসন্তানদের বিপথে নিয়ে যাবে ... আর তারা তার কিছুই করতে পারবে না... এমন আশ্চর্য আর চালাক হবে সে।"

পাভলুশা ধীরে সুস্থে বলতে থাকল, "আচ্ছা বেশ, তাহলে সে হচ্ছে ওই রকম। আর তাই আমাদের অঞ্চলে লোকে মনে করছিল সে আসবে। বুড়োরা বলল, 'যেমনি শুরু হবে স্বর্গীয় অলক্ষণ অমনি আসবে ত্রিশকা।' শুরু হল স্বর্গীয় অলক্ষণ। গ্রামের সব লোক ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায় রাস্তায়, মাঠে প্রান্তরে, কী ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের অঞ্চলটা, জানিস তো, খোলা-মেলা অঞ্চল। লোকেরা তাকিয়ে আছে, হঠাৎ বড়ো গ্রামের পাহাড়ের পাশ বেয়ে কেমন ধরনের একটা লোক আসছে; এমন অদ্ভুত লোকটা, এমন অপূর্ব তার মাথা যে সবাই চীৎকার করে ওঠে, 'ওই ত্রিশকা আসছে! ঐ, ত্রিশকা আসছে!' এই না বলে সবাই সব দিকে ছুটতে থাকল! আমাদের মোড়ল হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন একটা গড়খাই-এ; তাঁর স্ত্রী দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলেন; তাতে তাঁর উঠোন-কুকুরটা এমন ভয় পেয়ে গেল যে শেকল ছিঁড়ে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে চলে গেল বনে; আর কুজ্‌কার বাবা দরফেইচ ছুটে ওট ঝোপে গিয়ে ঢুকে সেখানে শুয়ে পড়লেন আর তারুই পাখির মতো কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, 'দুষমনটা, শয়তানটা হয়ত অন্তত পাখি-পাখালীদের রেহাই দেবে।' তারা সব এমনি ভয় পেয়ে

গেল! কিন্তু রাস্তা দিয়ে আসছিল আসলে আমাদের পিপে তৈরি করে যে, সেই ভাভিলা; সে একটা নতুন কলসী কিনেছে আর মাথার ওপর সেইটি বসিয়ে নিয়ে আসছিল।"

ছেলেরা সবাই হেসে উঠল, আবার একটু নীরবতা, খোলা ময়দানে লোকজন যখন কথাবার্তা বলে তখন এমনিই হয়। রাত্রির গম্ভীর নিঃশব্দ মহিমার দিকে তাকালাম; সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতে যে একটি শিশিরসিক্ত সজীবতা ছিল, মধ্যরাত্রিতে তার বদলে দেখা দিয়েছিল শুকনো উত্তাপ; নিদ্রামগ্ন প্রান্তরের ওপরে নরম যবনিকায় অন্ধকার আরো বহুক্ষণ আটকে থাকবে; ঊষার প্রথম গুঞ্জন, প্রথম শিশির কণা দেখা দেবার আরো অনেক দেরী আছে। আকাশে চাঁদ ছিল না; এই সময় বিলম্বিত চাঁদ উঠত। অসংখ্য সোনালী তারা যেন ঝিকমিক করছে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে, মনে হচ্ছে সবাই যেন ভারি অবলীলাক্রমে ছুটে চলেছে ছায়াপথের দিকে, আর সত্যি, ওদের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর বিরামবিহীন, ঘূর্ণায়মান গতি যেন প্রায় স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়... অদ্ভুত একটা কর্কশ করুণ কান্নার শব্দ দুবার শোনা গেল নদীর ওপর, কয়েক মুহূর্ত পরে, আরো খানিকটা ভাটিতে শব্দটা আবার শোনা গেল...

কোস্তিয়া কেঁপে উঠল থর থর করে। "ও কী?"

পাভলুশা শান্তস্বরে বলল, "ও একটা বড়ো বকের চীৎকার।"

কোস্তিয়া পুনরাবৃত্তি করল, "বক?" একটুখানি থেমে আবার বলল, "কাল সন্ধ্যায় যা শুনেছিলাম সেটা তাহলে কী, পাভলুশা? তুই বোধহয় জানিস।"

"কী শুনেছিলি?"

"কী শুনেছিলাম বলছি। আমি কামেন্নায়া গ্রিয়াদা থেকে যাচ্ছিলাম শাশকিনোতে; প্রথমে আমাদের আখরোট বনের মধ্য দিয়ে গেলাম, তারপর ছোটো একটি ঝিলের পাশ দিয়ে — তুই জানিস, যেখান থেকে পাথরের নালার দিকে যেতে একটা খাড়া বাঁক আছে — সেখানে একটা গাড়া আছে, জানিস নলখাগড়ায় প্রায় ভর্তি, আমি বুঝলি, গাড়াটার কাছে গেছি, এমন সময় হঠাৎ ওটা থেকে শব্দ এল একটা, যেন কেউ কোঁকাচ্ছে, আর কী করুণ সে সুর, কী করুণ: 'উ-উ, উ-উ!' আমি এমন ভয় পেয়ে গেলাম ভাই, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে, আর স্বরটা এমন করুণ, দুঃখে ভরা। আমার মনে হল আমি নিজেই কেঁদে ফেলব... ওটা কী হতে পারে বল তো, অ্যাঁ?"

পাভলুশা বলল, "ওই গাড়াতেই গত গ্রীষ্মকালে চোরেরা বন-রক্ষক আকিমকে ডুবিয়ে দিয়েছিল, বোধহয় তার আত্মাই বিলাপ করছিল।"

কোস্তিয়ার চোখ দুটি তো একেই গোল, তার ওপর সেগুলো বিস্ফারিত করে সে বলল, "ও মা, তাই নাকি ভাই? আমি তো জানতুম না যে আকিমকে ওই গর্তেই ডুবিয়ে দিয়েছিল। জানলে আমি নিশ্চয় আরো বেশি ভয় পেতুম!"

পাভলুশা এরপর বলল, "কিন্তু লোকে বলে, ওখানে ছোটো ছোটো ক্ষুদে ব্যাঙ আছে, ওরা অমনি করুণ সুরে চীৎকার করে।"

"ব্যাঙ? না,না, ব্যাঙ নয় তা, কক্ষনো না।" (নদীর ওপর আবার চীৎকার করে উঠল বড়ো বকটা।) কোস্তিয়া অনিচ্ছায় বলে উঠল জোরে, "উঃ, ওই যে — ঠিক যেন বুনো-ভূত চেঁচাচ্ছে।"

ইলিউশা বলল, "বুনো-ভূত চেঁচায় না, ও বোবা; শুধু হাততালি দেয় আর খট খট করে।"

ফেদিয়া জিজ্ঞেস করল বিদ্রূপ মিশিয়ে, "তুই তাহলে বুনো-ভূত দেখেছিস?"

"না, দেখিনি, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, ও যেন আমার না দেখতে হয়; কিন্তু অন্য লোকে দেখেছে। কী বলব, একদিন আমাদের ওদিকে বুনো-ভূত একটি চাষীকে পথ ভুলিয়ে বন-বাদাড় পার করে একটা মাঠের মাঝখানে ঘুরিয়েছিল ... বাড়ি পৌঁছতে প্রায় রাত কাবার।"

"আচ্ছা, চাষীটা দেখেছিল ওকে?"

"হ্যাঁ। সে বলে, ভূতটা প্রকাণ্ড, বিরাট জানোয়ার, কালো, কোনো আকৃতি নেই, যেন একটা বড়ো গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল; ভালো করে বোঝা যায় না; যেন চাঁদের আলো থেকে লুকিয়ে ছিল ভূতটা, যেন প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে তো আছেই, আর পিট্ পিট্ করছে চোখ ..."

ফেদিয়া একটুখানি কেঁপে উঠে বলল, "উঃ!" ঘাড়টা একটু ঝাঁকিয়ে বলল, "ফু-উ!"

পাভলুশা বলল, "আর কী করে যে এ রকম নোংরা জীব আসে পৃথিবীতে, সে আশ্চর্য।"

বলল ইলিউশা, "নিন্দা করিস না ওর, সাবধান, শুনতে পারে।"

আবার একটু নীরবতা।

হঠাৎ ভানিয়ার ছেলেমানুষি গলা শোনা গেল, "দেখ, দেখ, ভাই, ভগবানের ঐ ছোটো ছোটো তারাগুলোর দিকে দেখ; মৌমাছিদের মতো থোপা বেঁধেছে তারাগুলো।"

ঢাকনা থেকে সে তার ছোটো সজীব মুখখানা বার করল, ছোটো মুঠির ওপর ভর করে ধীরে ধীরে বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চোখ দুটি তুলে ধরল। সব ছেলেদেরই চোখ তখন আকাশপানে, তাড়াতাড়ি চোখ নামাল না তারা।

ফেদিয়া আদরের সুরে বলতে শুরু করল, "আচ্ছা ভানিয়া, তোর বোন আনিউৎকা ভালো আছে?"

অল্প একটু আধো-আধো ভাব নিয়ে ভানিয়া জবাব দিল, "হ্যাঁ, খুব ভালো আছে।"

"জিজ্ঞেস করিস তো আমাদের ওখানে ও আসে না কেন?"

"তা আমি জানি না।"

"তাকে আসতে বলিস।"

"বেশ।"

"বলিস, ওর জন্য একটি উপহার আছে আমার কাছে।"

"আমার জন্যও?"

"হ্যাঁ, তোরও জন্য।"

ভানিয়া দীর্ঘশ্বাস টানল।

"না; আমার চাইনে। তাকেই দিস উপহার; বাড়িতে আমাদের সে এত যত্ন করে।"

ভানিয়া আবার মাটিতে মাথাটি নামিয়ে রাখল। পাভলুশা উঠে দাঁড়াল, হাতে করে নিল খালি পাত্রটি।

ফেদিয়া জিজ্ঞেস করল, "কোথায় চললি তুই?"

"নদীতে, জল আনতে; একটু জল খাব।"

কুকুর দুটো উঠে গেল তার পেছন পেছন।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল ইলিউশা, "সাবধান, দেখিস নদীতে পড়ে যাস না যেন!"

ফেদিয়া বলল, "পড়বে কেন? ও সাবধানে থাকবে।"

"হ্যাঁ, সাবধান হবে। কিন্তু কত রকম সব ঘটনা ঘটে; জল ভরতে গিয়ে হয়ত একটু নুয়ে পড়বে, আর তখন জল-ভূত ওর হাত ধরে টেনে একেবারে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাবে। লোকে তখন বলবে, 'ছেলেটা জলে পড়ে গেছল।' পড়েই গেছল বটে!..." কান পেতে শুনে সে বলল তারপর, "এই দেখ, ও গেছে নলখাগড়া বনে।"

নলখাগড়া বনে পথ কেটে চলবার সময় সেগুলো শিষ শিষ করে উঠল, আমাদের মধ্যে এই শব্দটাকে বলে "শিষ শিষ"।

কোস্তিয়া জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু এ কথা কি সত্যি যে জলে পড়ে যাওয়ার পর থেকে আকুলিনা পাগল হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, তারপর থেকেই... এখন সে কী ভয়ানক হয়ে উঠেছে! কিন্তু সবাই বলে ওর আগে সে আশ্চর্য সুন্দরী ছিল। জল-ভূত তাকে যাদু করেছিল। আমার মনে হয় জল-ভূতটা বুঝতে পারেনি যে লোকজন তাকে অত তাড়াতাড়ি তুলে ফেলবে জল থেকে। তাই ওইখানে জলের তলায় সে তাকে মায়ায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।"

(আমি এই আকুলিনাকে দেখেছি একাধিকবার। তার পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া, অসম্ভব রোগা, মুখটা কয়লার মতো কালো, দৃষ্টি ক্ষীণ। আর সব সময় দাঁত বার করে থাকে, এই আকুলিনা রাজপথের একটি জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, পা দাপায়, অস্থিচর্মসার হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরে বুকটা, আর ধীরে ধীরে খাঁচায় পোরা বুনো জানোয়ারের মতো এক পা থেকে আর এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। তাকে যা বলা হত তার কিছুই সে বোঝে না, কেবল মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো করে হাসে।)

কোস্তিয়া বলে চলল, "কিন্তু লোকে বলে আকুলিনা জলে ঝাঁপ দিয়েছিল নিজেই, তার প্রেমিক তাকে ঠকিয়েছিল বলে।"

"হ্যাঁ, তাই।"

কোস্তিয়া এরপর বলল করুণভাবে, "আর ভাসিয়াকে মনে আছে তোর?"

ফেদিয়া জিজ্ঞাসা করল, "কোন ভাসিয়া?"

কোস্তিয়া জবাবে বলল, "কেন, যে ডুবে গেছল! ডুবেছিল এই নদীতেই। আঃ, কী ছেলেই না ছিল! কী ছেলেই না ছিল, আহা! তার মা ফেকলিস্তা, কী ভালোই বাসতেন ছেলেকে, ভাসিয়াকে! আর তাঁর, হ্যাঁ ফেকলিস্তার কেমন

একটা ভয় ছিল যে ছেলের বিপদ আসবে জল থেকে। মাঝে মাঝে গরমের দিনে ভাসিয়া যখন আমাদের সঙ্গে দল বেঁধে নদীতে চান করতে যেত, তখন তিনি থরথর করে কাঁপতেন। অন্যান্য মেয়েরা কিছু মনেই করত না; তারা ঘড়া গামলা নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেত, কিন্তু ফেকলিস্তা তাঁর গামলাটি মাটিতে নামিয়ে রেখে ছেলেকে ডাকতে থাকতেন, 'ফিরে আয়, ফিরে আয়, আমার মাণিক; সোনা ফিরে আয়!' তারপর কী করে সে জলে ডুবল তা কেউ জানে না। পাড়ে সে খেলছিল, আর তার মা সেখানে খড় শুকোচ্ছিলেন; সহসা শুনলেন তিনি যেন জলের মধ্য দিয়ে কেউ বুড়বুড়ি কাটছে, তারপর একি! নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে কেবল ভাসিয়ার টুপিটা। সেদিন থেকে জানো, ফেকলিস্তার মাথার ঠিক নেই: ভাসিয়া যেখানে নদীতে ডুবে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকেন তিনি; ওখানে শুয়ে শুয়ে, ভাই, তিনি গান করেন একটা— তোদের বোধহয় মনে আছে ভাসিয়া সব সময় ও রকম গান গাইত— তাই তিনিও গান করেন, আর কাঁদেন কেবল কাঁদেন, আর ভগবানকে তিক্ত নালিশ আর তিরস্কার জানান।"

ফেদিয়া বলল, "ওই যে পাভলুশা আসছে।"

পাভলুশা একটা পূর্ণ পাত্র হাতে নিয়ে আগুনের কাছে চলে এল। একটু নীরব থেকে সে শুরু করল, "শুনছিস, একটা ব্যাপার ঘটেছে।"

"কী, কী?" তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল কোস্তিয়া।

"আমি ভাসিয়ার গলা শুনতে পেলাম।"

সবাই তারা যেন শিউরে উঠল।

তোৎলাতে তোৎলাতে কোস্তিয়া বলল, "তার মানে কী? কী বলছিস?"

"জানিনে। আমি শুধু জলের কাছে নুয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনলাম ভাসিয়ার গলায় আমার নাম ধরে ডাকছে, যেন জলের তলা থেকে আসছে ডাকটা। 'পাভলুশা, পাভলুশা, এসো এখানে।' আমি চলে এলাম সরে। অবশ্যি জল নিয়ে এসেছি।"

ছেলেরা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলল, "আহ্, ভগবান দয়া করুন আমাদের।"

ফেদিয়া বলল, "তোকে ডাকছিল জল-ভূত, পাভলুশা; আমরা এই এক্ষুনি ভাসিয়ার কথা বলছিলাম।"

ইলিউশা বলল জোর দিয়ে, "আহ্, এটা অমঙ্গলের লক্ষণ।"

"থাকগে, ভাবিস না কিছু," পাভলুশা বলল বলিষ্ঠ স্বরে, তারপর বসল আবার, "কেউ তো আর নিয়তি এড়াতে পারে না।"

ছেলেগুলি নীরব নিঃশব্দ। স্পষ্ট বোঝা গেল, পাভলুশার কথাগুলো গভীর রেখাপাত করেছে তাদের মনে। আগুনের সামনে ওরা শুয়ে পড়তে লাগল, যেন ঘুমুনোর জন্য তৈরি হচ্ছে।

সহসা মাথা তুলে কোস্তিয়া জিজ্ঞাসা করল:

"ও কী?"

শোনে পাভলুশা।

"কোঁচ-বক উড়ছে আর শিস্ দিচ্ছে।"

"কোথায় যাচ্ছে উড়ে?"

"এমন একটি দেশে যেখানে, লোকে বলে, যেখানে শীত নেই।"

"কিন্তু এ রকম দেশ কি আছে?"

"আছে।"

"অনেক দূর?"

"অনেক, অনেক দূরে, উষ্ণ সমুদ্র ছাড়িয়ে।"

কোস্তিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল।

ছেলেদের মধ্যে এসে পড়েছি তারপর তিন ঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেছে। অবশেষে চাঁদ উঠল; প্রথমে আমি লক্ষ্য করিনি, এমন ছোটো বাঁকা চাঁদ। আগের মতোই চন্দ্রহীন এই রাত্রি ছিল স্তব্ধ গম্ভীর নিথর... কিন্তু অনেক অনেক তারা, কিছুক্ষণ আগে ঊর্ধ্ব আকাশে সেগুলি ছিল, ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অন্ধকার বেষ্টনী ছাড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে; চারদিকে সবকিছু একেবারে নিথর নিস্পন্দ, ভোরের ঠিক আগে যেমন হয়ে থাকে; সবাই ঘুমুচ্ছে একটানা ঘুম যা আসে প্রত্যুষের পূর্বে। বাতাসের সৌরভ এর মধ্যেই আরো অনেকটা মৃদু হয়ে গেছে; আর একবার যেন শিশির ঝরে পড়ছে ... গ্রীষ্মকালে রাত কত ছোটো!... আগুন স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের কথাবার্তা থেমে গেছে। এমন কি কুকুর দুটো পর্যন্ত ঝিমুচ্ছে, তারার আবছা, প্রায় অস্পষ্ট আলোর আভায় যতটা দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে দেখা গেল ঘোড়াগুলো মাথা নিচু করে ঘুমিয়ে পড়েছে... আমার কী রকম একটা ক্লান্ত আচ্ছন্ন ভাব দেখা দিল, তারপর তা নিদ্রায় প্রসারিত হয়ে গেল।

মুখের ওপর দিয়ে তাজা হাওয়া বয়ে গেল। চোখ খুললাম — ভোর হচ্ছে। প্রভাত আলোক এখনো আকাশ রাঙিয়ে তোলেনি, কিন্তু পূর্বাচল ফর্সা হতে শুরু করেছে। চারদিকে সবকিছুই দৃশ্যমান, যদিও একটু আবছা। ফ্যাকাশে-ধূসর আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে, শীতল হচ্ছে, নীলচে হয়ে যাচ্ছে: তারাগুলি আরো ক্ষীণ হয়ে জ্বলছে, কিংবা অদৃশ্য, লুপ্ত হয়ে গেছে; মাটি ভেজা, গাছের পাতায় পাতায় শিশির জমেছে, দূর থেকে আসছে জীবনের সাড়া, আসছে কণ্ঠস্বর, ভোরের নরম হাওয়া পৃথিবীর ওপর দিয়ে ফুর ফুর করে বয়ে গেল। একটি মধুর কোমল আনন্দের শিহরণে তাতে সাড়া দিল আমার দেহ। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম ছেলেদের কাছে। ওরা সব ধিকি ধিকি আগুন ঘিরে ঘুমুচ্ছে, যেন একেবারে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে; কেবল পাভলুশা অর্ধ জাগরণের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল একাগ্রভাবে।

তার উদ্দেশে মাথা নেড়ে কুয়াশায় ঢাকা নদীর পাশ দিয়ে বাড়িমুখো চললাম। দুই মাইলও হাঁটিনি, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যেই আমার চারিদিকে, প্রসারিত শিশির-ভেজা প্রান্তরের ওপর দিয়ে, সামনে, বন থেকে বনে বনান্তরে, যেখানে পাহাড়গুলো আবার সবুজ হয়ে উঠেছে, পিছনে, দীর্ঘ ধুলো মাখা পথে আর ঝকঝকে ঝোপঝাড়গুলোর ওপরে, একেবারে সবকিছু — রক্ত আভায় রঙীন হয়ে উঠল, নদীটা কুয়াশা কেটে নীলাভ হয়ে উঠেছে, আর তাতে বয়ে চলেছে তরল আলোর নতুন নতুন স্রোত, প্রথমে তা পাটল, তারপর লাল আর সোনালী ... সবকিছু স্পন্দিত হতে শুরু করেছে, শুরু করেছে জেগে উঠতে, গেয়ে উঠতে, ঝটপট করতে, কথা কইতে। চারদিকে বড়ো বড়ো শিশিরকণা হীরের মতো ঝক ঝক করছে; আমাকে অভ্যর্থনার জন্য বেজে উঠল যেন প্রভাতের সজীবতায় স্নান করে ওঠা শুচিশুদ্ধ, পরিষ্কার স্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি, আর হঠাৎ আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল ছেড়ে-আসা ছেলেগুলির তাড়া খাওয়া জিরিয়ে নেওয়া হৃষ্ট সতেজ ঘোড়ার পালটা।

দুঃখের কথা, তাও আমায় বলতে হয়, সে বছর পাভলুশা মারা গেল। সে জলে ডোবেনি; ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল। বড়ো আক্ষেপের কথা! চমৎকার ছিল ছেলেটি!

সুন্দর ঝরণা'র কাসিয়ান

শিকার থেকে ফিরছিলাম একটা ছোটো ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে দুলতে দুলতে; গরমের মেঘলা দিনের শ্বাসরোধ করে দেওয়া উত্তাপে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম (এ তো সুবিদিত, রোদে ভরা দিনের চেয়ে এ রকম মেঘলা দিনে গরমটা প্রায়ই আরো অসহ্য হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন আবার হাওয়া বাতাস কিছু থাকে না); ঝিমিয়ে পড়ছিলাম আর ঝাঁকানি খাচ্ছিলাম, পথ দিয়ে যেতে যেতে এবড়ো খেবড়ো আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ করা চাকার ঘায়ে অনবরত উঠছিল পাতলা ধুলো, অপ্রসন্ন সহিষ্ণুতায় সেই ধুলোর অত্যাচার সহ্য করছিলাম নিরুপায় হয়ে, সহসা আমার সহিসের অস্বাভাবিক অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল, এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত সহিসটি আমার চেয়ে আরো নির্বিবাদে ঝিমুচ্ছিল। সে রাশ ধরে টানাটানি শুরু করল, আসনে বসে অস্বস্তিতে নড়াচড়া করতে লাগল, ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে হাঁকডাক শুরু করল আর সর্বক্ষণ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল একই দিকে। আমি ঘুরে তাকালাম। আমরা প্রকান্ড এক চষা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম; নিচু নিচু পাহাড়গুলিও চষা, পাহাড়গুলো ঢালু, মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মতো মাথা উঁচিয়ে সরে সরে যাচ্ছে; চোখে পড়ে জনশূন্য একটি অঞ্চলের প্রায় তিন মাইল পরিমাণ জমি; দূরে ছোটো ছোটো কিছু বার্চ বনের তরঙ্গায়িত শীর্ষ, দিগন্তের প্রায় সরল রেখাটিকে এলোমেলো করে দিয়েছে কেবল ওগুলিই। সরু সরু পথ চলে গেছে মাঠের মাঝখান দিয়ে, তারপর ফাঁপা গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর ছোটো পাহাড়গুলোকে ঘিরে রয়েছে। এমনি একটি পথ এসে পড়েছে আমাদের রাস্তার ওপরে—আমাদের থেকে শ'পাঁচেক পা আগে, সে পথে

একটি শোভাযাত্রা ধরনের ব্যাপার চোখে পড়ল। আমার সহিস তাকিয়েছিল ও দিকেই।

একটি শোকযাত্রা। একেবারে সামনে একটি ছোটো শকট, তাতে জোতা একটি ঘোড়া, হেঁটে চলার গতিতে গাড়িটি এগুচ্ছে, গাড়িতে পুরোহিত; তাঁর পাশে বসে একজন অনুযাজক গাড়ি চালাচ্ছে; শকটের পেছনে চারজন খালি মাথা চাষী, তারা কফিন বয়ে আনছে, কফিনটি শাদা কাপড়ে ঢাকা, কফিনের অনুসরণ করছে দুটি স্ত্রীলোক। তাদের একজনের তীক্ষ্ন বিলাপধ্বনি অকস্মাৎ আমার কানে এল; আমি কান পেতে রইলাম; করুণ সুরে সে গাইছিল একটি অন্ত্যেষ্টি-গীতি। শূন্য প্রান্তরের মাঝে এই একঘেয়ে করুণ বিলাপের আবৃত্তি ভারি বিষণ্ন লাগছিল। সহিস চাবুক কষাল ঘোড়ার পিঠে; সে এই শোকযাত্রার সম্মুখে যেতে চায়। পথে মৃতদেহ দেখা অশুভ লক্ষণ। সরু পথটি থেকে শোকযাত্রা বড়ো রাস্তায় উঠবার আগেই সে সেই পথ ছাড়িয়ে যেতে পারল বটে, কিন্তু এই জায়গা থেকে একশ পা-ও যাইনি এমন সময় হঠাৎ আমাদের গাড়িটা ঝাঁকানি খেল প্রচন্ড, এক দিকে কাত হয়ে প্রায় উল্টে গেল। ছুটন্ত ঘোড়াগুলিকে বাগিয়ে রাখল সহিস, হাত দিয়ে একটা ইঙ্গিত করে থুথু ফেলল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?"

কথা না বলে কিংবা কোনো ব্যস্ততা না দেখিয়ে আমার সহিস নেমে এল।

"ব্যাপার কী?"

"চাকার ধুরোটা ভেঙে গেছে ... ওটাতে আগুন লেগেছিল," বিমর্ষ জবাব দিয়ে সে হঠাৎ ওদিকের ঘোড়াটার কলারটা এমন বিরক্তিভরে ঠিক করে দিল যে ঘোড়াটা প্রায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবার মতো হল, কিন্তু ঠিক দাঁড়াল স্থির হয়ে, নাক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল, শরীরটা নাড়াল, তারপর ধীরে সুস্থে দাঁত দিয়ে হাঁটুর নিচে চুলকোতে থাকল।

আমি নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম রাস্তার ওপর, নিরুপায়ের কেমন একটা অস্পষ্ট অপ্রিয় অনুভূতি নিয়ে। ডান দিকের চাকাটা প্রায় পুরোপুরি দুমড়ে ঢুকে গেছে গাড়ির তলায়, আর তার কেন্দ্রাংশটি যেন একটা বোবা হতাশায় উপর দিকে ঘুরে রয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম অবশেষে, "এখন কী করি?"

চাবুক দিয়ে শোকযাত্রাটি দেখিয়ে আমার সহিস বলল, "ওই হচ্ছে এ সবের কারণ!" শোকযাত্রা সেই মুহূর্তে উঠল বড়ো রাস্তার ওপর, আমাদের দিকে এগুতে লাগল। সহিস বলল আবার, "আমি বরাবর দেখে এসেছি, এ একটা অমোঘ লক্ষণ — 'মড়ার সঙ্গে দেখা' — তাই বটে।"

আবার সে ওদিকের ঘোড়াটাকে খোঁচাতে লাগল, ঘোড়াটা তার রুষ্ট মেজাজ টের পেয়ে একেবারে চুপ করে থাকাই ঠিক করে নিল, শুধু মাঝে মাঝে বিনীতভাবে ল্যাজ নেড়ে সন্তুষ্ট হয়ে রইল। একটুক্ষণ পায়চারি করে আমি আবার এসে থামলাম চাকাটার সামনে।

ইতিমধ্যে শোকযাত্রা এসে পড়েছে আমাদের কাছে। নীরবে রাস্তা থেকে নেমে ঘাসের ওপর দিয়ে শোকের মিছিলটি ধীরে ধীরে আমাদের ছাড়িয়ে গেল। আমার সহিস এবং আমি টুপি খুলে নিয়ে পুরোহিতকে অভিবাদন করলাম, কফিন-বাহকদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। বোঝা বয়ে চলতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল, বোঝার চাপে তাদের চওড়া বুকের ছাতি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কফিনের অনুসরণকারী দুটি স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন খুবই বুড়ো আর ফ্যাকাশে; তার মুখমন্ডল দুঃখের ছাপ লেগে ভয়ানক বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু তবু তাতে একটি গাম্ভীর্য এবং দৃপ্ত মর্যাদা বোধের অভিব্যক্তি স্পষ্ট। সে হাঁটছে নীরবে, মাঝে মাঝে ক্ষীণ হাতখানা সরু টানা ঠোঁটের কাছে তুলে আনছে। আর একটি মেয়ে যুবতী, বয়স হবে পঁচিশ বছর, তার চোখ দুটি ভেজা আর লাল, এবং তার সমস্ত মুখখানা কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে; আমাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় সে কান্না থামিয়ে মুখ লুকোল আস্তিনের মধ্যে... কিন্তু আমাদের ঘুরে শোকযাত্রা যখন আবার রাস্তায় উঠেছে, তখন আবার তার সেই করুণ, মর্মান্তিক বিলাপ শুরু হল। কফিনটা দুলছে যেন মেপে মেপে, আমার সহিস নীরবে তার অনুসরণ করল তার দৃষ্টি দিয়ে। তারপর আমার দিকে ঘুরে বলল:

"কবর দিচ্ছে যাকে সে মার্তীন; ও ছুতোর মিস্ত্রী মার্তীন, রিয়াবায়ার মার্তীন।"

"কী করে জানলে?"

"স্ত্রীলোক দুটিকে দেখে। বুড়ী ওর মা, আর যুবতীটি বউ।"

"সে তাহলে অসুস্থ ছিল?"

"হ্যাঁ ... জ্বর ...। গত পরশুদিন ওভারসিয়ার ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তারকে পায়নি বাড়িতে। মার্তীন ভালো ছুতোর মিস্ত্রী ছিল; একটু আধটু মদ খেত বটে, কিন্তু মিস্ত্রী ভালো ছিল। দেখুন তার বউটি কেমন ভেঙে পড়েছে... কিন্তু, ওই, মেয়েদের চোখের জলের দাম বেশি নয় বুঝলেন। মেয়েদের চোখের জল তো শুধু জল মাত্র ... হ্যাঁ, বাস্তবিক।"

বলে সে নুয়ে পড়ল, হামাগুড়ি দিয়ে গেল পাশের ঘোড়াটির জোতের নিচে, তারপর ঘোড়াগুলোর মাথার ওপর দিয়ে বাঁধা থাকে যে কাঠের বাঁকা জোয়াল সেটাকে শক্ত করে দু'হাত দিয়ে ধরল।

আমি বললাম, "সে যাই হোক, কী করি এখন বলো?"

আমার সহিস শাফ্‌ট ঘোড়াটার কাঁধে হাঁটু চাপিয়ে ভর করে দাঁড়াল. জোয়ালটাকে ঝাঁকুনি দিল একটা, এবং প্যাড সোজা করে দিল; পাশের ঘোড়াটার জোত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুল আবার, এবং যেতে যেতে ঘোড়াটার নাকে একটা ঘুঁষি মেরে এগিয়ে গেল চাকার কাছে। চাকাটার কাছে গিয়ে, ওখান থেকে এক মুহূর্তও চোখ না সরিয়ে ধীরে ধীরে কোটের ঝুল থেকে বার করল একটি বাক্স, একটি ফিতে টেনে আস্তে আস্তে বাক্সটার ডালা খুলে ফেলল, তারপর দুটি পুষ্ট আঙুল আস্তে আস্তে ঢোকাল কৌটায় (আঙুল দুটি বাক্সটাকে ঢেকেই ফেলল একদম), অতঃপর কিছু নস্যি টিপে টিপে বেশ আশায় আশায় নাক বাঁকাল, পর পর কয়েক বার নস্যিটা টেনে প্রত্যেক বার নস্যি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেনে টেনে হাঁচল। তারপর ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে, চোখ দুটি পিট পিট করতে লাগল ধীরে ধীরে. আর সে একটি যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল।

অবশেষে আমি বললাম, "তাহলে এখন?"

আমার সহিস যত্ন করে বাক্সটি রাখল পকেটে, হাত না লাগিয়ে মাথাটা নাড়িয়ে টুপিটা নিয়ে এল সামনে ভ্রূর ওপরে, বিমর্ষভাবে গিয়ে বসল আসনে।

একটু হতভম্ব হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী করছ?"

রাশ তুলে নিয়ে শান্তভাবে সে জবাব দিল, "দয়া করে বসুন।"

"কিন্তু আমরা যাব কী করে?"

"এবার আমরা যাব।"

"কিন্তু চাকার ধুরোটা?"

"দয়া করে বসুন।"

"কিন্তু চাকার ধুরোটা তো ভেঙ্গে গেছে।"

"ভেঙেছে ঠিকই. কিন্তু বসতিটা পর্যন্ত আমরা যাব ঠিক... হেঁটে চলার গতিতে অবশ্য। ওই ওখানে. ঝোপ ছাড়িয়ে ডান দিকে একটা বসতি আছে, ওটাকে বলে ইউদিনো।"

"তুমি কি ভাবছ ওখানে আমরা যেতে পারব?"

জবাব দেওয়ার জন্য গা করল না আমার সহিস।

আমি বললুম, "আমি বরং হাঁটি।"

"আপনার যেমন ইচ্ছে ..." এই বলে সে চাবুক শপ শপ করল। চলতে শুরু করল ঘোড়া দুটো।

আমরা বসতি পর্যন্ত যেতে পারলুম ঠিকই, অবশ্য ডান দিকের সামনের চাকাটা প্রায় খুলে পড়ো-পড়ো, অদ্ভুতভাবে সেটা ঘুরছিল। একটা টিলার ওপরে চাকাটা প্রায় ছিটকে যায় আর কি, কিন্তু সহিস মরীয়া স্বরে চীৎকার করে উঠল, আর নিরাপদেই নেমে এলাম টিলা থেকে।

ইউদিনো বসতিতে মোট ছ'টি ছোটো ছোটো নিচু কুটির, তাদের দেওয়ালগুলো ইতিমধ্যেই হেলে পড়তে শুরু করেছে, যদিও বেশি দিন আগে তৈরি হয়নি। কোনো কোনো কুটিরের পেছন দিকের প্রাঙ্গণ এমন কি বেড়া দিয়েও ঘেরা হয়নি। আমাদের গাড়ি এই বসতিতে ঢুকল, একটি প্রাণীও চোখে পড়ল না. রাস্তায় এমন কি মুরগীও দেখা গেল না একটা, একটা ল্যাজ ছাঁটা কালো নেড়িকুত্তা ছাড়া কুকুরও ছিল না; কুত্তাটা আমাদের আসতে দেখে তাড়াতাড়ি একটা শুকনো খটখটে শূন্য জলপাত্র থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল, তারপর ঘেউ ঘেউ না করে একটা গেটের তলা দিয়ে সোজা ছুট মারল; ওই জলপাত্রটার কাছে গিয়েছিল বোধহয় তৃষ্ণায়। একেবারে প্রথম কুটিরটিতে গিয়ে আমি তার বাইরের ঘরের দোর খুলে ডাকলাম বাড়ির মালিককে। কেউ সাড়া দিল না। আর একবার ডাকলাম, আর একটা দরজার পেছন থেকে পাওয়া গেল একটা বেড়ালের ক্ষুধার্ত মিউ মিউ শব্দ। পা দিয়ে খুলে ফেললাম দরজাটা, একটা রোগা বেড়াল আমার পাশ দিয়ে দৌড় মারল, অন্ধকারে ওর সবুজ চোখ দুটো চক্ চক্ করছিল। ঘরে মাথা ঢুকিয়ে চারদিকে তাকালাম

ঘরখানা শ‍ূন্য, অন্ধকার, ধোঁয়ায় ভরা। প্রাঙ্গণে ফিরে এলাম, সেখানেও নেই কেউ ... পগারের পেছন থেকে ডাকল একটা বাছ‍ুর; একটু দ‍ূরে একটা ধ‍ূসর বর্ণের খোঁড়া রাজহাঁস চলে গেল থপ থপ করতে করতে। দ্বিতীয় কুটিরে গেলাম। দ্বিতীয় কুঁড়েতেও একটি জনপ্রাণী নেই। প্রাঙ্গণে গেলাম ...

প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে, ঝকঝকে রোদ্রে শ‍ুয়ে পড়ে আছে মনে হয় একটি বালক, তার ম‍ুখটা মাটিতে, মাথার ওপরে চাপানো একটি অঙ্গাবরণ। তার থেকে কয়েক পা দ‍ূরে একটি খড়ে ছাওয়া শেডে একটা হতচ্ছাড়া ছোটো গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাজ-ভাঙা একটা ছোটো টাট্ট‍ু ঘোড়া। নড়বড়ে ছাদের সর‍ু সর‍ু ফাঁক দিয়ে ঘোড়াটার লোমশ বাদামী লাল চামড়ার ওপর ছড়িয়ে পড়ে স‍ূর্যরশ্মি ছোটো ছোটো আলোর রেখা এ‍ঁকে দিচ্ছিল। ওপরে, উ‍ঁচু পাখি-ঘরে পাখির বাচ্ছাগ‍ুলি কিচমিচ করছিল আর তাদের হাওয়া-বাসা থেকে নিচে তাকিয়ে দেখছিল কৌত‍ূহল নিয়ে। ঘ‍ুমন্ত লোকটির কাছে গিয়ে তাকে জাগাতে লাগলাম।

সে মাথা তুলে আমাকে দেখল, তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ... তারপর অর্ধ ঘ‍ুমন্ত অবস্থায় বলল বিড় বিড় করে, "কী? কী চান? কী?"

সঙ্গে সঙ্গেই তার কথার জবাব দিলাম না, তার চেহারা আমার মনে এমন অদ্ভুত রেখাপাত করল।

মনে মনে কল্পনা করে নিন পঞ্চাশ বছর বয়সের ক্ষ‍ুদে একটি প্রাণী, ছোটো, কালো, রেখাঙ্কিত ম‍ুখমন্ডল, খাড়া নাক, ক্ষ‍ুদে ক্ষ‍ুদে প্রায় অদ‍ৃশ্য বাদামী চোখ, ঘন কালো কোঁকড়া চুল, ক্ষ‍ুদ্র তার মাথার ওপর সে চুল খাড়া হয়ে আছে ব্যাঙের ছাতার মাথায় টুপির মতো। সমস্ত শরীরটা অতিরিক্ত শীর্ণ এবং দ‍ুর্বল, আর তার অভিব্যক্তিতে যে অসাধারণ একটি অদ্ভুত ভাব তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

সে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করল, "কী চান আপনি?"

ব্যাপার ব‍ুঝিয়ে বললাম তাকে, চোখ আস্তে আস্তে পিট পিট করে সে শ‍ুনল কথাগ‍ুলি, একবারও আমার ওপর থেকে দ‍ৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

আমি শেষে বললাম, "তাহলে নতুন একটা ধ‍ুরো কি পাব না? সানন্দে আমি তার দাম দেব।"

আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সে বলল, "কিন্তু কে আপনি? শিকারী, এ্যাঁ?"

"শিকারী।"

"আপনারা বোধহয় মোরগ মুরগীগুলি গুলি করে মারেন?... বনের জন্তু জানোয়ারও? ... কিন্তু ঈশ্বরের পাখিপাখালীদের মারা, নির্দোষ প্রাণীর রক্তপাত করা কি পাপ নয়?"

অদ্ভুত সেই বৃদ্ধ ভারি টানা টানা স্বরে কথা বলে। তার গলার স্বর শুনেও আমি অবাক হলাম। ওর মধ্যে বেশি বয়সের কোনো দৌর্বল্য নেই; স্বরটা চমৎকার মিষ্টি, তরুণ এবং প্রায় মেয়েদের মতো কোমল।

একটু নীরব থেকে সে বলল আবার, "আমার কোনো ধুরো নেই। ওটাতে আপনার কাজ চলবে না।" সে আঙুল দিয়ে তার গাড়িটা দেখাল। "আপনার বড়ো গাড়ি আছে মনে হয়।"

"গ্রামে কি ধুরো পাব?"

"এখানে গ্রাম তেমন কিছু নেই!... কারুই ধুরো নেই... তাছাড়া, বাড়িতেও নেই কেউ, সবাই কাজে গেছে।" তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল, "আপনাকে চলে যেতে হবে," এই বলে সে আবার শুয়ে পড়ল মাটিতে।

এ রকম একটি উপসংহার আমি আদৌ আশা করিনি।

তার কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, "এই বুড়ো, শোনো, একটি অনুগ্রহ করো আমাকে, একটু সাহায্য করো।"

"চলে যান, ঈশ্বরের দোহাই! আমি ক্লান্ত; আমি গাড়ি চালিয়ে শহরে গিয়েছিলাম।" এই বলে মাথার ওপর সে তার অঙ্গাবরণ টেনে দিল।

আমি বললাম, "একটি অনুগ্রহ করো, প্রার্থনা করছি। আমি ... আমি পয়সা দেব।"

"আপনার টাকা চাই না আমি।"

"কিন্তু দয়া করে তবু ..."

অর্ধেক উঠে সে বসল, সরু সরু পায়ের ওপর পা রেখে।

"আমি আপনাকে বন কেটে সাফ-করা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি হয়ত। কয়েকজন বণিক এখানকার বন কিনে নিয়েছে, — ঈশ্বর বিচার করবেন তাদের! বন তারা কেটে ফেলছে, ওখানে একটি হিসেব-ঘরও বানিয়েছে — ঈশ্বর

তাদের বিচার করবেন! ওখানে তাদের কাছে আপনি ধুরোর অর্ডার দিতে পারেন, কিংবা তৈরিও কিনে নিতে পারেন।"

খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "চমৎকার! চমৎকার! যাওয়া যাক, ওখানে।"

বুড়ো তার জায়গা থেকে না উঠে বলল ফের, "ওক কাঠের ধুরো, ভালো ধুরো।"

"জায়গাটি কি অনেক দূর?"

"দু মাইল।"

"তাহলে এসো! তোমার গাড়িতে চেপে যাওয়া যাবে ওখানে।"

"উঁহু, না।"

আমি বললাম, "চলো, যাই। যাওয়া যাক চলো, বুড়ো! রাস্তায় সহিস আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।"

বুড়ো উঠল অনিচ্ছায় এবং আমার পিছু পিছু এল রাস্তায়। সহিস মেজাজ খারাপ করে বসে আছে দেখলুম; ঘোড়াগুলিকে জল দেবার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু কূয়োর জল মনে হল অত্যন্ত সামান্য এবং স্বাদে নিকৃষ্ট, আর এই জল বস্তুটিই হচ্ছে সহিসদের প্রথম বিচার-বিবেচনার বিষয়... সে যাই হোক, বুড়োকে দেখে সে দাঁত বার করে হাসল, মাথা নেড়ে বলে উঠল, "এই যে, কাসিয়ান! বহাল তবিয়তে থাকো!"

অপ্রসন্ন হতাশ স্বরে কাসিয়ান জবাব দিল, "তোমার শরীর ভালো যাক, ইয়েরফেই, তুমি অকপট লোক!"

তৎক্ষণাৎ সহিসকে বললুম তার পরামর্শের কথা; ইয়েরফেই কথাটা অনুমোদন করে গাড়ি চালিয়ে গেল প্রাঙ্গণে। ধীর সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি থেকে ঘোড়া দুটোকে খুলতে লাগল যতক্ষণ, বুড়ো ততক্ষণ ফটকে কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ম্রিয়মাণ দৃষ্টিতে প্রথমে তার দিকে এবং তারপর আমার দিকে তাকাতে লাগল। মনে হচ্ছিল সে কী একটা অনিশ্চিত ভাবের মধ্যে আছে; আর মনে হল, আমাদের এই হঠাৎ এসে পড়ায় সে মোটেই খুশি নয়।

জোয়ালটা তুলে হঠাৎ ইয়েরফেই তাকে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে এখানেও তোমাকে বসিয়েছে ওরা?"

"হ্যাঁ।"

দাঁত চেপে সহিস বলল, "উহ্! তুমি তো ছুতোর মিস্ত্রী মার্তীনকে চেনো ... রিয়াবায়ার মার্তীন, নিশ্চয় চেনো?"

"হ্যাঁ।"

"সে মারা গেছে। এইমাত্র তার কফিন দেখে এলাম।"

কাসিয়ান শিউরে উঠল।

"মারা গেছে?" বলল সে, তার মাথাটি হতাশভাবে ঝুলে পড়ল।

"হ্যাঁ, মারা গেছে। তুমি তাকে ভালো করে দিলে না কেন, এ্যাঁ? লোকে বলে তো, তুমি লোকজনের রোগ সারিয়ে দাও; তুমি ডাক্তার।"

আমার সহিস স্পষ্টতই ঠাট্টা করছিল বুড়োকে, তাকে বিদ্রূপ করছিল।

তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওদিকে দেখিয়ে সে বলল, "আর ওই নাকি তোমার গাড়ি, অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, গাড়ি বটে ... চমৎকার গাড়ি!" দু'বার কথাটা বলে সে শাফ্‌ট ধরে ওটাকে এনে প্রায় সম্পূর্ণ উল্টে ফেলল। "গাড়ি একখানা!... কিন্তু বন-কাটা জমি পর্যন্ত কী করে যাবে?... এই শাফ্‌টে আমাদের ঘোড়া তো জুৎতে পারবে না, আমাদের ঘোড়াগুলো অনেক বড়ো।"

কাসিয়ান বলল, "জানি না আমি কী দিয়ে চালাব; ওই পশুটাকে দিয়ে বোধহয়," বলে সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল।

ইয়েরফেই বলে উঠল, "ওটা?" তারপর কাসিয়ানের টাট্টু ঘোড়াটার কাছে গিয়ে ডান হাতের অনামিকা দিয়ে ওটার পিঠে অত্যন্ত হেলায় অশ্রদ্ধায় টোকা মারল। অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "দেখো, ঘুমিয়ে পড়েছে কাগ-তাড়ুয়াটা!"

যত তাড়াতাড়ি পারে ওটাকে জুৎতে বললাম সহিসকে। কাসিয়ানকে নিয়ে বন প্রান্তের সাফ-জমিতে গাড়ি চালিয়ে আমি নিজেই যেতে চাইছিলাম; বনমোরগেরা এ রকম জায়গা খুব পছন্দ করে। ছোটো গাড়িটা প্রায় তৈরি হয়েছে, কুকুরটাকে নিয়ে আমি ওটার কঞ্চি আর দড়ি দিয়ে বোনা আসনে গিয়ে বসেছি, কাসিয়ান একটা ছোটো বলের মতো জবুথবু হয়ে আর মুখে সেই বিরস ভাবটি তখনো অপরিবর্তিত রেখে বসেছে সামনে এমন সময় ইয়েরফেই আমার কাছে এসে একটি রহস্যের ভঙ্গীতে ফিস ফিস করে বলল:

"ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠে খুব ঠিক কাজ করেছেন, হুজুর। ও এমন অদ্ভুত লোক, মাথা খারাপ লোক, বুঝলেন, আর ওর ডাকনাম হচ্ছে পিস্‌। কী করে যে ওকে খুঁজে বার করলেন দেখে, জানি না আমি ..."

ইয়েরফেইকে বলতে চেষ্টা করলাম যে এতাবৎ কাসিয়ানকে তো আমার বেশ কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন লোক বলেই মনে হয়েছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সহিসটি একই স্বরে বলতে লাগল আবার:

"কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন কোথায় ও আপনাকে নিয়ে যায়। আর হুজুর ধুরোটা আপনি নিজে দেখে পছন্দ করবেন; দয়া করে ভালো দেখে নেবেন একটি ..." তারপর সে জোরে বলে উঠল, "আচ্ছা, পিস্‌, তোমার বাড়িতে কি এক টুকরো রুটি পাওয়া যাবে?"

কাসিয়ান জবাবে বলল, "খুঁজে দেখো; পেতে পারো।" গাড়ির রাশ টেনে ধরল সে, আমরা চললুম।

আমি বাস্তবিকই অবাক হয়ে দেখলুম, তার ছোটো ঘোড়াটা মোটেই খারাপ চলছে না। সারা পথ কাসিয়ান একেবারে চুপ করে রইল জেদ করে, আমার প্রশ্নের উত্তর করল সংক্ষিপ্ত খাপছাড়াভাবে, অনিচ্ছায়। তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছে গেলুম বন-কাটা জমিতে, তারপর গেলাম হিসেব-ঘরে, সেটি একটি খড়ে-ছাওয়া উঁচু ঘর, একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটো একটি প্রণালীর ওপরে, সেটিকে বন্ধ করে দিয়ে একটি ডোবায় পরিণত করা হয়েছে। এই হিসেব-ঘরে দেখা পেলুম দুজন কেরাণীর, তাদের দাঁত তুষারের মতো শাদা, কোমল মধুর চোখ, সূক্ষ্ম এবং মিষ্ট কথাবার্তা এবং চতুর ও মিঠা হাসি। তাদের কাছ থেকে একটি ধুরো কিনে ফিরে এলাম সাফ-জমিতে। ভেবেছিলাম কাসিয়ান ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে আমার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করবে, কিন্তু সহসা সে চলে এল আমার কাছে।

বলল, "পাখি মারবেন নাকি, অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ, যদি পাই।"

"আপনার সঙ্গে আসব আমি?... আসতে পারি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

আমরা একত্রেই গেলাম। সাফ-করা জমিটা লম্বায় প্রায় এক মাইল হবে। আমি স্বীকার করছি, কুকুরের চেয়ে বেশি করে লক্ষ্য করছিলাম কাসিয়ানকে।

তার "পিস্‌" ডাকনাম খুব উপযুক্তই হয়েছে। তার ছোটো অনাবৃত কালো মাথাটা (অবশ্য তার চুলগুলো বাস্তবিক এমন যে, তা টুপির মতোই মাথাটি ঢেকে দিতে পারে) ঝোপঝাড়ের মধ্যে এদিকে ওদিকে যেন চকমক করে ছুটে বেড়াচ্ছে। অসাধারণ দ্রুতভাবে সে হাঁটছিল, আর মনে হচ্ছিল চলবার সময় সে উঁচু-নিচু হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে; কোনো একটি ওষধি গাছ গাছড়া তুলে নেবার জন্য সদাই সে নুয়ে নুয়ে পড়ছে, তা তুলে নিয়ে বুকের কাছে রাখতে রাখতে নিজের মনে বিড় বিড় করছে, আর অদ্ভুত একটি অনুসন্ধানের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাকে এবং আমার কুকুরকে। ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়ের মধ্যে এবং ঝোপ কেটে পরিষ্কার করা জায়গায় প্রায়ই পাওয়া যায় ছোটো ছোটো ধূসর বর্ণের পাখি, অনবরত তারা গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় আর চট করে ছুটতে ছুটতে শিস্ দেয়। কাসিয়ান ওদের সুর অনুকরণ করে, তাদের ডাকে সাড়া দেয়: একটা বাচ্চা ভারুই পাখি তার দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে উড়ে গেল কিচমিচ করতে করতে, আর তার নকল করে সেও কিচমিচ করে উঠল; একটি চাতক তার মাথার উপর দিয়ে আকাশ থেকে নিচে উড়ে আসতে লাগল, আসতে আসতে পাখা নেড়ে নেড়ে গান গাইতে লাগল মিঠা মধুর স্বরে; কাসিয়ান তার গানের সঙ্গেও যোগ দিল। আমার সঙ্গে সে আদৌ কোনো কথাই বলল না...

আবহাওয়া আশ্চর্য চমৎকার, আগের চাইতেও ভালো; কিন্তু গরমও কিছু কম নয়। দূরে ঊর্ধ্বে স্বচ্ছ আকাশে উঁচু উঁচু পাতলা মেঘস্তবক প্রায় নড়ছে না, সে মেঘ দেখতে হলদে-শাদা, বিলম্বিত বসন্তের পতিত তুষারের মতো, মেঘগুলি চেপটা, টানা টানা, গোটানো পালের মতো। ধীরে ধীরে কিন্তু টের পাওয়া যায় এমন তুলার আঁশের মতো নরম ও মোলায়েম এই মেঘখণ্ডগুলির প্রান্তভাগ প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, গলে গলে যাচ্ছে, এমন কি এই মেঘগুলিও, আর কোনো ছায়া পড়ছে না তা থেকে। অনেকক্ষণ সেই সাফ করা জায়গাটায় কাসিয়ানকে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়ালাম। তরুণ অংকুরগুলি এখনো এক গজের বেশি মাথা তুলতে পারেনি, তবু ওদের মোলায়েম সুকুমার বৃন্ত দিয়ে নিচু কালো হয়ে যাওয়া ছিন্ন-কাণ্ড বৃক্ষমূলগুলিকে ঘিরে রয়েছে: আর ধূসর কোণওয়ালা স্পঞ্জের মতো ব্যাঙের ছাতা — যা দিয়ে চকমকির শোলা তৈরি করা হয়ে থাকে — লেগে রয়েছে ওগুলির গায়ে গায়ে; স্ট্রবেরির

চারাগন্নলি ওদের ওপর দিয়ে গোলাপী লতাতন্তু ছড়িয়ে দিয়েছে; একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে থোকায় থোকায় ব্যাঙের ছাতা। অনবরত পা বেধে যায় ঝলসানো রোদে শন্নকিয়ে যাওয়া লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে; চারদিকে গাছের কচি লালচে রাশি রাশি পাতার ঝকঝকে ধাতব দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যায়; চতুর্দিকে নানা বর্ণে বর্ণময় মন্নগকলাই-এর নীল গন্নচ্ছ, রক্ত-ওকড়ার সোনালী কলকে, এবং "হার্টস ইজ"-এর আধা-শাদা আধা-হলন্দ ফুলগন্নলি। অব্যবহৃত পথের ওপর ছোটো ছোটো লাল ঘাসের ওপর রেখায় রেখায় অঙ্কিত রয়েছে গাড়ির চাকার চিহ্ন, এই পথগন্নলোর কাছে উঁচু করে রাখা হয়েছে অজস্র কাঠের স্তন্নপ, এক একটা কাঠ লম্বা এক গজ করে, হাওয়ায় বৃষ্টিতে কাঠগন্নলি কালো হয়ে গেছে; এই স্তন্নপ থেকে তেরছাভাবে আয়ত ছায়া পড়েছে আবছা হয়ে; অন্য কোথাও কোনো ছায়ার লেশমাত্র নেই। ঝিরঝিরে হাওয়া উঠল একটু, তারপর পড়ে গেল আবার; হঠাৎ তা সোজা এসে বইছে মন্নখের উপর, মনে হয় উঠছে বন্নঝি হাওয়া; চারদিকে সবকিছন্ন মর্মরিত হতে শন্নরন্ন করবে আনন্দে, মাথা নাড়াতে, শিহরিত হতে শন্নরন্ন করবে; ফার্ণ গাছের নমনীয় শীর্ষ ভারি সন্নন্দর করে মাথা নোয়ায়, দেখে বড়ো ভালো লাগে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা আবার থেমে যায়, আবার সবকিছন্ন শান্ত স্থির। কেবল ফড়িংয়েরা তারস্বরে একত্রে কিচকিচ করে, আর ক্লান্তি আসে এই অবিশ্রান্ত, তীক্ষ্ন, নীরস শব্দ শন্নুনে শন্নুনে। মধ্যাহ্নের এই অবিচল উত্তাপের সঙ্গে তার একটি সঙ্গতি আছে,' মনে হয় উত্তাপের সঙ্গে তা সম্পর্কিত, যেন গনগনে মাটি থেকে তাকে টেনে বার করে আনা হচ্ছে।

একটিও পাখির ঝাঁককে চকিত না করে আমরা শেষ পর্যন্ত আর একটি সাফ জমিতে পেঁৗছলাম। ওখানে আস্পেন গাছগন্নলি এই সেদিন কাটা হয়েছে, সকরন্নণভাবে পড়ে রয়েছে মাটিতে, নিচে পিষে গেছে ঘাস এবং অন্যান্য ছোটো খাটো তরন্নলতা। কতকগন্নলো গাছ মরে গেলেও পাতা এখনো সবন্নজ, স্তব্ধ শাখা প্রশাখা থেকে তারা ঝুলে রয়েছে আলগোছে; অন্যান্য গাছগন্নলোতে পাতা সব চেপ্‌টে গিয়ে শন্নকিয়ে গেছে। গাছের কাটা গোড়ার চারদিকে স্তন্নপীকৃত হয়ে পড়ে আছে টাটকা শ্বেত-সোনালী চিলতে কাঠ, গোড়াগন্নলো

ভোঁতা আওয়াজ, আর মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে, চতুর্দিকে বাহু প্রসারিত করে একটা ঝোপড়া গাছ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে জমকাল ভঙ্গীতে।

বহুক্ষণ ধরে একটি পাখিও পড়েনি চোখে, অবশেষে চারদিকে সোমরাজ গজানো তরুণ ওক গাছের একটা ঝাড় থেকে উড়ে এল একটি কর্ণক্রেক। গুলি করলাম; পাখিটা আকাশে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। গুলির আওয়াজে কাসিয়ান তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল, আমার বন্দুকে আবার গুলি ভরে পাখিটাকে তুলে না নেওয়া পর্যন্ত সে নড়ল না। আমি আর একটু এগিয়ে যেতে সে গেল আহত পাখিটা যেখানে পড়েছিল সেই জায়গায়, ঘাসে ছড়িয়ে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা রক্ত, ওখানে নুয়ে পড়ে মাথা নাড়ল, দুঃখের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল... পরে তাকে ফিস ফিস করে বলতে শুনেছি, "পাপ!... আহা, এ একটা পাপ, হ্যাঁ!"

গরমে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা গেলুম বনের মধ্যে। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম একটি উঁচু বাদামের ঝোপের নিচে, তার উপর একটি চিকন তরুণ মেপল গাছ মনোরম করে পাতলা শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। কাসিয়ান গিয়ে বসল কেটে ফেলা একটি বার্চ গাছের মোটা কাণ্ডের ওপর। আমি তাকালাম তার দিকে। মাথার উপরে পত্ররাশির মৃদু মর্মর, তাদের হরিৎ ছায়া সঞ্চালিত হচ্ছে এদিকে ওদিকে কালো কোটে ঢাকা তার দুর্বল দেহের ওপর দিয়ে, তার ক্ষুদ্র মুখমণ্ডলের ওপর দিয়ে। মাথা তুলল না সে। তার নীরবতায় বিরক্ত হয়ে আমি শুয়ে পড়লাম চিৎ হয়ে, বহু দূরের উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিকায় জড়ানো পত্রাঙ্কুরের শান্ত সঞ্চালন দেখে তারিফ করতে লাগলাম। বনের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে ঊর্ধ্বে আকাশ পানে তাকিয়ে থাকা অদ্ভুত চমৎকার মধুর একটি বৃত্তি! মনে হয়, তাকিয়ে রয়েছেন অতল সমুদ্রের মধ্যে; সেই সমুদ্র বিস্তৃত হয়ে প্রসারিত হয়ে গেছে আপনার থেকে নিচে পর্যন্ত; কল্পনা করা যায় যে, গাছগুলি মাটি থেকে উঠছে না, বরং বিশাল কতকগুলো আগাছার শিকড়ের মতো পড়ে যাচ্ছে—পড়ছে এসে সোজা এই মসৃণ স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন গভীরতার মধ্যে; গাছের পাতাগুলি এক মুহূর্তে পান্নার মতো স্বচ্ছ, আবার পরক্ষণে তারা ঘন হয়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে সোনালী, প্রায় কালো নিবিড় সবুজে। দূরে কোথাও, একটি সরু শাখার ডগায় একটিমাত্র পাতা স্বচ্ছ আকাশের নীল টুকরোটির পটে ঝুলে রয়েছে নিশ্চল হয়ে, আর ওটির পাশে

বঁড়শী-গাঁথা মাছের চলার মতো করে কাঁপছে আর একটি পাতা, যেন বাতাসের স্পর্শে নয়, কাঁপছে আপন খুশিতে। গোল শাদা মেঘ শান্তভাবে ভেসে যাচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে, নদীতে ডোবা ঐন্দ্রজালিক দ্বীপের মতো উধাও হয়ে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ এই সমুদ্র, এই ঝকঝকে হাওয়া, সূর্যালোকে মাখা এই শাখা প্রশাখা পত্ররাশি — সবকিছু তরঙ্গিত হয়ে উঠছে, অস্থায়ী একটি দীপ্তিতে শির শির করে উঠছে, আর অকস্মাৎ চমকে-ওঠা জলের পাকের ক্ষুদ্র নিরবচ্ছিন্ন ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মতো একটি নতুন কম্পমান ফিসফিসানি শোনা যায়। না নড়ে চড়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয় শুধু, আর হৃদয়ে তখন কী যে শান্তি, কী যে আনন্দ, কী যে একটি মধুরতা বিরাজ করতে থাকে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাকিয়ে দেখুন: গভীর নির্মল নীলিমা তার নিজেরই মতো পবিত্র সরল একটি হাসি জাগিয়ে তোলে দর্শকের ঠোঁটে; আকাশে মেঘের মতো, আর যেন সেই মেঘেরই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের কন্দরে সুখস্মৃতিগুলি শোভাযাত্রার মতো আসে যায়, তবু মনে হয় দৃষ্টি যেন আরো, আরো গভীরে চলে যাচ্ছে, ওই শান্তিময়, উজ্জ্বল অসীমের মাঝে যেন নিয়ে যাচ্ছে, তারপর সেই তুঙ্গ সেই গভীর অসীমের থেকে যেন নিজেকে আর নামিয়ে আনা যায় না...

সহসা কাসিয়ান তার সুরেলা স্বরে বলে উঠল, "হুজুর, কর্তা!"

অবাক হয়ে উঠলাম: তখন পর্যন্ত সে আমার কথার প্রায় জবাব দেয়নি, আর এখন নিজে থেকে ডাকল আমাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী?"

সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আপনি কেন মারলেন পাখিটাকে?"

"কেন আবার? কর্ণক্রেক তো শিকার; ও খাওয়া চলে।"

"কিন্তু হুজুর, ও জন্যে আপনি মারেননি পাখিটাকে, যেন সত্যি আপনি খাবেন! আপনি মেরেছেন ফূর্তির জন্য।"

"আচ্ছা, আমার ধারণা তুমি নিজেও তো হাঁস-মুরগী খাও?"

"ও পাখিগুলো মানুষকে দেন ঈশ্বর, কিন্তু কর্ণক্রেক বনের জংলা পাখি; শুধু সে নয়; আরো আছে অনেক, বনের আর প্রান্তরের জীবজানোয়ার, নদীর, ঝিলের, বাদার জীবেরা, তাদের কেউ ওপরে উড়ে চলে আবার কেউ বা থাকে

নিচে তলিয়ে, ওদের হত্যা করা পাপ; পৃথিবীতে ওদের বাঁধা জীবনে বেঁচে থাকতে দিন। মানুষের জন্য আলাদা অন্নসংস্থান করে দেওয়া হয়েছে; তার খাওয়ার অন্য জিনিস একটি তাকে টিকিয়ে রাখে: 'ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট দান রুটি, আর স্বর্গ থেকে দেওয়া জল, আর পোষা পশুগুলো, যারা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাল থেকে এসেছে আমাদের কাছে।"

আশ্চর্য হয়ে আমি তাকালাম কাসিয়ানের দিকে। গর গর করে বলে গেল কথাগুলো, কোনো একটা কথা খুঁজে পাবার জন্য সে ইতস্তত করেনি; কথাগুলি বলল একটি শান্ত প্রেরণা নিয়ে একটি ভদ্র মর্যাদার সঙ্গে, বলতে বলতে মাঝে মাঝে সে চোখ বুজছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে তোমার মতে মাছ মারাও পাপ?"

বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সে জবাব দিল, "মাছেদের রক্ত ঠান্ডা। মাছ মূক প্রাণী; সে ভয়ও জানে না, আনন্দও জানে না। মাছের ভাষা নেই, গলার আওয়াজ নেই। মাছ অনুভবও করে না কিছু; মাছের রক্ত জীবন্ত নয় ..." একটু থামল সে, তারপর আবার বলে চলল, "রক্ত পবিত্র জিনিস! এমন কি সূর্য পর্যন্ত রক্তের দিকে তাকায় না; আলো থেকে তা আড়ালে থাকে... দিনের আলোয় রক্ত এনে প্রকাশ করে দেওয়া মহাপাপ; মহাপাপ আর ভয়ঙ্কর ব্যাপার... আহ্, মহাপাপ একটা!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, মাথাটি তার ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। আমি স্বীকার করছি, সেই অদ্ভুত বুড়োর দিকে তাকিয়ে রইলাম একেবারে পরিপূর্ণ স্তব্ধ বিস্ময়ে। ভাষা তার চাষীদের মতো মনে হয় না মোটেই; সাধারণ লোক ও রকম করে কথা কয় না, যারা কথায় চমক লাগাতে চায় তারাও না। তার কথা ছিল চিন্তাপূর্ণ গম্ভীর এবং অদ্ভুত... এ রকম কথা আমি শুনিনি কখনো।

তার অল্প রক্তিম মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে আমি শুরু করলাম, "আচ্ছা, কাসিয়ান, বলো না, তোমার পেশা কী?"

সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। এক মুহূর্ত অস্বস্তিভরে তার চোখ দুটির দৃষ্টি ঘুরে বেড়াল এদিক ওদিক।

অবশেষে বলল, "ঈশ্বর যেমন হুকুম করেন তেমনি জীবন যাপন করি আমি; আর পেশার কথা—না, কোনো পেশা নেই আমার। ছোটোবেলা থেকেই কোনোদিনই আমি চতুর ছিলাম না; যখন পারি কাজ করি; খুব কিছু

একজন মজুর কারিগরও আমি নই — কী করে হব? স্বাস্থ্য আমার ভালো নয়, হাতগুলোও বিশ্রী। কিন্তু বসন্তে আমি নাইটিঙ্গেল ধরি।"

"নাইটিঙ্গেল ধরো তুমি?... কিন্তু তুমিই বললে না যে, বন প্রান্তরের কোনো জংলী জীবকে স্পর্শ করতে নেই?"

"ওদের মারতে নেই অবশ্যই; না মারলেও মৃত্যু তার শিকার নেবেই। এই দেখুন ছুতোর মিস্ত্রী মার্তীন, মার্তীন বেঁচে ছিল, খুব বেশি দিনেরও নয় তার জীবন, কিন্তু মরে গেল সে; তার বউ এখন স্বামীর জন্য বিলাপ করে, ছোটো ছেলেমেয়েগুলির জন্য দুঃখ করে ... মানুষ হোক, পশু হোক, মৃত্যুর বিরুদ্ধে কারু কোনো মন্ত্র নেই। মৃত্যু ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে না, কিন্তু তার হাত থেকে রেহাই নেই; মৃত্যুর আবার সহায়তা করা অনুচিত... আর নাইটিঙ্গেল মারি না আমি — না করুন ঈশ্বর! তাদের ক্ষতি করার জন্য ধরি না, জীবন নষ্ট করে দেবার জন্য ধরি না, ধরি মানুষের আমোদের জন্য, তাদের আরাম ও আনন্দের জন্য।"

"কুরস্কে যাও নাকি নাইটিঙ্গেল ধরতে?"

"হ্যাঁ, যাই কুরস্কে, মাঝে মাঝে আরো দূরেও যাই। রাত কাটাই জলাভূমিতে কিংবা বনের প্রান্তে; রাত্রিতে মাঠে প্রান্তরে, ঝোপে ঝাড়ে একলা থাকি; বক ডাকে, খরগোস কুঁ-কুঁ করে, বুনো হাঁস গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে... সন্ধ্যায় তাদের আমি লক্ষ্য করি; সকালে কান পেতে দিই ওদের দিকে; দিনে ঝোপের ওপর জাল বিছিয়ে দিই... এমন অনেক নাইটিঙ্গেল আছে যারা এমন করুণ মধুর সুরে গান গায়!... হ্যাঁ, হ্যাঁ, করুণ সুরে।"

"তারপর ওগুলি বেচো?"

"ভালো ভালো লোকদের দিয়ে দিই।"

"তাছাড়া তুমি কী করছ?"

"কী করছি?"

"হ্যাঁ, কী কাজে আছো?"

একটুক্ষণ নীরব রইল বুড়ো।

"আমার আদৌ কোনো কাজকর্ম নেই... খারাপ মজুর আমি। কিন্তু লিখতে পড়তে জানি।"

"পড়তে জানো তুমি?"

"হ্যাঁ, পড়তে এবং লিখতে জানি। ঈশ্বরের কৃপায় আর ভালো লোকেদের সহায়তায় শিখেছি।"

"পরিবার আছে তোমার?"

"না, কোনো পরিবার নেই।"

"তার মানে?... তবে কি তারা মারা গেছে?"

"না কিন্তু... জীবনে আমার ভাগ্য কখনো সুপ্রসন্ন ছিল না; কিন্তু সবই ঈশ্বরের হাত; আমরা সবাই ঈশ্বরের হাতে; মানুষের কেবল ন্যায়পরায়ণ হতে হবে—ব্যস, আর কিছু নয়! তার মানে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায়নিষ্ঠ থাকতে হবে আর কি।"

"তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই?"

"আছে... মানে..."

বৃদ্ধ কী রকম বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

আমি বললাম, "আমাকে বলো তো দয়া করে, আমার সহিস তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিল তুমি মার্তীনকে সারিয়ে তুললে না কেন, আমি শুনেছি সে কথা। তুমি কি রোগ সারাও?"

কাসিয়ান চিন্তা করে জবাব দিল, "আপনার সহিস ন্যায়পরায়ণ লোক, কিন্তু একেবারে পাপশূন্যও নয়। আমাকে লোকে ডাক্তার বলে। ডাক্তার বটে! আর রোগীকে সারাতে পারে কে? ও তো সবই ঈশ্বরের দান। কিন্তু কিছু কিছু... হ্যাঁ, কিছু কিছু ওষধি-শেকড় আছে, কিছু ফুল-টুলও আছে বৈকি; সেগুলো কাজ দেয় অবশ্য। যেমন ধরুন প্লেনটেন, মানুষের পক্ষে উপকারী ওষুধ; কুঁড়ি-গাঁদাও আছে; ওগুলো সম্পর্কে কথা বলা মোটেই পাপ নয়: ওগুলো ঈশ্বরের পবিত্র ওষধি গাছগাছড়া শেকড়-বাকড়। আরো কিছু আছে যা ও রকম নয়; সেগুলো কাজে লাগতে পারে, কিন্তু কাজে লাগানো পাপ; আর ওগুলো সম্পর্কে কথা বলাও পাপ। তবে অবশ্য প্রার্থনা করে নিলে হয়ত... আর সত্যি এমন কথা যে আছে তাতে সন্দেহ নেই... কিন্তু বিশ্বাস যার আছে সে-ই রক্ষা পাবে।" এই শেষ কথাটা বলল সে স্বর নামিয়ে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মার্তীনকে তুমি কিছুই দাওনি?"

বুড়ো জবাব দিল, "কথাটা শুনলাম অনেক দেরীতে, তখন আর করার ছিল না কিছু। কিন্তু তাই বা কী! প্রত্যেকটি লোকেরই পরিণাম লেখা হয়ে

যায় জন্মের সময়। ছুতোর মিস্ত্রী মার্তীনের বাঁচবার কথা নয়; মানে, এই পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকবার কথা নয়। না, এ পৃথিবীতে যখন কোনো মানুষের বেঁচে থাকার কথা নয়, তখন সূর্যরশ্মি তাকে অপর আর একজনের মতো করে উষ্ণ করে তোলে না, রুটি তাকে পুষ্টি দেয় না, সবল করে না তাকে; যেন কিছু একটা তাকে দূরে টেনে নিয়ে যায় ... হ্যাঁ, ঈশ্বর তার আত্মার শান্তি দিন!"

একটুকাল থেমে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাদের এখানে তুমি কি অনেকদিন হল আছো?"

কাসিয়ান চমকে উঠল।

"না, বেশি দিন নয়, চার বছর প্রায়। বুড়ো কর্তার আমলে আমরা বরাবর আমাদের পুরানো বাড়িতেই থেকেছি, কিন্তু জিম্মেদাররা আমাদের এখানে এসে বসতি করতে বাধ্য করল। আমাদের বুড়ো কর্তা সদয় ছিলেন, শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন—স্বর্গ লাভ হোক তাঁর! জিম্মেদাররাও নিঃসন্দেহে ন্যায্য বিচার করেছে।"

"আগে তুমি ছিলে কোথায়?"

"সুন্দর ঝরণায়।"

"সেটা এখান থেকে অনেক দূর?"

"ষাট মাইল।"

"আচ্ছা, সেখানে কি ভালো ছিলে এর চেয়ে?"

"হ্যাঁ ... হ্যাঁ, তা, ওখানটা ছিল খোলা মাঠের দেশ, নদী ছিল; আমাদের দেশ ছিল ওখানে; এখানে আমরা জড়োসড়ো হয়ে আছি, শুকিয়ে রয়েছি... এখানে আমরা ভিনদেশী। ওখানে, সুন্দর ঝরণায় তো পাহাড়ে চড়া যেত!—তারপর আহা, কী বলব, কী দৃশ্যই না দেখা যেত! স্রোতস্বিনী, মাঠ আর বন, আর একটি গির্জা, আর তারপর তা ছাড়িয়ে আরো আরো মাঠ। দূর, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত। হ্যাঁ, যতদূর চোখ যায় দেখুন — দেখুন আর দেখুন, আহ্, হ্যাঁ! এখানে অবশ্য জমি ভালো, জমি এখানে কাদা — চমৎকার পুরু কাদামাটি, বলে চাষীরা; আমার কাছে অবশ্য সব জায়গাতেই শস্য ভালোই জন্মায়।"

"বলো তো বুড়ো, নিজের জন্মস্থানে আবার যেতে চাও?"

"হ্যাঁ, দেখতে চাই। অবশ্য, সব জায়গাই ভালো। আমি পরিবার পরিজনহীন একা মানুষ, চঞ্চল মানুষ। আর তাছাড়া, বাড়িতে বসে খুব বেশি কি লাভ হয়, বলুন না? কিন্তু দেখুন! যত আপনি হাঁটবেন, যত হাঁটবেন," বলে গলা চড়িয়ে আবার বলে চলল সে, "হৃদয় লঘু হয়ে যাবে, সত্যি। আর সূর্য কিরণ ঝরে পড়বে আপনার ওপর, আর আপনি থাকবেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, আর গানটা আরো মধুর হয়ে ওঠে। এখানে আপনি দেখবেন — কোন ওর্ষধিটা জন্মাচ্ছে; তাকিয়ে থাকবেন তার দিকে — তারপর তুলে নেবেন সেটা। এখানে জল ছুটে চলে, বোধহয় ঝর্ণার জল, নির্মল পবিত্র জলের উৎস; তা থেকে আপনি খাবেন — তার দিকে তাকিয়েও থাকবেন। স্বর্গের পাখিরা গান গায়।... আর কুরস্ক ছাড়িয়ে স্তেপভূমি সেই স্তেপের দেশ; আহা, কী চমৎকার, মানুষের পক্ষে কী আনন্দ! কী মুক্তি, ঈশ্বরের কী আশীষ! আর লোকে বলে, সেই স্তেপভূমি চলে গেছে এমন কি উষ্ণ সাগর পর্যন্ত যেখানে মিঠা-স্বরের পাখি হামায়ন বাস করে, যেখানে গাছ থেকে পাতা পড়ে না, হেমন্তেও পড়ে না, শীতেও না, আর সোনার আপেল ফলে রূপোর পাখায়, যেখানে প্রত্যেক মানুষ বাস করে সুখে আর ন্যায়পরায়ণভাবে। আর আমি এমন কি সেখানে পর্যন্ত যেতে চাই... ইতিমধ্যেই কি তেমন সামান্য ভ্রমণ করেছি! রোমনিতে গেছি, সুন্দর নগর সিমবির্স্কে গেছি, এমন কি সোনার গম্বুজের নগরী মস্কোয়ও গেছি; ধাইমা অকার কাছে গেছি, কপোতী ত্‌স্‌নায় গেছি, ভোলগা মা'র কাছে গেছি, আর দেখেছি অনেক লোক, অনেক সৎ খ্রীষ্টান, দেখেছি অনেক বিপুল মহৎ নগরী... আর, আমি আরো ওদিকে যাব... হ্যাঁ... আরও... আর আমি শুধু একলা নই, আমি তো একটা হতভাগ্য পাপী... আরো অনেক খ্রীষ্টভক্ত যান বাস্টের জুতো পরে, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন সত্যের অনুসন্ধানে, হ্যাঁ! ... কারণ বাড়িতে আছে কী? মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার অভাব — এই মাত্র।"

শেষ কথাগুলো কাসিয়ান বলল দ্রুত, প্রায় অবোধ্য করে; তারপর বলল আরো কিছু যা আমি একেবারেই ধরতে পারলুম না, আর তার মুখে একটি ভাবের অভিব্যক্তি খেলে গেল যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মনে পড়ল "মাথা খারাপ" কথাটি। তারপর সে চোখ নিচু করল, গলা পরিষ্কার করল, যেন আত্মস্থ হয়েছে বলে মনে হল।

নিম্ন স্বরে বিড় বিড় করে বলল, "কী রোদ! হে ঈশ্বর, এ আপনার আশীর্বাদ! বনে কী উষ্ণতা!"

কাঁধ নাড়াল একটু, নীরব হয়ে গেল। চারদিকে একবার অনির্দিষ্টভাবে তাকিয়ে মৃদু স্বরে গান গাইতে শুরু করল। তার ধীর সঙ্গীতের সব কথা আমি ধরতে পারলুম না, শুনলাম এই:

"ওরা আমায় বলে কাসিয়ান
কিন্তু ডাকনাম আমার পিসু।"

আমি ভাবলাম, "ওহ্, ও দেখি উপস্থিত-মতো কবিত্বও প্রকাশ করে।" হঠাৎ সে চমকে উঠে গান বন্ধ করল, নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল বনের একটি নিবিড় অংশের দিকে। আমি ঘুরে দেখলাম একটি ছোটো চাষী মেয়ে, বয়স প্রায় আট, পরনে নীল ফ্রক, মাথার ওপর একটি ডোরাকাটা রুমাল, তার ছোটো অনাবৃত রোদে-পোড়া হাতে গাছের ছাল দিয়ে বোনা ঝুড়ি। আমাদের দেখবে সে নিশ্চয়ই আশা করেনি; সে, যাকে কথায় বলে "হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে" আমাদের ওপর; বাদাম গাছের ঘন পত্রাঙ্কুরের মধ্যে একটি ছায়াভরা নিভৃত স্থানে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল আমার দিকে তার কালো চোখের বিব্রত দৃষ্টি মেলে। তাকে এক ঝলক দেখে নেবারও সময় প্রায় পেলাম না; একটা গাছের আড়ালে সে সরে গেল সুরুৎ করে।

বুড়ো আদর করে ডাকতে লাগল, "আন্নুশকা! আন্নুশকা, আয় এখানে, ভয় পাস না!"

সরু তীক্ষ্ম গলায় জবাব এল, "আমার ভয় করছে।"

"ভয় পাস না, ভয় পাস না, আমার কাছে আয়।"

আন্নুশকা নীরবে লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এল, মৃদু মন্থর পায়ে ঘুরে এল—তার ছোটো শিশুর পায়ে পুরু ঘাসে প্রায় কোনো শব্দই হল না—ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল বুড়োর কাছে। তার বেঁটে চেহারা দেখে প্রথমে আমার যা মনে হয়েছিল তা নয়, বয়স তার আট বছর নয়, তেরো চোদ্দ হবে। সারা দেহটি ক্ষুদ্র এবং শীর্ণ, কিন্তু ভারি পরিচ্ছন্ন ও মনোরম, আর তার ছোটো সুশ্রী মুখখানার সঙ্গে কাসিয়ানের মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য, অবশ্য

কাসিয়ানকে সুপুরুষ বলা যায় না। কিন্তু দুজনের নাক মুখ চোখে একই শীর্ণতা, একই রকম অদ্ভুত ভাবের অভিব্যক্তি, একই রকম লাজুক এবং বিশ্বস্ত ভাব, বিষণ্ণ এবং চতুর, আর মেয়েটির ভঙ্গিমাও অবিকল কাসিয়ানেরই মতো... কাসিয়ান ওর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল; মেয়েটি গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে।

কাসিয়ান জিজ্ঞাসা করল, "কী, ব্যাঙের ছাতা তুলছিলি?"

লাজুক হেসে মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ।"

"অনেক পেয়েছিস নাকি?"

"হ্যাঁ।" (অলক্ষ্যে সে একবার কাসিয়ানের দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করে হাসল আবার।)

"সাদা ব্যাঙের ছাতা আছে?"

"হ্যাঁ।"

"দেখা তো দেখি, দেখা তো..." (মেয়েটি হাত থেকে ঝুড়িটি নামিয়ে প্রকাণ্ড লম্বা পাতাটা অর্ধেক তুলল, এটা দিয়েই ব্যাঙের ছাতাগুলো ঢাকা।) কাসিয়ান বলল, "আহা!" ঝুড়ির উপর নুয়ে পড়ে, "বাঃ, কী চমৎকার! বেশ করেছিস আন্নুশকা!"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এটি তোমার মেয়ে, কাসিয়ান, নয়?" (আন্নুশকার মুখখানা সামান্য একটু রক্তিম হয়ে উঠল।)

কাসিয়ান জবাব দিল কৃত্রিম অনাসক্তিতে আর ঔদাসীন্যে, "না, মানে, আত্মীয়া আমার।" সঙ্গে সঙ্গে সে বলল আরো, "এই যে আন্নুশকা, দৌড়ো এই বেলা, ছুটে যা, ঈশ্বর তোর সহায় হোন! আর দেখ, সাবধান!"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু ও পায়ে ছুটে যাবে কেন? আমাদের সঙ্গেই তো নিয়ে যেতে পারি।"

আন্নুশকা পপির মতো লাল হয়ে উঠল, দু'হাত দিয়ে ঝুড়ির দড়ি-বাঁধা হাতল আঁকড়ে ধরে বুড়োর দিকে ত্রাসের দৃষ্টিতে তাকাল।

কাসিয়ান সেই একই উদাসীন ও দুর্বল মন্থর স্বরে জবাব দিল, "না, ও ঠিক চলে যাবে এখন। কেন যাবে না?... ঠিক গিয়ে পৌঁছুবে... দে ছুট এবার।"

আন্নুশকা দ্রুতগতিতে চলে গেল বনের মধ্যে, কাসিয়ান তাকাল ওর দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে হাসল আপন মনে। এই বিলম্বিত হাসিটিতে,

আন্‌নুশকাকে সে যে কটা কথা বলেছে তার মধ্যে, আর কথা বলার সময় তার গলার স্বরটিতেও ছিল একটি সুতীব্র, অবর্ণনীয় ভালোবাসা আর মমতা। মেয়েটি যে দিকে গেছে সেদিকে সে আবার তাকাল, আবার হাসল আপন মনে, তারপর মুখের ওপর হাত বুলিয়ে মাথা নাড়ল কয়েকবার।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ওকে এত তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলে কেন? ওর ব্যাঙের ছাতাগুলো কিনে নিতুম আমি।"

"যদি চান তো বাড়িতেও কিনতে পারবেন স্যার।" জবাব দিতে গিয়ে কাসিয়ান এই সর্বপ্রথম আমাকে পোশাকী "স্যার" বলে সম্বোধন করল।

"তোমার মেয়েটি কিন্তু ভারি সুশ্রী মেয়ে।"

"না... এই চলনসই মাত্র," সে জবাব দিল যেন নেহাৎ অনিচ্ছায়, আর সেই মুহূর্ত থেকে সে ঠিক প্রথম দিককার মতো আলাপ না করার মেজাজে ফিরে গেল।

বুঝলাম তাকে আবার কথা কওয়ানোর সব চেষ্টাই নিষ্ফল হবে, বুঝে আমি সরে গেলুম সাফ জমিতে। ইতিমধ্যে গরম কমেছে কিছুটা; কিন্তু আমার মন্দ ভাগ্য বদলাল না, বসতিতে ফিরে এলুম একটি মাত্র কর্ণক্রেক আর নতুন ধুরোটি শুধু নিয়ে। প্রাঙ্গণে আমাদের গাড়ি প্রবেশ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কাসিয়ান হঠাৎ আমার দিকে ফিরল।

বলতে লাগল, "কর্তা, কর্তা, আমি আপনার প্রতি একটা অন্যায় করেছি, জানেন? শিকারের সব পাখিপাখালীকে হটিয়ে দিয়েছিলাম আমি, যাদুমন্ত্রে।"

"কী করে?"

"ওহ্, আমি তা পারি। এই যে আপনার তালিম-দেওয়া ভালো কুকুরটা আছে, কিন্তু সেও কিছু করতে পারেনি। যদি একবার ভাবেন, মানুষ কী? কী তারা? এই তো একটা পশু, কিন্তু মানুষ তাকে কী করেছে?"

শিকারের উপর যে "যাদু বিস্তার" করা অসম্ভব কাসিয়ানকে তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা আমার নিরর্থক হত, তাই কোনো জবাব দিলাম না। ততক্ষণে পেঁাছে গেছি প্রাঙ্গণে।

আন্‌নুশকা ছিল না কুটিরে; আমাদের আগেই সে পেঁাছে গেছে আর ব্যাঙের ছাতার ঝুড়িটি রেখে যেতেও পেরেছে। ইয়েরফেই নতুন ধুরোটি জুতল,

কিন্তু তার আগে ওটার প্রচণ্ড এবং অন্যায় নিন্দা করে নিল; আর এক ঘণ্টা পরে আমি রওয়ানা হলাম কাসিয়ানকে সামান্য কটা টাকা দিয়ে; সে প্রথমে তা নিতে চায়নি, কিন্তু পরে, এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে হাত দিয়ে টাকা কটা ধরে রেখে দিল বুকের কাছে। এই এক ঘণ্টায় সে প্রায় একটি কথাও উচ্চারণ করেনি, আগের মতোই দাঁড়িয়েছিল ফটকে হেলান দিয়ে। আমার সহিসের তিরস্কারের কোনো জবাব সে দেয়নি, আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল খুবই নিরুত্তাপ নিস্পৃহতার সঙ্গে।

ফিরে আসবার পরই বুঝলাম আমার গুণধর ইয়েরফেইর মন মেজাজ বিমর্ষ ... সত্যি কথা বলতে কি, গ্রামে সে খাবার পায়নি কিছু; ঘোড়ার জলটাও ছিল খারাপ। আমাদের গাড়ি চলল। মাথার পেছন দিকটা দেখেও বোঝা গেল ও অসন্তুষ্ট, আসনে বসে রইল, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আগ্রহে ও পুড়ছিল মনে মনে। আমি কিছু একটা প্রশ্ন করি আর তাই থেকে কথাবার্তা শুরু হোক — এই জন্য অপেক্ষা করে সে শুধু মৃদু স্বরে কী যেন বিড় বিড় করতে থাকল আপন মনে এবং ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে বেশ চাঁছাছোলা মন্তব্য করে যেতে লাগল। বিড় বিড় করে বলল, "গ্রাম, এটাকে গ্রাম বলে? এক ফোঁটা ক্‌ভাস চাও—তাও পাবে না এক ফোঁটা। আহা, ঈশ্বর!... আর জলটা—খালি ময়লা! (সশব্দে থুথু ফেলল।) একটা শশা নেই, নেই ক্‌ভাস, কিচ্ছু নেই..." তারপর ডান দিকের জোতের ঘোড়াটার দিকে ফিরে জোরে বলল, "এই যে, কীরে! তোকে আমি চিনি, ভণ্ড কোথাকার।" (এই বলে ওটার গায়ে চাবুক কষিয়ে দিল।) "ঘোড়াটা নিজের কাজ একেবারে ফাঁকি দিতে শিখেছে, কিন্তু এককালে কী বাধ্যই ছিল ওটা। এই, এই,—চল্‌ জোরে!"

আমি বললাম, "ইয়েরফেই, আচ্ছা, বলো তো আমাকে, এই কাসিয়ান লোকটি কী ধরনের?"

সঙ্গে সঙ্গেই ইয়েরফেই জবাব দিল না আমার কথার: সাধারণভাবে লোকটি সে চিন্তাশীল এবং সতর্ক; কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে আমার এই প্রশ্ন তাকে আরাম ও আনন্দ জুগিয়েছে।

অবশেষে রাশ টেনে ধরে সে বলল, "পিসু? ও একটা অদ্ভুত লোক; হ্যাঁ, পাগলাটে ধরনের; এমন অদ্ভুত লোক যে হঠাৎ তার মতো আর একজনকে আপনি দেখতে পাবেন না। যেমন ধরুন আমাদের এই বাদামী ঘোড়াটা, পিসুও

ঠিক এ রকম; সবকিছু থেকে, কাজকর্ম থেকে সে কেবল বেরিয়েই যেতে চায়, বেরিয়ে যায়, এই আর কি। কিন্তু তাহলে, কী ধরনের মজুরই ও হতে পারে? ... শরীরখানা তো এমন, আত্মা থাকার জায়গা নেই বললে চলে ... কিন্তু তবু, অবশ্য... ছোটোবেলা থেকেই ও ওরকম, জানেন। প্রথমে বাহক হিসাবে ওর কাকার ব্যবসা দেখত — ব্যবসায়ে ছিল ওরা তিন জন; কিন্তু তারপর জানেন, ওতে ও বিরক্ত হয়ে উঠল—ছেড়ে দিল সে কাজ। বাড়িতে থাকতে শুরু করল, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারত না বাড়িতে; এমন অস্থির ও—পিসুই বাস্তবিক। ভাগ্য ভালো ওর কর্তা ছিলেন সদাশয় — তিনি ওকে বিশেষ ব্যস্ত উদ্বিগ্ন করতেন না। যা হোক, তারপর থেকে হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার মতো ও কেবল অনির্দিষ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তারপর ও এমন অদ্ভুত, ওকে বোঝা যাবে না কিছুতেই। কখনো কখনো একটা থামের মতো নীরব ও, তারপর শুরু করবে কথা বলতে, আর কী যে বলবে ঈশ্বরই জানেন! বলুন তো, এ সব কি সভ্য চালচলন? লোকটা একেবারে অদ্ভুত, হ্যাঁ তাই। কিন্তু সে সব যাই হোক, ভালো গান গায় কিন্তু।"

"আর সত্যি কি ও লোকজনের অসুখ ভালো করে?"

"অসুখ ভালো করে লোকজনের! কেমন করে করবে? ভালো রে আমার ডাক্তার! যদিও আমাকে মানতেই হবে আমার গণ্ডমালা রোগ ও ভালো করেছিল বটে ..." এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বলল, "কিন্তু কী করে পারবে ও? লোকটা তো মুখ্যু, হ্যাঁ তাই।"

"ওকে কি অনেক দিন থেকে জানো তুমি?"

"দীর্ঘকাল। সুন্দর ঝরণা'য় সীচোভকায় আমি ওর প্রতিবেশী ছিলাম।"

"আর ওই মেয়েটি — বনে আমাদের সঙ্গে যার দেখা হয়েছিল, আন্নুশকা—সে মেয়েটি ওর কে হয়?"

কাঁধের ওপর দিয়ে ইয়েরফেই আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে দাঁত বার করে এক গাল হাসল।

"হে, হে!... হ্যাঁ, ওদের মধ্যে সম্পর্ক আছে। মেয়েটি অনাথা; ওর মা নেই, আর কে যে ওর মা ছিল তা জানাও যায় না। কিন্তু মেয়েটি নিশ্চয় কাসিয়ানের আত্মীয়া; খুব বেশি আদল ওদের মধ্যে। যাই হোক, মেয়েটি থাকে ওর সঙ্গে। আন্নুশকা বেশ চটপটে মেয়ে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না; ভালো মেয়ে;

আর বুড়োর কথা যদি বলেন, সে তো বুড়োর চোখের মণি; সত্যি ভালো মেয়ে। আর জানেন আপনি? হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু জানেন কি, ও বোধহয় আনন্দশকাকে পড়া শেখাতে শুরু করবে। হ্যাঁ, বুঝলেন! ওই রকমই ও; এমন অসাধারণ লোক ও, এমন চট চট করে বদলে যাওয়ার লোক; বাস্তবিক ওকে বুঝে ওঠা মুশকিল ...” সহিস সহসা নিজের কথায়ই বাধা দিয়ে বলে উঠল, “এ! হে হে!” তারপর ঘোড়া থামিয়ে একপাশে ঝুঁকে পড়ে নাক টেনে শুঁকতে লাগল। “কিছু পোড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? হ্যাঁ! আরে, নতুন সেই ধুরোটা, আমি বলছি... ভেবেছিলাম ওটাতে গ্রিজ লাগিয়েছি... একটু জল যে পেতেই হবে; আরে তাই তো, এই তো একটা খানা, ঠিক তাই।”

এই বলে ইয়েরফেই ধীরে ধীরে নামল তার আসন থেকে, বালতিটার বাঁধন খুলল, গেল ডোবার কাছে, তারপর ফিরে এসে এক রকম সন্তুষ্টি নিয়ে কান পেতে শুনতে লাগল হঠাৎ জলের স্পর্শ লেগে চাকার বাক্সের হিস হিস শব্দ। প্রায় ছ মাইল যাওয়ার মধ্যে তাকে ধূমায়িত ধুরোতে ছ'বার জল ঢালতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা বেশ নিবিড় হয়ে এসেছে।

নায়েব মশাই

আমার বাড়ি থেকে মাইল বারো দূরে আর্কাদি পাভলীচ পেনচ্কিন বলে এক পরিচিত ভদ্রলোক থাকেন। জমিদার তিনি, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। তাঁর তালুকে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়, তাঁর বাড়িটা ফরাসী স্থপতির নক্সা-মতো তৈরি, আর বাড়ির চাকর-বাকরেরা ইংরেজী কেতার পোষাকে সজ্জিত। তিনি সকলকে প্রচুর খাওয়ান, সকলকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, অনিচ্ছায় লোকে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। বেশ বুদ্ধিমান এবং করিৎকর্মা লোক তিনি, চমৎকার লেখাপড়া জানা, সেনাবাহিনীতে ছিলেন, উচ্চ সমাজে মেলামেশা করেছেন এবং বর্তমানে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই জমিদারি পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। তাঁর নিজেরই কথায় বলতে গেলে আর্কাদি পাভলীচ নিষ্ঠুর কিন্তু ন্যায়বান। প্রজাদের কিসে ভাল হয় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আছে, আর তাদের ভালোর জন্যেই তিনি তাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। "ছেলেপিলেদের মতো প্রজাদের শাসনে রাখা উচিত, তাদের অজ্ঞতা, mon cher; it faut prendre cela en consideration,"* এসব ক্ষেত্রে তিনি বলে থাকেন। যখন এই কষ্টকর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তিনি কোনো ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গী করেন না, কিম্বা গলার স্বর উঁচু পর্দায় তোলেন না শুধু অপরাধীর মুখে সোজা একটা ঘুঁষি কষিয়ে শান্তভাবে বলেন, "দোস্ত, মনে হচ্ছে তোমায় কিছু করতে বলছিলাম?" কিম্বা "ব্যাপার কি, বৎস? ভাবছ কি?" ততক্ষণ তিনি দাঁতে দাঁত ঘষেন, দুই ওষ্ঠ প্রান্ত একটু বেঁকে যায়। লম্বা না হলেও, বেশ সৌম্য ও প্রিয়দর্শন তাঁর চেহারা, তাঁর হাত ও আঙুলের নখ নিখুঁত পরিচ্ছন্ন। গোলাপী

* প্রিয়বন্ধু, এটা মনে রাখা উচিত (ফরাসী ভাষা)।

গাল আর ঠোঁট স্বাস্থ্যের প্রতিচ্ছবি। মনখোলা সুরেলা তাঁর হাসি, আর মাঝে মাঝে স্বচ্ছ বাদামী চোখের দৃষ্টিতে আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদেও চমৎকার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি ফরাসী বই, ফরাসী ছবি, ফরাসী খবরের কাগজ আনান, যদিও নিজে খুব বেশি গ্রন্থ-প্রেমিক নন, তিনি "ভ্রাম্যমান ইহুদী" বইটাই পড়ে শেষ করতে পারেননি। তাস খেলায় তিনি ওস্তাদ। মোট কথা আমাদের অঞ্চলে আর্কাদি পাভলীচ সংস্কৃতি-সম্পন্ন যোগ্য পাত্রদের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত, মেয়েরা তাঁর নামে পাগল। বিশেষ করে তাঁর আদব-কায়দার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আশ্চর্য তাঁর আচরণ, বেড়ালের মতো সতর্ক, ছেলেবেলা থেকে তিনি কোনো রকম কেলেঙ্কারিতে নিজেকে জড়াননি, যদিও সুযোগ পেলে ভীতু লোককে ধমক দিয়ে কিম্বা ভয় দেখিয়ে ক্ষমতার পরিচয় দেওয়াটা প্রিয় ছিল তাঁর। সন্দেহজনক লোকজনদের সঙ্গে মেশাতে তাঁর অত্যন্ত অরুচি—কেচ্ছাতে তাঁর ভয়। যাই হোক, লঘু মুহূর্তে তিনি নিজেকে এপিকিউরাসের শিষ্য বলে প্রচার করতেন। যদিও সাধারণত তিনি দর্শনশাস্ত্রকে অবহেলাভরে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, ও সব বিদঘুটে জটিল ব্যাপার জার্মানদের মস্তিষ্কের যোগ্য, কখনো বলেন ও সব একেবারে বাজে। গানেরও ভক্ত তিনি, তাস খেলতে খেলতে দাঁত চেপে গুন গুন করে আবেগের সঙ্গে তাঁকে গান গাইতে শোনা যেত। "লুসিয়া" এবং "লা সোমনামবুলা"র কিছু কিছু অংশ তাঁর মুখস্থ। তিনি সাধারণত উঁচু পর্দায় গান গাইতে অভ্যস্ত। শীতকালটা তিনি পিটার্সবুর্গে কাটিয়ে থাকেন। তাঁর বাড়িটা সুন্দরভাবে গোছানো, সহিসেরা পর্যন্ত প্রত্যেকে তাঁর প্রভাব অনুভব করে। তারা শুধু ঘোড়ার জোয়াল কিংবা নিজেদের কোটই বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করে না, উপরন্তু নিজেদের মুখও ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে। সত্যি সত্যি আর্কাদি পাভলীচের গৃহদাসদের দেখতে কি রকম বেজার কিন্তু আমাদের রুশদের মধ্যে কোনটা বেজারভাব, কোনটা নিদ্রালসভাব সেটা বলা শক্ত। আর্কাদি পাভলীচ বেশ মৃদু শ্রুতি-মধুর গলায় কথা বলেন। স্পষ্টভাবে সন্তোষের সঙ্গে যেন কথাগুলো উচ্চারণ করেন। প্রত্যেকটি কথা গন্ধ লাগানো সুন্দর গোঁফের ফাঁক দিয়ে উচ্চারণ করেন, কথায় কথায় প্রচুর ফরাসী কথা, যেমন, "Mais c'est impayable! Mais comment donc!"* কিন্তু

* অদ্ভুত! কী ভাবে তা হবে!

এ সব সত্ত্বেও আমার মতো লোক কখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য বেশি উৎসাহ বোধ করি না। গ্রাউজ ও প্যাটরিজ না থাকলে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ বজায় থাকত কিনা সন্দেহ। ওঁর বাড়িতে গেলে কি রকম একটা অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ হয়। বাড়ির সমস্ত আরামই বিস্বাদ ঠেকে। সন্ধ্যাবেলায় কুলচিহ্ন বোতাম আঁটা নীল জোব্বায় সজ্জিত কোনো ভৃত্য এসে দাসানুদাসের মতন পায়ের জুতো খুলতে আরম্ভ করে তখন সকলেরই মনে এই ভাব হয়, এই সব শীর্ণ পাণ্ডুর লোকগুলির জায়গায় যদি হঠাৎ আসে সদ্য মাঠ থেকে ফেরা আশ্চর্য চওড়া চোয়াল আর অবিশ্বাস্য রকম সুপুষ্ট নাকওয়ালা কোনো জোয়ান চাষী, যে তার নতুন কোটের জোড়মুখ দশ জায়গায় ছিঁড়ে দিতে পেরেছে, তাহলে সকলেই অনির্বচনীয় খুশি হবে, এবং কারোর সমস্ত পা-টাই যদিও জুতোর সঙ্গে তার টানের চোটে খুলে যাবার আশংকা থাকেও সে সানন্দে রাজী হয়ে যাবে।

আর্কাদি পাভলীচকে আমি পছন্দ না করলেও এক রাত্রি তাঁর বাড়িতে আমায় কাটাতে হয়েছিল। পরদিন খুব ভোরে আমার গাড়ি জুততে হুকুম দিলাম, কিন্তু ইংরেজী কেতায় পুরো একটি প্রাতরাশ না খাইয়ে তিনি আমায় যেতে দিলেন না, তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। চায়ের সঙ্গে এল কাটলেট, সিদ্ধ ডিম, মাখন, মধু, পনির আরও কত কি। দুজন ভৃত্য শাদা পরিষ্কার দস্তানা পরে আমাদের সামান্যতম ইচ্ছা নিঃশব্দে ও দ্রুতগতিতে পূরণ করল। একটা পার্শিয়ান ডিভানে আমরা বসেছিলাম। আর্কাদি পাভলীচ সিল্কের ঢিলে পায়জামায় কালো ভেলভেটের জ্যাকেটে সজ্জিত, মাথায় নীল ফিতে লাগানো একটা সুন্দর ফেজ টুপি, পায়ে এক জোড়া হলদে চীনে স্লিপার। তিনি চা খেলেন, উচ্চ কণ্ঠে হাসলেন, আঙুলের নখ পর্যবেক্ষণ করলেন, ধূমপান করলেন, সোফার কুশানে হেলান দিয়ে বসলেন, তোফা মেজাজে ছিলেন তিনি সব মিলিয়ে। সসন্তোষে খাসা প্রাতরাশ শেষ করে আর্কাদি পাভলীচ এক গেলাস লাল মদ ঢেলে গেলাসটা মুখের কাছে তুলেই ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

কড়া সুরে একটা চাকরকে জিজ্ঞেস করলেন, "মদটা গরম করা হয়নি কেন?"

ঘাবড়ে গিয়ে চাকরটা নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখ শাদা হয়ে গেল।

আর্কাদি পাভলীচ আবার ধীরভাবে লোকটার ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমাকে আমি কি কিছু জিজ্ঞেস করিনি বাপু?"

হতভাগা চাকরটা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে উসখুস করতে করতে হাতের ন্যাপকিনটাকে দোমড়াতে লাগল, একটা কথাও তার মুখ দিয়ে সরল না। আর্কাদি পাভলীচ মাথা নিচু করে চিন্তিতভাবে তার দিকে তাকালেন।

আমার হাঁটু থাবড়ে অমায়িকভাবে আমায় বললেন, "Pardon, mon cher,"* তারপর আবার চাকরটার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর ভুরু কুঁচকে চাকরটাকে বললেন, "আচ্ছা তুমি যেতে পার।" তারপর ঘণ্টা টিপলেন।

একটা শক্ত সমর্থ কালো চুলওয়ালা লোক ঘরে ঢুকল, তার কপালটা ছোটো আর চোখ দুটো চর্বির আধিক্যে ভিতরে ঢুকে গেছে।

ধীর মেজাজে আর্কাদি পাভলীচ নিচু স্বরে তাকে বললেন, "ফিওদরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করো।"

"ঠিক আছে, স্যার," বলে মোটা লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর্কাদি পাভলীচ সানন্দে বলে উঠলেন, "Voila, mon cher, les desagrements de la campagne**। কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কোথায়? কিছুক্ষণ থেকে যান!"

"না," আমি বললাম, "এবার আমাকে যেতেই হবে।"

"ওঃ, শিকার ছাড়া কি কিছুই নেই, আপনারা শিকারীরা অদ্ভুত! এখন কোথায় শিকার করতে যাচ্ছেন?"

"এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে, রিয়াবভোতে।"

"রিয়াবভোতে? বহুৎ আচ্ছা! তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে আসছি। রিয়াবভো আমার এলাকার শিপিলভ্‌কা গ্রাম থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। অনেকদিন আগে শিপিলভ্‌কায় গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময়ই করে উঠতে

* মাফ করুন, বন্ধু (ফরাসী ভাষা)।

** এটা, মশায়, গ্রামে থাকবার অসুবিধে (ফরাসী ভাষা)।

পারিনি। এই এক সুযোগ এসেছে, রিয়াবভোতে সারাদিন শিকার করে সন্ধ্যেবেলা আপনি আমার কাছে চলে আসতে পারেন। Ce sera charmant।* রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে—আমরা রান্নার লোক নিয়ে যাব। রাত্রিটা আপনি আমার ওখানে কাটাবেন।" আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই তিনি বলে উঠলেন, "চমৎকার, চমৎকার হবে। C'est arrangé...** এই কে আছো? চট্‌পট্‌ গাড়ি বার করো। শিপিলভ্‌কায় আগে কখনো যাননি? রাত্তিরটা আমার নায়েবের বাড়িতে থাকবার কথা আপনাকে বলতে আমার লজ্জা করত, কিন্তু আমি তো জানি আপনার নিয়মের বালাই নেই, রিয়াবভোতে আপনি তো খড়োঘরেই শুয়ে কাটাতেন ... যাই হোক আমরা যাব!"

আর্কাদি পাভলীচ একটি ফরাসী গানের সুর গুন গুন করতে লাগলেন।

দুলে দুলে তিনি বলতে লাগলেন, "আপনার নিশ্চয়ই জানা নেই ওখানে আমার কিছু চাষী প্রজা আছে। ও অঞ্চলের নিয়ম ঐ, আমি আর কী করি, বলুন? যদিও খাজনাটা ওরা ঠিক সময় দেয়। খাজনার বদলে বেগার নেওয়াই অবশ্য আমার উচিত ছিল, কিন্তু জমি এত কম! এক এক সময়ে সত্যি ভাবি কি করে ওদের খাওয়া পরা চলে। যাকগে, c'est leur affaire।*** আমার সেখানকার নায়েব বেশ চমৎকার লোক, খুব চট্‌পটে, une forte tête,**** লোকটার শাসন ক্ষমতা সত্যি আছে! আপনি দেখবেন ... কপালজোরে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়িয়েছে!"

কোনো উপায় ছিল না। সকাল ন'টার বদলে দুপুর দু'টোয় রওনা হলাম। শিকারীরা আমার অধৈর্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন জানি। আর্কাদি পাভলীচ, ওঁর নিজের কথাতেই বলা যাক, আয়েসের সুযোগ পেলে ছাড়তেন না। তাই তিনি সঙ্গে এত কাপড় চোপড়, খাবার দাবার, পোষাক পরিচ্ছদ, গন্ধদ্রব্য, বালিশ বিছানা ইত্যাদি নিলেন যে, কোনো সাবধানী ও

* চমৎকার হবে (ফরাসী ভাষা)।
** এই তাহলে ঠিক হল (ফরাসী ভাষা)।
*** ওটা ওদের ব্যাপার (ফরাসী ভাষা)।
**** বুদ্ধিমান (ফরাসী ভাষা)।

কৃচ্ছ্রসাধক জার্মান এক বছরের পক্ষে তা যথেষ্ট মনে করত। পাহাড়ী রাস্তায় প্রতিবার যখনই গড়খাইতে গাড়ি ঝাঁকুনি খেতে লাগল তখন গাড়োয়ানের উদ্দেশে আর্কাদি পাভলীচের মুখ দিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ বেশ শক্ত মন্তব্য বেরুতে লাগল, তার থেকে আমার ধারণা হল যে আমার মহামূল্য বন্ধুরত্নটি আসলে একদম ভীতু। যাই হোক, যাত্রা মোটামুটি নিরাপদ হয়েছিল, শুধু একটি বিঘ্ন ছাড়া। সদ্য মেরামত-করা একটা সেতু পার হবার সময় পাচকের গাড়িটা ভেঙে গেল আর গাড়ির পেছনের চাকাটায় সে পেটে চোট খেল।

নিজ গৃহের রন্ধনশাস্ত্রের অধ্যক্ষ কারেম পড়ে যাওয়াতে আর্কাদি পাভলীচ যথেষ্ট আশঙ্কিত হলেন, তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করে পাঠালেন তার হাতে চোট লেগেছে কিনা। লাগেনি শুনে তিনি নিশ্চিন্ত ও দুর্ভাবনামুক্ত হলেন। এই সব ঝামেলায় রাস্তাতেই অনেক দেরী হয়ে গেল। আর্কাদি পাভলীচের সঙ্গে এক গাড়িতেই আমি ছিলাম, যাত্রার শেষের দিকে মারাত্মক বিরক্তিতে মন ভরে উঠল, বিশেষত ক'ঘণ্টার মধ্যেই যখন বন্ধুটির বাক্যালাপের সমস্ত বিষয় নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি উদারপন্থী মন্তব্যরাজি প্রকাশ করতে লাগলেন। অবশেষে পৌঁছানো গেল — রিয়াবভোতে নয়, শিপিলভ্কায়, কী করে যেন এটা ঘটল। সে দিনটা আর কোনো মতেই শিকার পাওয়া যেত না, তাই ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট রাগ হলেও ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

পাচকটি আমাদের কয়েক মিনিট আগে পৌঁছেছিল। আর তাই যাদের যাদের দরকার তাদের সব খবর দিয়ে সবকিছু বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, কেননা গ্রামের সীমান্তে ঢুকতে-না-ঢুকতেই নায়েবের ছেলে জমিদারের গোমস্তার সঙ্গে দেখা হল, লম্বায় সাত ফুট, লাল চুলওয়ালা একটা চাষী, খালি মাথায়, একটা বোতামহীন নতুন ওভারকোট পরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিল সে। আর্কাদি পাভলীচ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সফরোন কোথায়?" গোমস্তা প্রথমে চট করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল, প্রভুকে কুর্নিশ করে বলল, "নমস্কার আর্কাদি পাভলীচ, স্যার!" তারপর মাথা তুলে গা-ঝাড়া দিয়ে ঘোষণা করল যে সফরোন পেরোভ-এ গেছে, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

আর্কাদি পাভলীচ বললেন, "বেশ, তুমি এস আমাদের পেছনে পেছনে।" গোমস্তা অনুগতের মতো ঘোড়াকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে তার

ওপর আবার উঠে টুপিটা হাতে নিয়ে কদম চালে গাড়ির পিছনে পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা চললাম। খালি গাড়ি করে কিছু চাষী আসছিল, তাদের সঙ্গে দেখা হল। শস্য ঝাড়াই করে তারা ফিরছিল, সামনে পিছনে দুলে দুলে গান গাইতে গাইতে, শূন্যে পা দোলাতে দোলাতে, কিন্তু আমাদের গাড়ি আর গোমস্তাকে দেখেই তারা হঠাৎ থেমে গেল, টুপি খুলে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল যেন আদেশের অপেক্ষায়, টুপিগুলো শীতের, যদিও তখন গ্রীষ্মকাল। আর্কাদি পাভলীচ সুন্দর ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করলেন। সারা গাঁয়ে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। চেক-কাটা পেটিকোট-পরা মেয়েরা অসাবধানী বা অতি উৎসাহী কুকুরগুলোকে কাঠের টুকরো ছুঁড়ে মারতে লাগল।

চোখের ঠিক নিচে থেকে দাড়ি গজিয়েছে এমন একটা খোঁড়া বুড়ো ঘোড়াটা জল খাবার আগেই তাকে কুয়োর কাছ থেকে কেন জানি টেনে নিয়ে পাঁজরে মারল এক গুঁতো, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করতে লাগল। লম্বা শার্ট-পরা ছেলেগুলো চীৎকার করে নিজের নিজের ঘরের দিকে ছুটল, দরজার উঁচু চৌকাঠে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তারপর মাথা নিচু আর পা ওপর দিকে করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গড়িয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে চলে গেল — আর তাদের দেখা গেল না। এমন কি মুরগীগুলো এক দৌড়ে গেল মোড়ের মাথায়। লাল ল্যাজ, গলাটা সাটিন ওয়েস্টকোটের মতো চকচকে কালো, সাহসী মোরগ মাথায় ঝুঁটি কুঁকড়ে না হটে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল, এমন কি ডাক ছাড়তে তৈরি হয়েও হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। নায়েবের বাড়ি অন্য সব বাড়ি থেকে তফাতে এক টুকরো শণের জমির মাঝখানে অবস্থিত। আমরা ফটকের কাছে থামলাম। মিঃ পেনচ্‌কিন উঠে দাঁড়িয়ে ছবির মতো ভঙ্গীতে গায়ের লম্বাঝুল কোর্তা ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে চারিদিকে সদয় দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। নায়েবের পত্নী আমাদের সঙ্গে নিচু হয়ে অভিবাদন করে মনিবের হস্তচুম্বন করতে এগিয়ে এল। আর্কাদি পাভলীচ তাকে আশা মিটিয়ে হাতে চুমু খেতে দিলেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। বাইরের ঘরে একটা অন্ধকার কোণে গোমস্তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, সেও আর্কাদি পাভলীচকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল কিন্তু হস্তচুম্বনের সাহস হল না। কুটিরের বাইরের ঘরের

ডানদিকটার তথাকথিত ঠান্ডা ঘরে দুটো ঝি তখনো ব্যস্তভাবে সাফ-সুৎরো করার কাজে ব্যস্ত। সমস্ত জঞ্জাল তারা সরিয়ে ফেলছিল, যেমন — খালি জালা, কাঠের বোর্ডের মতো শক্ত ভেড়ার চামড়া, চর্বির আধার, ছেঁড়া কাপড়চোপড় ও ফুটকি ফুটকি দাগওয়ালা একটা বাচ্চা শুদ্ধ দোলনা, স্নানের ঘরের ঝাঁটা দিয়ে ময়লা সরিয়ে বাইরে ফেলছিল। আর্কাদি পাভলীচ তাদের ভাগিয়ে দিয়ে পবিত্র সন্তদের মূর্তির নিচে একটা বেঞ্চিতে বসলেন। কোচওয়ানরা বাক্স তোরঙ্গ ও অন্যান্য মোট গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে রাখতে সুরু করল, প্রত্যেক বার ভারী জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ চাপবার চেষ্টা তারা করছিল।

ইতিমধ্যে আর্কাদি পাভলীচ গোমস্তাকে শস্য, বীজ রোপন ইত্যাদি সব চাষবাস সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে লাগলেন। গোমস্তা সন্তোষজনক উত্তর দিতে লাগল, কিন্তু এমন অস্বস্তিভরা তার বলার ঢং যে মনে হয় অসাড় আঙুল দিয়ে সে জামার বোতাম লাগাচ্ছে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্রগতি চাকরটার জন্য এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল — যাতে সে এলেই পথ ছেড়ে দিতে পারে। তার দৃঢ় কাঁধের পিছনে আমি দেখতে পেলাম নায়েবের স্ত্রী একটা চাষী মেয়েকে বাইরের ঘরে নিঃশব্দে প্রহার লাগাচ্ছে। একটা গাড়ি হঠাৎ ক্যাঁচকোঁচ করে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল, নায়েব বাড়িতে ঢুকল।

আর্কাদি পাভলীচের কথায়, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা-সম্পন্ন এই লোকটা, বেঁটেখাটো, চওড়া-কাঁধ, চুলে পাক ধরেছে, শরীরটা বেশ মজবুত, নাকটা লালচে, কুতকুতে নীলচে চোখ আর তার দাড়িটা যেন হাতপাখার মতো দেখতে। প্রসঙ্গত বলা যায়, রাশিয়ার ইতিহাসে এমন একজনও লোক দেখা যায়নি যে ঘন চাপদাড়ি ছাড়া বেশ ধনী ও সঙ্গতি-সম্পন্ন হয়েছে। আগে হয়তো কারোর দেখা গেছে পাতলা ইংরেজী ভি-এর মতো দাড়ি, কিন্তু তারপরেই আবার দেখা গেছে তার সারা মুখ জ্যোতির্মণ্ডলের মতো দাড়িতে ছেয়ে গেছে; ভাবতে অবাক লাগে এত লোম গজায় কোথা থেকে! নায়েব নিশ্চয়ই পেরোভ-এ ফুর্তি করতে গিয়েছিল, তার মুখ চোখ লাল, মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

সুর করে সে বলতে লাগল, "হুজুর মা বাপ, দয়ালু মালিক!" এত গভীর আবেগে সে কথাগুলো বলছিল যে প্রত্যেক মিনিটেই মনে হচ্ছিল এইবার কেঁদে ফেলবে, "অবশেষে আপনি দয়া করে আমাদের এখানে

এসেছেন — আপনার হাতটা একবার দয়া করে দিন," চুম্বনের জন্যে তার ঠোঁট দুটো এগিয়ে গেল।

আর্কাদি পাভলীচ তার প্রত্যাশা পূরণ করলেন।

বন্ধুর মতো প্রশ্ন করলেন, "কি খবর সফরোন, তোমাদের কাজকর্ম সব চলছে কি রকম?"

সফরোন চেঁচিয়ে উঠল, 'আঃ হুজুর! কাজকর্ম খারাপ চলবে কি করে? আমাদের হুজুর, আমাদের মালিক নিজে এসে আমাদের দরিদ্র ঘরকে আলো করেছেন যখন, আমরণ আমাদের সুখে রাখবার জন্যে তখন কাজকর্ম খারাপ চলতে কি আর পারে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই — আপনার দয়ায় কাজকর্ম সব ঠিক চলছে।"

এই পর্যন্ত বলে সফরোন একটু থামল, মনিবের দিকে তাকাল, আর আবেগে আপ্লুত হয়ে (খানিকটা মদের ঝোঁকেও বটে) আর একবার মনিবের হস্তচুম্বন করতে চাইল, আগের চেয়েও বেশি ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগল:

"ওঃ! আপনি এসেছেন, আমাদের প্রতিপালক ... আর ঈশ্বরের অসীম দয়া! আমি আনন্দে হতবাক হয়ে গেছি ... ঈশ্বরের অসীম দয়া! চেয়ে দেখছি কিন্তু চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না, ওঃ আমাদের হুজুর — মা বাপ!"

আর্কাদি পাভলীচ আমার দিকে চাইলেন, একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "N' est-ce pas que c'est touchant?"*

অক্লান্ত নায়েব তখনো বলে যেতে লাগল, "কিন্তু হুজুর, কী করবেন আপনারা? আমার মন ভেঙে যাবে হুজুর, দয়া করে আপনার আসার খবর কেন আমায় জানাননি? রাত্তিরটা থাকবেন কোথায়? দেখছেন তো কি রকম নোংরা আমার বাড়ি।"

আর্কাদি পাভলীচ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ও সব কিছু না, সফরোন, ও সব কিচ্ছু না, সব ঠিক আছে।"

"কিন্তু হুজুর, কার পক্ষে ঠিক? আমাদের মতো চাষাভূষোর যোগ্য এই জায়গাটা, কিন্তু আপনার জন্য — ওঃ হুজুর, আমার মতো বুড়ো বেয়াকুবকে মাপ করবেন, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মাপ করবেন। আমি একদম পাগল হয়ে গেছি।"

---

* ব্যাপারটা আপনার কাছে মর্মস্পর্শী ঠেকছে না? (ফরাসী ভাষা)

ইতিমধ্যে রাত্তিরের খাবার এসে গেল। আর্কাদি পাভলীচ খেতে সুরু করলেন। নায়েব বুড়ো তার ছেলের খুব নেশা হয়ে গেছে এই বলে তাকে সরিয়ে দিল।

মিঃ পেনচ্কিন আমায় চোখ টিপে চাষাদের কথার ঢং নকল করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "জমির ভাগ-বাটোয়ারা ঠিক হয়ে গেছে তো হে? কি বলো?"

"ভাগ-বাটোয়ারা সব আমরা ঠিক করে দিয়েছি হুজুর, আপনার কৃপায়। পরশুদিন ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে। খ্লীনভের লোকরা প্রথমে আপত্তি তুলেছিল। সত্যি তারা ফ্যাকড়া তুলেছিল। তারা একবার এই জমিটা চায়... তারপর ও জমিটা চায়। ঈশ্বর জানেন কি তারা না চায়! তারা একপাল গর্দভ, হুজুর — যত সব মুখ্যুর দল। কিন্তু আমরা হুজুর, বুঝলেন কিনা, হুজুর, আমাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন দেখিয়ে মিকলাই মিকলাইচকে — যে এ সব বিষয়ে মধ্যস্থতা করেছিল — তাকে খুশি করে দিয়েছি। আপনার হুকুম-মতো আমরা সব করেছি হুজুর, আপনি যেমন বলেছেন সেই মতো আমরা কাজ করেছি হুজুর, এমন কিছু আমরা করিনি যা ইয়েগর দ্মিত্রিচের অজানা।"

আর্কাদি পাভলীচ গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ইয়েগর আমায় সব বলেছে।"

"তা বলেছে নিশ্চয়! ইয়েগর দ্মিত্রিচ বলেছে নিশ্চয়।"

"আশা করি এবার তোমরা সন্তুষ্ট।"

সফরোন শুধু এই কথাটির অপেক্ষা করছিল।

আগের মতো আবার সুর করে বলতে লাগল, "ওহো, হুজুর আমাদের মালিক। বাস্তবিকই আমরা খুশি, হুজুর — হুজুর আপনার জন্য দিনরাত আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ... জমির পরিমাণ অবশ্য অত্যন্ত কম ..."

পেনচ্কিন তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিলেন।

"ঠিক আছে সফরোন, ওতেই হবে। আমি জানি তুমি আমার হয়ে খুব খাটো। আচ্ছা, তোমাদের শস্য ঝাড়াইয়ের কাজ চলছে কি রকম?"

সফরোন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"ও হুজুর, ঝাড়াইয়ের কাজ এমন কিছু ভালো চলছে না। ওখানে হুজুর, সম্প্রতি একটা ব্যাপার ঘটেছে, সেটা আপনাকে বলতে দিন।"

(এইবার সে মিঃ পেনচ্‌কিনের কাছে ঘেঁষে এল, একটু ঝুঁকে দুটো হাত তুলল, একটা চোখ কোঁচকাল।) "ওখানে আমাদের এলাকার মধ্যে একটা লাশ পাওয়া গিয়েছিল হুজুর।"

"কি রকম?"

"আমি ভাবতেই পারি না হুজুর। মনে হচ্ছে এটা শয়তানের কাজ। কিন্তু ভাগ্যিস এটা সীমানার কাছে পড়ে ছিল, সত্যি বলতে কি আমাদেরই সীমানার এদিকে। আমি হুকুম দিলাম ওধারে প্রতিবেশীর জমিতে লাশটা তৎক্ষণাৎ ফেলে দিয়ে আসতে — যা তখনো করা সম্ভব ছিল, আর ওখানে একটা পাহারা বসিয়ে দিয়ে সব লোকজনদের খবর পাঠালাম। বললাম, 'এ বিষয়ে সব চুপচাপ থাকতে হবে।' কিন্তু ব্যাপারটা যদি বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায় তাই পুলিশ অফিসারকে সব বুঝিয়ে বললাম। বললাম, 'দেখলে ব্যাপারটা!' অবশ্য তাকে বেশ খাতির যত্ন করে হাতে কিছু নোট গুঁজে দিতে হল ... কি বলেন হুজুর? উদোর পিণ্ডি দিলাম বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে; দেখুন হুজুর একটা লাশের ব্যাপার দুশো রুবলের মামলা, ব্যস্‌।"

মিঃ পেনচ্‌কিন নায়েবের চাতুরী দেখে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন আর বার বার আমায় ওকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, "Quel gaillard, ah?"*

ইতিমধ্যে বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল, আর্কাদি পাভলীচ খাবার টেবিল সরিয়ে নিয়ে খড় বিছিয়ে দিতে হুকুম করলেন। একটা চাকর চাদর বিছিয়ে বালিশ এনে বিছানা করে দিল, আমরা শুয়ে পড়লাম। আগামী দিনে কী কী করতে হবে এই নির্দেশ নিয়ে সফরোন চলে গেল। ঘুমোবার আগে আর্কাদি পাভলীচ রুশী চাষীদের প্রথম শ্রেণীর গুণাবলীর কথা কিছু আলোচনা করলেন এবং ঐ উপলক্ষে মন্তব্য করলেন যে সফরোনের হাতে যতদিন এই জায়গার ভার আছে শিপিলভ্‌কায় চাষীদের এক কোপেক খাজনাও কোনো দিন বাকি পড়েনি। চৌকিদারের হাঁক শোনা গেল; নিজের দাবি চট্‌ করে ত্যাগ করার মতো কর্তব্য-জ্ঞান হয়নি এমন একটা শিশু কুটিরের কোনো এক জায়গায় চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

* আচ্ছা লোক, কী বলেন? (ফরাসী ভাষা)

পরদিন খুব ভোর ভোর আমরা উঠে পড়লাম। রিয়াবভোতে রওনা হওয়ার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছিলাম কিন্তু আর্কাদি পাভলীচ তাঁর তালুকটা আমায় দেখাবার জন্য উৎসুক ছিলেন, তাই আমাকে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। সত্যিকার শাসন ক্ষমতাওয়ালা সফরোনের প্রথম শ্রেণীর গুণাবলীর আরও কিছু পরিচয় বাস্তব কর্মক্ষেত্রে দেখতে আমার আপত্তি ছিল না। নায়েব এল। পরনে ঢিলে নীল কোট, লাল বেল্ট দিয়ে বাঁধা। গত সন্ধ্যার চেয়ে অনেক কম কথা সে বলছিল। মনিবের দিকে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রেখে তাঁর কথার সংলগ্ন সুবিবেচিত উত্তর দিচ্ছিল। তার সঙ্গে আমরা ঢেঁকীশালার দিকে চললাম। সফরোনের ছেলে, সেই সাত ফুট লম্বা গোমস্তা, বাইরে থেকে যার সর্বাঙ্গে বোকামির চিহ্ন পরিস্ফুট, আমাদের সঙ্গে সেও যেতে লাগল; কিছু দূরে যেতেই আবার গাঁয়ের চৌকিদার ফেদসেইচ আমাদের দলে যোগ দিল, বিরাট গোঁফওয়ালা একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, তার মুখের ভাব অস্বাভাবিক, তাকে দেখলে মনে হয় যেন অতীতে কোনো ঘটনা তাকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দিয়েছিল আর এখনো সে তার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমরা ঢেঁকীশালা দেখলাম, গোলাঘর, শস্যের গোলা, উইন্ড-মিল, গোয়াল, সব্জিক্ষেত, শণক্ষেত দেখলাম। সত্যি সত্যি সবকিছু চমৎকারভাবে সাজানো রয়েছে। শুধু চাষীদের হতাশ মুখের ভাব দেখে বিস্মিত হলাম। শ্রীর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়তার দিকেও সফরোনের নজর ছিল। খাতের পাশে পাশে সে সারি সারি উইলো গাছ লাগিয়েছিল, শস্যের গোলার মাঝে মাঝে ঢেঁকীশালার দিকে যাওয়ার জন্য মিহি বালি বিছানো সরু সরু রাস্তা তৈরি করেছিল। উইন্ড-মিলের মাথায় সে ভাল্লুকের আকারের একটা বায়ু-নির্দেশক লাগিয়েছিল, ভাল্লুকটার হাঁ-করা চোয়াল থেকে লাল জিভ বেরিয়ে এসেছে। ইঁটের তৈরি গ্রীক ছাঁদের গোয়ালঘরের মাথায় বড়ো বড়ো শাদা হরফে লেখা: "শিপিলভ্কা গ্রামে নির্মিত, এই গোয়াল, ১৮৪০ সন।" আর্কাদি পাভলীচ মুগ্ধ হলেন আর আমাকে ফরাসী ভাষায় জমির খাজনা প্রথার সুবিধা সম্বন্ধে অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। তারপর সেই সঙ্গে যোগ করলেন যে শ্রমিক খাটিয়ে হয়তো আরো বেশি লাভ করা যায়, কিন্তু যাই হোক, সেই তো আর সব নয়। নায়েবকে কি করে আলুর চাষ করতে হয়, কি করে পশুদের খাদ্যাদি তৈরি করতে হয় এমন আরও কত কি উপদেশ দিলেন।

সফরোন মনিবের সব মন্তব্য মন দিয়ে শুনতে লাগল। এখন কিন্তু আর্কাদি পাভলীচকে সে আর বাপ, মালিক এ সব বলে সম্বোধন করছিল না, শুধু বার বার বলতে লাগল যে জমি বড়ো কম, আরো বেশি কিছু জমি কিনলে ভালো হয়। আর্কাদি পাভলীচ বললেন, "বেশ তো, কেনো, আমার কিছু আপত্তি নেই, তবে অবশ্য আমার নামে কিনবে।" এর পরে সফরোন কোনো উত্তর দিল না, শুধু দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল। মিঃ পেনচ্‌কিন মন্তব্য করলেন, "এবার জঙ্গলের দিকটায় গেলে হয়।" সাজ-পরা ঘোড়া আমাদের কাছে আনা হল। আমরা জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। ওরা এটাকে বলে "খাস জমি"। খাসের এই ঘেরা জমিটা দেখা গেল অনধ্যুষিত গভীর জঙ্গল। এর জন্য আর্কাদি পাভলীচ সফরোনকে তারিফ করে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বন জঙ্গল সম্বন্ধে আর্কাদি পাভলীচ ছিলেন রুশ নীতির ভক্ত। এ বিষয়ে তিনি আমায় মজাদার, তাঁর ভাষায় মজাদার, একটা গল্প বললেন — কি করে এক আমুদে জমিদার তার বনরক্ষকের প্রায় অর্ধেক দাড়ি টেনে উপড়ে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন এই বোঝাতে যে উপড়ে নিলে বেশি ঘন দাড়ি জন্মায় না। অন্য সব বিষয়ে নতুন কিছু করলে সফরোন কিম্বা আর্কাদি পাভলীচের অবশ্য আপত্তি থাকে না। গ্রামে ফেরার পর নায়েব মস্কো থেকে সদ্য আনা একটা শস্য ঝাড়াইয়ের যন্ত্র দেখাতে আমাদের নিয়ে গেল। যন্ত্রটার কাজকর্ম সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু সফরোন যদি আগে জানত এই শেষ সফরে তার ও তার মনিবের ভাগ্যে এমন একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটবে তাহলে সে নিঃসন্দেহে আমাদের সঙ্গে বাড়িতেই থেকে যেত, আর বার হত না।

ব্যাপারটা ঘটল এই রকম। গোলাবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর নিম্নোক্ত দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হল। দরজার কাছ থেকে একটু দূরে একটা নোংরা পুকুরে তিনটে রাজহাঁস নির্বিকারভাবে জল ছিটাচ্ছিল, দুটো চাষা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। ষাট বছরের একটি বুড়ো আর বিশ বছরের এক ছোকরা। দুজনেরই পরনে বাড়িতে তৈরি তালিমারা শার্ট, খালি পা আর একটা করে দড়ি বেল্টের মতো কোমরে বাঁধা। গ্রামের চৌকিদার ফেদসেইচ তাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আর সম্ভবত সে ওদের দুটোকে ভাগিয়ে দিতে সফল হত আমরা যদি গোলাবাড়িতে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতাম। কিন্তু

আমাদের দেখেই সে সরে গিয়ে এ্যাটেনশন্ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছেই গোমস্তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঝুলতে লাগল। আর্কাদি পাভলীচ ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে আবেদনকারীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারা দুজনেই তাঁর পায়ের নিচে নিঃশব্দে সটান শুয়ে পড়ল।

"চাও কী তোমরা? তোমাদের কী দরকার?" দৃঢ় অথচ অনুনাসিক স্বরে তিনি ওদের জিজ্ঞেস করলেন। (চাষারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল, একটি শব্দও উচ্চারণ করল না, শুধু চোখ পিট পিট করতে লাগল যেন মুখের উপর রোদ্দুর পড়ছে, তাদের নিশ্বাসও দ্রুত হল।)

"বলি ব্যাপার কী?" আর্কাদি পাভলীচ আবার বললেন, তারপর তক্ষুনি সফরোনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কোন পরিবারের লোক?"

নায়েব ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "এরা তবলেয়েভ পরিবার।"

"আচ্ছা তোমাদের দরকারটা কিসের?" মিঃ পেনচ্ক্রিন আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের জিভ খসে গেছে নাকি? আমায় বলো, তোমরা কী চাও?" বুড়োর দিকে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভয় পেও না, বেয়াকুব কোথাকার!"

বুড়োটা গাঢ় বাদামী রঙের চামড়া কুঁচকে-যাওয়া ঘাড় বাড়িয়ে, নীলচে কাঁপা কাঁপা ঠোঁট খুলে খসখসে গলায় বলল, "বাঁচান আমাদের হুজুর!" আর আবার মাটিতে মাথা ঠেকাল। অল্পবয়সী চাষাটাও ঐ রকম করল। আর্কাদি পাভলীচ আত্মমর্যাদার সঙ্গে তাদের আনত ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন।

"কী হয়েছে? কার বিরুদ্ধে তোমাদের নালিশ?"

"দয়া করুন হুজুর! আমাদের বাঁচতে দিন ... আমাদের জ্বালিয়ে একেবারে শেষ করে ফেলল।" (বুড়োটা অতিকষ্টে এই কথাটা উচ্চারণ করল।)

"কে তোমাদের জ্বালাল?"

"সফরোন ইয়াকভলিচ, হুজুর।"

আর্কাদি পাভলীচ এক মুহূর্ত নিঃশব্দ হয়ে রইলেন।

"তোমার নাম কী?"

"আস্তিপ, হুজুর।"

"এ তোমার কে হয়?"

"আমার ছেলে, হুজুর।"

আর্কাদি পাভলীচ আবার চুপ করে গোঁফে তা দিতে লাগলেন।

"বেশ! কী করে তোমায় জ্বালাচ্ছে শুনি?" আবার তিনি বললেন, গোঁফের ওপর থেকে বুড়োর দিকে তাকিয়ে।

"হুজুর, উনি আমাদের একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছেন। দুটো ছেলেকে, হুজুর, একে একে উনি সৈন্যবাহিনীতে পাঠিয়েছেন, এবারে ছোটোটাকেও পাঠাচ্ছেন। গতকাল হুজুর, আমাদের শেষ গরুটাকে টেনে নিয়ে গেছেন উঠোন থেকে আর আমার বুড়ীর গায়ে হাত তুলেছেন।" (গোমস্তাকে দেখিয়ে দিল।)

"হুঁ!" আর্কাদি পাভলীচ মন্তব্য করলেন।

"হুজুর, আমাদের এই ভাবে নাশ করতে দেবেন না, আমাদের বাঁচান মালিক!"

মিঃ পেনচ্‌কিন ভ্রূকুটি করলেন। বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে নায়েবকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এ সবের মানে কী?"

নায়েব উত্তর দিল, "লোকটা মাতাল, কর্তা," আগের চেয়ে আরও বিনীতভাবে বলল, "আর কুঁড়ের হদ্দ। গত পাঁচ বছরের বাকি-বকেয়া এখনো মেটাতে পারেনি।"

বুড়োটা বলতে লাগল, "সফরোন ইয়াকভলিচ আমার হয়ে বাকি-বকেয়া শোধ করেছেন, হুজুর, এই পাঁচ বছর ধরে উনি শোধ করছেন তো শোধ করছেন—ওর বদলে উনি আমায় ক্রীতদাস বানিয়েছেন, হুজুর আর এখানে ..."

"তোমার বাকি পড়ে কেন?" মিঃ পেনচ্‌কিন ধমকে উঠলেন। (বুড়োর মাথা নিচু হয়ে গেল।) "তুমি নিশ্চয়ই নেশা করে ভাঁটিখানায় পড়ে থাক।" (বুড়ো উত্তর দেবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করল।) "আমি তোমায় চিনি!" আর্কাদি পাভলীচ জোরের সঙ্গে বলতে লাগলেন, "তুমি ভাবো নেশা করা ছাড়া আর উনুনের ওপরে পড়ে থাকা ছাড়া তোমার অন্য কিছু করার নেই, অন্য পরিশ্রমী চাষীরা তোমার হয়ে জবাবদিহি করুক।"

"ও ভীষণ বেয়াড়া!" নায়েব কথাটা জুড়ে দিল।

"তা হতেই হবে, এ রকমই তো হয়। অনেকবার এ রকমটা দেখেছি। সারা বছর মদ খেয়ে গালিগালাজ করে বেড়ায়, আর তারপর লোকের পায়ে পড়ে।"

বুড়োটা হতাশভাবে বলতে সুরু করল, "আর্কাদি পাভলীচ হুজুর, রক্ষে করুন, আমাদের বাঁচান, কখনো আমি বেয়াড়াপনা করেছি? ভগবান সাক্ষী, আমি দিব্যি করছি, ও সব আমার ক্ষমতার বাইরে। সফরোন ইয়াকভলিচ আমায় কু-নজরে দেখেন, কোনো কারণে আমায় অপছন্দ করেন, ভগবান ওর বিচার করবেন! উনি আমায় একেবারে শেষ করে ছাড়বেন, হুজুর... এই শেষ... এই যে দেখছেন... এই শেষ ছেলেটা—আর তাকেও উনি ..." (বুড়োটার হলদে কোঁচকানো চোখে এক ফোঁটা জল চিক চিক করে উঠল।) "দয়া করুন, হুজুর, আমাদের বাঁচান।"

বুড়োর ছেলেটাও সুরু করল, "আর শুধু আমাদেরই নয় ..."

আর্কাদি পাভলীচ সঙ্গে সঙ্গে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

"তোমার মতামত কে জিজ্ঞেস করেছে হে? যতক্ষণ না তোমায় কিছু বলা হয় চুপচাপ থাক। কি সাহস তোমার? চুপ, আমি বলছি, চুপ রও। উঃ! এ যে একেবারে বিদ্রোহ! না হে বন্ধু, আমার এলাকায় বিদ্রোহ করতে তোমাদের আমি বারণ করছি... আমার..." (বলতে বলতে আর্কাদি পাভলীচ এগিয়ে গেলেন, কিন্তু সম্ভবত আমার উপস্থিতির কথা মনে পড়ায়, পেছনে তাকিয়ে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।) তারপর অর্থপূর্ণভাবে গলার স্বর নামিয়ে জোর করে হেসে বললেন, "Je vous demande bien pardon, mon cher! C'est le mauvais côté de la médaille...* ঠিক আছে, থাক, ওতেই হবে," চাষীদের দিকে না তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "আমি দেখব ব্যাপারটা... ঠিক আছে, তোমরা যাও।" (চাষারা উঠল না।) "আমি তোমাদের কি বলিনি ... ঠিক আছে! তোমরা এবার যাও, আমি বলছি।"

আর্কাদি পাভলীচ ওদের দিকে পিছন ফিরলেন। "বিরক্তি ছাড়া আর কিছু নয়," বিড় বিড় করে বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে চললেন বাড়ির দিকে।

* আমায় মাপ করবেন ভাই। এ সব ব্যাপারের কুশ্রী দিকটা হচ্ছে এই। (ফরাসী ভাষা)

সফরোন তাঁর অনুসরণ করল। গ্রামের চৌকিদার বিস্ফারিত চোখে চাইল, যেন সে এই বার শূন্যে প্রচণ্ড লাফ দিয়ে উঠবে এই রকম তাকে দেখাল। গোমস্তা হাঁসগুলোকে ডোবা থেকে তাড়িয়ে দিল। চাষা দুটো আগের মতো দাঁড়াল। তারপর পরস্পরের দিকে চাইল আর পিছন দিকে না তাকিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।

দু'ঘণ্টা পরে রিয়াবভোতে পৌঁছে আমার সঙ্গে ভালো জানাশোনা আছে, আন্পাদিস্ত বলে সেই চাষীটার সঙ্গে শিকারের তোড়জোড় সুরু করলাম। আমার চলে আসা পর্যন্ত সফরোনের ওপর পেনচ্কিন বিরক্ত হয়ে ছিলেন। আমি আন্পাদিস্তের সঙ্গে পেনচ্কিন, শিপিলভ্কার চাষী — এই সব নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম নায়েবকে চেনে কিনা।

"সফরোন ইয়াকভলিচ? উঃ!"

"কেন? ও কি রকম লোক?"

"ওটা মানুষ নয়, ওটা একটা কুত্তা, এখান থেকে কুরস্ক-এর মধ্যে ও রকম একটা জানোয়ার খুঁজে পাবেন না।"

"কি রকম?"

"কেন — শিপিলভ্কা গ্রামটা ওঁর — মিঃ পেনচ্কিন নাকি — ওঁর বলে তো ধরা হয় না। উনি তো ওখানকার মালিক নন, আসলে সফরোনই সর্বেসর্বা।"

"তাই নাকি?"

"ঐ তো মালিক, জায়গাটা যেন ওর নিজের সম্পত্তি। চাষীরা সব্বাই ওর কাছে ঋণগ্রস্ত, ওর ক্রীতদাস হয়ে সবাই বেগার খাটে। কাউকে মালের সঙ্গে দূরে পাঠিয়ে দেয়, কাউকে বা অন্য কোথায়... ও সকলের জান খেয়ে নেয়।"

"ওদের খুব বেশি জমি নেই বোধহয়।"

"বেশি জমি নেই! ও খ্লীনভের চাষীদের কাছ থেকেই দু'শো একর জমি ভাড়া নিয়েছে, আমাদের গ্রামের চাষীদের কাছ থেকে দু'শো আশি একর জমি, মানে চারশো আশি একর। ও শুধু জমির ব্যবসাই করে না, ঘোড়া, অন্যান্য পশু. আলকাতরা, মাখন, শণ. আরো অনেক জিনিসের ব্যবসা চালায়। ও লোকটা ধূর্ত — অসম্ভব ধূর্ত; আর ধনী — বেটা জানোয়ার! আর খারাপ কী জানেন, ও লোকজনদের মারধোর করে, বেটা ইতর, মানুষ নয়। একটা কুত্তা, সত্যি আপনাকে বলছি, ও একদম খেঁকি কুত্তা, এই হচ্ছে ওর আসল চেহারা।"

"কই চাষীরা তো ওর নামে নালিশ করে না?"

"কাকে বা নালিশ করবে? আমি বলতে পারি, ও মনিবকে সন্তুষ্ট রাখে! খাজনা কখনো বাকি পড়ে না, ওর আর ভাবনা কি?" সে একটু থেমে বলল, "কেউ নালিশ করুক না কেন আমি দেখি। না, ও তাহলে তাকে দেখে নেবে... হ্যাঁ, সে চেষ্টা না করাই ভালো, ও তাহলে তাকে মজাটা টের পাইয়ে দেবে।"

আন্তিপ-এর কথা মনে পড়ল, তাকে আগেকার ঘটনাটা বললাম।

আন্‌পাদিস্ত মন্তব্য করল, "এইবার ও লোকটাকে খেয়ে ফেলবে। গোমস্তা ওকে এবার মার লাগাবে। গরীব বেচারা, ব্যাপারটা ভেবে দেখুন! ওর দোষটা কী? নায়েবের সঙ্গে গ্রামের একটা সভায় লোকটার শুধু একটু তর্কাতর্কি হয়েছিল আর তাইতে নায়েব বেজায় চটেছে বোধহয়, এ জিনিস ও সহ্য করবে না ... তিলকে তাল করছে লোকটা! চাষীটাকে খোঁচাতে সুরু করেছে। এবার তাকে একেবারে গিলে খাবে। জানেন, এমন কুত্তা ও—এমন খেঁকি কুত্তা—ঈশ্বর আমার অপরাধ ক্ষমা করুন! — ও জানে, কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। যে সব বুড়োর অল্প পয়সা আছে, যাদের বড়ো পরিবারে সবাই কাজকর্ম করে, লাল-চুলো শয়তানটা তাদের ছোঁয় না! কিন্তু ওর যত জুলুম এই সব লোকের ওপর! জানেন, ও আন্তিপের ছেলেগুলোকে একের পর এক সৈন্যবাহিনীতে পাঠিয়েছে। নিষ্ঠুর, শয়তান বেটা, খেঁকি কুত্তা! ঈশ্বর আমার অপরাধ ক্ষমা করুন!"

আমরা নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগোলাম।

সাল্‌জব্রুন, সাইলেসিয়া, জুলাই, ১৮৪৭

কাছারি বাড়ি

তখন হেমন্তকাল, কয়েক ঘণ্টা ধরে মাঠগুলোর মধ্য দিয়ে চলেছি বন্দুক নিয়ে, মিহি, ঠাণ্ডা যে বৃষ্টিটা সারাদিন আমাকে নিষ্ঠুর একগুঁয়ে আইবুড়ী স্ত্রীলোকের মতো বিরক্ত করে চলেছে সেটা যদি অবশেষে ধারে কাছে কোথাও একটা তখনকার মতো আশ্রয় খুঁজে নিতে বাধ্য না করত তাহলে সম্ভবত সন্ধ্যে পর্যন্ত কুরস্কের পথে ভাটিখানায় আমি আর ফিরতাম না, যেখানে আমার ত্রইকা গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। কোন দিকে যাবো ভাবছি, হঠাৎ আমার নজরে পড়ল মটরশুঁটির ক্ষেতের কাছে ছোটো একটা কুঁড়ে। কুঁড়েঘরটার কাছে গিয়ে খড়োচালের নিচে উঁকি দিয়ে একটা বুড়োকে দেখলুম, এমন থুরথুরে সে যে, রবিনসন ক্রুশো তার দ্বীপের এক গুহার মধ্যে যে মরণাপন্ন ছাগলটাকে দেখতে পেয়েছিল তার কথা মনে পড়ল। বুড়োটা উবু হয়ে বসেছিল, ছোটো ছোটো নিষ্প্রভ চোখ দুটো আধবোজা, দ্রুত কিন্তু অতি সযত্নে খরগোসের মতো (বেচারার একটাও দাঁত ছিল না) একটা শুকনো শক্ত মটর গালের এপাশ ওপাশ করে অবিরত চিবিয়ে চলেছে। এই কাজে সে এতই মগ্ন যে আমি এসেছি তা দেখতে পেল না।

আমি বললাম, "দাদু! ও দাদু!"

ওর চিবানো থামল, ভুরু দুটো উঁচু করল, আর চেষ্টা করে চোখ দুটো খুলে তাকাল।

"কি?" ভাঙা গলায় অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল।

"কাছাকাছি কোথাও গ্রাম আছে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বুড়োটা আবার চিবুতে শুরু করল। আমার কথাটা সে শুনতে পায়নি। আমি আগের চেয়েও চেঁচিয়ে আবার প্রশ্নটা করলাম।

"গ্রাম? তুমি কী চাও বাপু?"

"কেন, বৃষ্টি থেকে বাঁচবার মতো একটা আস্তানা।"

"কি?"

"বৃষ্টি থেকে বাঁচবার মতো একটা আস্তানা।"

"ও!" (সে তার রোদে-পোড়া ঘাড়টা চুলকে নিল।) তারপর হঠাৎ হাতটা নেড়ে অনির্দিষ্টভাবে বলল, "আচ্ছা বেশ, তা যাও না — ঐ যে ঐ ঝোপটার পাশ দিয়ে গিয়ে একটা রাস্তা পাবে, রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে সোজা ডান দিকে যাবে, সোজা ডাইনে, সোজা ডাইনে, ডান দিক দিয়ে চলতে চলতে আনানিয়েভো গ্রাম পাবে। কিম্বা সিতভ্কাতে চলে যাও।"

বুড়োটার কথা বুঝতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। তার গোঁফ জোড়ার আড়ালে কথার স্বর অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তার জিভও জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কোথাকার লোক?"

"কী?"

"কোথাকার লোক তুমি?"

"আনানিয়েভো।"

"এখানে কী করছ?"

"কী?"

"এখানে কী করছ?"

"আমি চৌকিদার।"

"সে কী, কী পাহারা দিচ্ছ?"

"এই মটর ক্ষেত।"

আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না।

"তাই নাকি, তোমার বয়স কত হল?"

"ঈশ্বর জানেন।"

"চোখে আর দেখতে পাও না মনে হয়?"

"কী?"

"চোখে আর দেখতে পাও না তো?"

"হ্যাঁ, তাই। কখনো কখনো একদমই শুনতে পাই না।"

"তাহলে তুমি কি করে পাহারা দেবে, অ্যাঁ?"

"সে বড়োরা জানে।"

"বড়োরা!" আমি ভাবলাম, আর অনুকম্পার সঙ্গে বেচারা বুড়োকে দেখতে লাগলাম।

সে হাতড়ে বুকের ভেতর থেকে এক টুকরো শক্ত রুটি বার করল, অতিকষ্টে ঢুকে-যাওয়া তোবড়ানো গাল নেড়ে নেড়ে ছেলেমানুষের মতো চুষতে লাগল।

আমি ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেলাম, ডান দিকে বেঁকলাম, বুড়োটার উপদেশ মতো ডান দিক দিয়ে চলতে চলতে পাথরের তৈরি নতুন ধরনের গির্জাওয়ালা একটা বড় গ্রামে পৌঁছালাম। নতুন ধরনের গির্জা — মানে বেশ বড়ো বড়ো থাম, আর প্রশস্ত জমিদার-বাড়িটাও বড়ো বড়ো থাম দিয়ে তৈরি। তখনো কিছু দূর থেকে সূক্ষ্ম বৃষ্টিজালের মধ্য দিয়ে অন্য সব বাড়ির চাইতে উঁচু কাঠের ছাদ আর দুটো চিমনিওয়ালা একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। খুব সম্ভব ওটা গ্রামের মোড়লের বাড়ি, ঐ বাড়িটার দিকেই পা চালিয়ে দিলাম সামোভার, চা, চিনি, আর খুব টকে যায়নি এমন খানিকটা ক্রীম পাওয়ার প্রত্যাশায়। ঠাণ্ডায় অর্ধেক জমে যাওয়া কুকুরটার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে বাইরের ঘরে ঢুকলাম, দরজা খুলে কুটিরের সাধারণ আসবাবপত্রের বদলে দেখলাম কতকগুলো টেবিল, তার ওপরে স্তূপীকৃত কাগজ, দুটো লাল কাবার্ড, কালি ছিটানো দোয়াতদানী, ধাতুনির্মিত কালিশোষা বালির বাক্স, তার ওজন প্রায় আধ হন্দর, লম্বা লম্বা কলমদান ইত্যাদি আরো কত কি। একটা টেবিলে বছর কুড়ি বয়সের একটি যুবক বসেছিল, তার রুগ্ণ ফোলা ফোলা মুখ, কুতকুতে চোখ, তেলতেলে কপাল আর অসীম রগ। যেমনটি প্রত্যাশা করা যায় ঠিক সেই রকম ধূসর রঙের ন্যানকিন কোট ছিল তার পরনে, কোটের কোমর আর কলারের দিকটা ব্যবহারের ফলে রঙচটা।

হঠাৎ মুখ ধরে টানলে ঘোড়া যেমন ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা ওপরে তোলে তেমনি করে সে আমায় জিজ্ঞেস করল, "কী চান?"

"গোমস্তা কি এখানে থাকে? ... কিম্বা ..."

সে বাধা দিয়ে বলল, "এটাই জমিদারীর প্রধান কাছারি। আমি এখানকার কেরাণী... সাইনবোর্ড দেখেননি? দেখবার জন্যেই তো ওটা লটকানো রয়েছে।"

"এখানে জামাকাপড় শুকাবো কোথায়? গ্রামের কোথাও কি একটা সামোভার আছে?"

ধূসর কোট-পরা যুবকটি মর্যাদার সঙ্গে উত্তর দিল, "সামোভার নিশ্চয়ই আছে, ফাদার তিমফেই, কিম্বা চাকরদের বাসায়, কিম্বা নাজার তারাসীচের কাছে যান, কিম্বা আগ্রাফেনার কাছেও যেতে পারেন—ঐ যে হাঁস-মুরগীর খোয়াড় দেখাশুনা করে।"

পাশের ঘর থেকে গলার আওয়াজ এল, "কার সঙ্গে কথা বলছ, গাধা? আমায় কি ঘুমুতে দেবে না হাঁদারাম?"

"একজন ভদ্রলোক এসে জামাকাপড় কোথায় শুকানো যায় জিজ্ঞেস করছেন।"

"কী ধরনের ভদ্রলোক?"

"তা জানি না। বন্দুকধারী একজন, সঙ্গে কুকুর আছে।"

পাশের ঘরে খাটটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করল। দরজা খুলে গেল, পঞ্চাশ বছরের বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ একজন লোক ঘরে প্রবেশ করল—বৃষস্কন্ধ, ডেব্‌রা চোখ, গাল দুটো অস্বাভাবিক গোল, মসৃণ মুখটা চক্ চক্ করছে।

সে আমায় জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী চাই?"

"এই জামাকাপড়গুলো শুকাবো।"

"এখানে সে রকম কোনো জায়গা নেই।"

"আমি জানতাম না এটা কাছারি বাড়ি। যদিও খরচা করতে আমি রাজী ..."

মোটা লোকটা বলল, "আচ্ছা হয়ত এখানে ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে, ভেতরে আসবেন কি?" (আমায় একটা ঘরে নিয়ে গেল, কিন্তু যে ঘরটা থেকে সে নিজে বেরিয়েছিল সেটায় নয়।) "এটায় আপনার চলবে?"

"খুব, খুব ... এ বার চা আর ক্রীম পেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই, এক্ষুণি। জামাকাপড় বদলে বিশ্রাম করুন, এক্ষুণি চা তৈরী হয়ে যাবে।"

"এটা কার তালুক?"

"মাদাম লসনিয়াকোভার, ইয়েলেনা নিকলায়েভনার।"

সে বাইরে গেল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম: আপিস-ঘর আর আমার ঘরের পার্টিশন-দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা মস্ত চামড়ার সোফা, দুটো উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ার, সে দুটোও চামড়া দিয়ে মোড়া, গ্রামের রাস্তার দিকে মুখ করা একটি মাত্র জানালার দু'দিকে পাতা। গোলাপী নক্সা-কাটা সবুজ দেয়াল-কাগজ আঁটা দেয়ালে তিনটে বিরাট তৈলচিত্র ঝোলানো। একটা ছবির বিষয় নীল কলার দেওয়া "সেটার" কুকুর—নিচে লেখা—"এই আমার সান্ত্বনা"; কুকুরের পায়ের নিচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে; নদীর ওপারে একেবারে বেঢপ আয়তনের একটা খরগোস কান খাড়া করে পাইন গাছের নিচে বসে রয়েছে। আরেকটা ছবিতে দুটো বুড়ো বসে বসে তরমুজ খাচ্ছে, তরমুজের আড়ালে দূরে গ্রীক মন্দির দেখা যাচ্ছে, তাতে লেখা—"সন্তোষের মন্দির"। তৃতীয় ছবিতে একটা অর্ধনগ্ন নারী গা এলিয়ে রয়েছে en raccourci, হাঁটু দুটো লাল, গোড়ালি দুটো খুব মাংসল। আমার কুকুরটা অস্বাভাবিক চেষ্টায় সোফার তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গিয়েছিল, সেখানে আপাতত প্রচুর ধুলো নাকে যাওয়ার ফলে প্রবলভাবে হাঁচতে লাগল। জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। জমিদারের বাড়ি থেকে কাছারি বাড়ি অবধি রাস্তায় লম্বালম্বি তক্তা পাতা, খুব কাজের সেটা সত্যি, কেননা আমাদের দেশের উর্বরা কালো মাটি আর অবিশ্রাম বৃষ্টির ফলে ভয়ঙ্কর কাদা হয়েছে। রাস্তার দিকে পিছন করা জমিদার-বাড়িটির কাছে লোকজন অনবরত যাওয়া-আসা করছে, যেমনটা যে কোনো জমিদার-বাড়িতে হয়ে থাকে, বিবর্ণ ছিট-কাপড়ের গাউন-পরা দাসীরা ইতস্তত ছোটাছুটি করছে; গৃহদাসেরা কাদার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো দাঁড়িয়ে একমনে পিঠ চুলকাচ্ছে; একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা কনস্টেবলের ঘোড়া ল্যাজ আছড়াচ্ছে অলসভাবে, আবার কখনো নাক ওপরে তুলে বেড়া ছিঁড়ে খাচ্ছে; মুরগীগুলো কিচমিচ করছে; রুগ্ণ টার্কীগুলো অবিশ্রাম ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারময় জীর্ণ বাইরের কুটিরের বোধহয় স্নান-ঘরের সিঁড়িতে বসে একটা লম্বা-চওড়া ছেলে গীটার নিয়ে বেশ খানিকটা আবেগ দিয়ে অতি পরিচিত গাথা গাইছে:

"এই মায়াপুরী ছাড়লাম সে কোন্
পোড়া দেশের তরে, বন্ধুরে ..."

মোটা লোকটা আমার ঘরে ঢুকল।

একটু অমায়িক হেসে বলল, "আপনার চা এখনি নিয়ে আসছে।"

ধূসর কোট-পরা যুবকটি, কেরাণীটি, পুরানো তাস খেলার টেবিলে একটা সামোভার, একটা টি পট, ভাঙা ডিশের ওপর একটা গেলাস, এক জগ্ ক্রীম আর পাথরের টুকরোর মতো শক্ত কয়েকটা বোলখভ বিস্কুট রেখে গেল। মোটা লোকটা বেরিয়ে গেল।

কেরাণীটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "ও কে? জমিদারের গোমস্তা?"

"না, স্যার, উনি ছিলেন প্রধান খাজাঞ্চি, এখন প্রধান কেরাণীর পদ পেয়েছেন।"

"আপনাদের কোনো গোমস্তা নেই, তাহলে?"

"না, স্যার। নায়েব আছেন—মিখাইল ভিকুলভ, কিন্তু কোনো গোমস্তা নেই।"

"ম্যানেজার আছেন, তাহলে?"

"হ্যাঁ, আছেন। একজন জার্মান, নাম লিন্দামান্দোল, কার্লো কার্লীচ, কিন্তু তিনি জমিদারী দেখাশুনা করেন না।"

"তবে কে দেখাশুনা করে?"

"আমাদের কর্ত্রী নিজেই করেন।"

"সত্যি নাকি। আপিসে আপনারা অনেকে কাজ করেন?"

যুবকটি একটু ভাবল।

"তা আমরা ছ'জন আছি।"

"কে-কে?" আমি জানতে চাইলাম।

"এই দেখুন, এক নম্বর হল ভাসিলি নিকলায়েভিচ, প্রধান খাজাঞ্চি; তারপর একজন কেরাণী পিওতর; পিওতরের ভাই ইভান আরেকজন কেরাণী; আরেকজন ইভান, সেও কেরাণী; কস্কেণ্ডিন নার্কিজভ কেরাণী আর আমি—আমাদের অনেকে কাজ করি, আপনি গুণে শেষ করতে পারবেন না।"

"মনে হয় আপনাদের কর্ত্রীর বাড়িতে অনেক ক্রীতদাস আছে?"

"না, বেশি আছে বলা যায় না।"

"কতজন আছে তাহলে?"

"বলতে পারি সব মিলিয়ে একশ পঞ্চাশজন হবে।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম।

আবার আমি শুরু করলাম, "আপনার হাতের লেখা বোধহয় খুব ভালো?"

যুবকটি আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসল, মাথা নাড়ল, আপিস-ঘরে গিয়ে হাতে-লেখা একটা কাগজ নিয়ে এল।

সেই রকম হাসতে হাসতে বলল, "এই আমার লেখা।"

আমি দেখলাম, একটা ছাই রঙের চৌকো কাগজে সুন্দর পাকা হাতের লেখায় নিম্নোক্ত দলিলটি লেখা:

— হুকুমনামা —

আনানিয়েভো তালুকের প্রধান কাছারি হইতে
নায়েব মিখাইল ভিকুলভের সমীপে, নং ২০৯

"গতরাত্রে একটি অপরিচিত ব্যক্তি মত্তাবস্থায় ব্রিটিশ বাগানে প্রবেশ করে অশ্লীল সঙ্গীতাদির দ্বারা ফরাসী গভর্ণেস মাদাম এঞ্জেনির নিদ্রা ভঙ্গ করে এবং তাঁহাকে উত্যক্ত করে। প্রহরীর কিছু দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কি না, এবং কাহারা তখন বাগানে পাহারা দিতেছিল, তাহারা এই অশান্তি ঘটিতে দিয়াছে কি না: উপরোক্ত লিখিত সমস্ত বিষয়ের পুংখানুপুংখ তদন্ত করিয়া অবিলম্বে প্রধান কাছারিতে জানাইবার আদেশ জারি করা হইতেছে।

প্রধান কেরাণী, নিকলাই খ্ভস্তোভ।"

হুকুমনামার ওপর একটা প্রকান্ড পুরুষানুক্রমিক শীলমোহরের ছাপ, তার ওপর এই কথা কটি লেখা: "আনানিয়েভো তালুকের প্রধান কাছারির শীলমোহর"; তার তলায় সই করে লেখা: "যথাযথভাবে অবশ্য পালনীয় — ইয়েলেনা লসানিয়াকোভা।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কর্ত্রী নিজেই সই করেন নাকি?"

"নিশ্চয়ই। তিনি নিজেই সই করেন। তাঁর সই ছাড়া হুকুমনামা মূল্যহীন।"

"আচ্ছা, এ বার নায়েবকে এই হুকুম আপনারা পাঠিয়ে দেবেন?"

"না, স্যার। উনি নিজেই এসে পড়বেন। তার মানে তাঁর কাছে পড়া হবে। বুঝলেন, উনি তো আর পড়ালেখা জানেন না।" (কেরাণীটি কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল।) তারপর বোকা বোকা হেসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বলেন, লেখাটা ভালো?"

"খুব ভালো লেখা।"

"অবশ্য আমার স্বীকার করা উচিত যে রচনাটা আমার নয়। এ বিষয়ে কম্কোভিকনের খুব ক্ষমতা আছে।"

"কী... আপনি বলতে চান এই সব হুকুমনামা আপনাদের আগেই রচনা করতে হয়?"

"কেন, তাছাড়া হবে কি করে? একটা খসড়া আগে না করে একেবারেই তো আর লিখে দেওয়া যায় না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কত মাইনে পান?"

"পঁয়ত্রিশ রুবল, আর জুতোর জন্যে আরও পাঁচ।"

"আপনি এতে খুশি?"

"নিশ্চয়ই খুশি। সকলেই তো আমাদের আপিসের মতো জায়গায় কাজ পায় না। আমার বেলায় ভগবান কৃপা করেছিলেন —আমার এক খুড়ো এখানকার খানসামা।"

"আপনার অবস্থা বেশ সচ্ছল?"

"হ্যাঁ, স্যার। তবু সত্যি বলতে গেলে," একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে চলল, "এই যেমন সদাগরি দপ্তর, আমাদের মতো লোকের পক্ষে ভালো। ব্যবসায়ীর কাছে যারা কাজ করে তাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। গতকাল সন্ধ্যেবেলা এক ব্যবসায়ী ভেনিওভ থেকে আমাদের এখানে এসেছিল। তার লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হচ্ছিল ... হ্যাঁ, ওদের জায়গাটা বেশ ভালো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, জায়গাটা বেশ ভালো।"

"কেন? ব্যবসায়ীর ওখানে মাইনেপত্তর বেশি নাকি?"

"ঈশ্বর রক্ষে করুন! মাইনে চাইলে ব্যবসায়ী এক্কেবারে বরখাস্ত করে দেবে। ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করতে গেলে বিশ্বাস এবং ঝুঁকি, দুয়ের ওপরে থাকতে হবে। ব্যবসায়ী আপনাকে খাওয়া-পরা, পানীয় আর যা যা প্রয়োজনীয়

সবই জোগাবে। যদি তাকে খুশি করতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য আরও অনেক কিছু করবে ... মাইনের কথা বলছেন, বটে? মাইনের দরকার হয় না। তাছাড়া ব্যবসায়ীও ঠিক আমাদের সাধারণ রুশদের মতো জীবন যাপন করে: আপনি তার সঙ্গে কোথাও বাইরে যান — সে চা খেলে আপনাকে দেবে, সে যা খাবে, আপনাকেও খেতে দেবে। ব্যবসায়ীর সঙ্গে মানিয়ে চলা যায়, কেননা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক আলাদা। ব্যবসায়ী খামখেয়ালী নয়। মেজাজ বিগড়ে গেলে আপনাকে সোজা ঘুঁষি মেরে বসবে, ব্যস, ওখানেই মিটে গেল। আপনাকে বিরক্ত করবে না বা মুখ সিটকোবে না। কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকা ভীষণ ঝকমারি! কোন কিছুই তার পছন্দ হয় না — 'এটা ঠিক হয়নি' — কি হলে ঠিক হবে তাও ভাবতে পারে না। তাকে এক গেলাস জল দিন কিম্বা কিছু খেতে দিন — 'উঃ জলে গন্ধ! ডিশে গন্ধ।' ওটা নিয়ে যান, দরজার বাইরে এক মিনিট অপেক্ষা করে ফের ওটাই নিয়ে আসুন। 'বাঃ এ বার বেশ ভালো, এতে আর গন্ধ নেই।' আর মেয়েদের কথা যদি ধরেন, তবে আপনাকে বলি, মেয়েরা একেবারে সৃষ্টিছাড়া... আর বিশেষত তরুণীরা!"

আপিস-ঘর থেকে মোটা লোকটার গলার আওয়াজ এল, "ফেদিউশকা!"

কেরাণীটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। এক গেলাস চা খেয়ে সোফার ওপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। দু'ঘণ্টা ঘুমোলাম।

যখন ঘুম ভাঙল উঠতে চাইলাম, কিন্তু খুব আলস্য হচ্ছিল। আবার চোখ বুজলাম, কিন্তু আর ঘুমোলাম না। পার্টিশন-দেওয়ালের ওদিকে, আপিসে ওরা নিচু গলায় কথাবার্তা কইছিল। নিজেরই অজ্ঞাতসারে আমি শুনতে লাগলাম।

"ঠিক, ঠিক তাই, নিকলাই ইয়েরেমেইচ। ওটা কেউ হিসেবে না ধরেই পারে না, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই... হুঁ!" (বক্তা কাশল।)

মোটা লোকটা উত্তর দিল, "বিশ্বাস করুন, গাভ্রিলা আন্তোনীচ, আমি কি জানি না কী ভাবে এখানে কাজ চলে? নিজেই বিচার করে দেখুন।"

আমার অচেনা গলাটা বলতে লাগল, "আপনি ছাড়া কে আর করে, নিকলাই ইয়েরেমেইচ? আপনিই বলা যেতে পারে এখানকার প্রধান ব্যক্তি।

আচ্ছা, তাহলে কী ভাবে হবে, বলুন? তাহলে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় বলুন, নিকলাই ইয়েরেমেইচ? আমায় জিজ্ঞেস করতে দিন।"

"কি সিদ্ধান্তে আসা যায়, গাভ্রিলা আন্তোনীচ, — বলতে গেলে সেটা আপনার ওপরেই নির্ভর করে, আপনার বিশেষ গরজ আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

"শপথ করে বলছি, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, আপনি বলছেন কি? বেচা-কেনা আমাদের ব্যবসা, কেনাকাটাই আমাদের কাজ। ওটাই আমাদের জীবিকা বলা যায়, নিকলাই ইয়েরেমেইচ।"

মোটা লোকটি বেশ জোর দিয়ে বলল, "আট রুবল।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা গেল।

"নিকলাই ইয়েরেমেইচ, মশাই, আপনি খুব বেশি দাম বলছেন।"

"এ ছাড়া অন্য কিছু করার উপায় নেই, গাভ্রিলা আন্তোনীচ, ঈশ্বরের সামনে বলছি, অসম্ভব।"

এর পর খানিকক্ষণ চুপচাপ।

আমি আস্তে আস্তে উঠে পড়ে পার্টিশনের একটা ফুটো দিয়ে উঁকি মারলাম। আমার দিকে পিছন ফিরে মোটা লোকটা বসেছিল। তার দিকে মুখ করে একজন ব্যবসাদার বসেছিল, বছর চল্লিশ বয়স, শীর্ণ, পাণ্ডুর, মনে হচ্ছিল যেন তাকে তেল মাখানো হয়েছে। সে অবিশ্রাম দাড়িতে হাত বুলিয়ে চলেছে, ঘন ঘন চোখ পিট্ পিট্ করছে আর ঠোঁট নড়াচ্ছে।

সে আবার শুরু করল, "এবার অদ্ভুত ভালো ফসল হয়েছে বলা যায়, আমি যেখানে যাই সেখানেই তারিফ করে বেড়াচ্ছি। ভরোনেঝ থেকে সমস্ত জায়গাতেই চমৎকার ফসল হয়েছে, বলা যায় একেবারে প্রথম শ্রেণীর।"

প্রধান কেরাণী বলল, "ফসল নিশ্চয়ই বেশ ভালোই হয়েছে, কিন্তু প্রবাদ আছে জানেন তো, গাভ্রিলা আন্তোনীচ, — অঘ্রাণেতে গোলাভরা চৈত্রমাসে শুকনো খরা।"

"তা তো বটেই, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, সবই ঈশ্বরের হাতে, আপনি এইমাত্র যা বললেন তা ধ্রুব সত্য, মশায় ... কিন্তু আপনার অভ্যাগত বোধহয় এতক্ষণে জেগে উঠেছে।"

মোটা লোকটি ফিরে তাকাল ... কান পেতে শুনল ...

"না না, ও ঘুমুচ্ছে। হতে পারে ... যদিও ..."

মোটা লোকটা উঠে দরজার দিকে গেল।

'না, ও ঘুমুচ্ছে," পুনরাবৃত্তি করে আবার নিজের জায়গায় গেল।

ব্যবসাদারটি আবার বলতে শুরু করল, "আচ্ছা, তাহলে কি বলব বলুন, নিকলাই ইয়েরেমেইচ? বেচা-কেনার একটা সমাধানে পেঁছতে হয়। তাহলে তাই হোক, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, তাহলে তাই হোক," অবিচ্ছিন্নভাবে চোখ পিট্ পিট্ করে সে বলে চলল, "দুটো ধূসর রঙের আর একটা শাদা রঙের নোট আপনার জন্য, আর ওখানের জন্য" (এই বলে সে মাথা নেড়ে জমিদার-বাড়ির দিকে দেখাল), "সাড়ে ছ'টা নোট। হল তো?"

প্রধান কেরাণী উত্তর দিল, "চারটে ধূসর রঙের নোট চাই।"

"আচ্ছা, তিনটে কেমন?"

"চারটে ধূসর রঙের নোট চাই, শাদা একটাও না।"

"তিনটে নিন, নিকলাই ইয়েরেমেইচ।"

"সাড়ে তিনটে নোট, এর এক পয়সা কম না।"

"তিনটে, নিকলাই ইয়েরেমেইচ।"

"এ কথা বলবেন না, গাভ্রিলা আন্তোনীচ।"

ব্যবসাদারটি বিড় বিড় করল, "ওঃ, আচ্ছা মাথামোটা একগুঁয়ে লোকরে বাবা। তাহলে কর্ত্রীর সঙ্গেই বন্দোবস্ত করি।"

মোটা লোকটা উত্তর দিল, "সে আপনি যা ভালো বোঝেন, এর চেয়ে অনেক ভালো বটে। যাই হোক না কেন, মিছিমিছি নিজের অসুবিধে ঘটাবেন? এর চাইতে অনেক ভালো হবে, বটে, বটে।"

"আরে, আরে, নিকলাই ইয়েরেমেইচ। মুহূর্তেই বিরক্ত হয়েছেন! ওটা কিন্তু কথার কথা ছাড়া কিছুই না।"

"না, না, সত্যি, কেন আপনি ..."

"ও সব বাজে, আপনাকে আমি বলছি ... বলছি আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম। বেশ, সাড়ে তিনই নিন, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।"

মোটা লোকটা নিজের মনে বিড় বিড় করে বলল, "চারটে নোট পাওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু গাধার মতো আমি বড়ো তাড়াতাড়ি করতে গেলুম।"

"তাহলে ওখানে, জমিদার-বাড়িতে তো, দিতে হবে সাড়ে ছ'টা নোট, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, সাড়ে ছ হল তবে শস্যের দাম?"

"হ্যাঁ, সাড়ে ছয় — আগে যা ঠিক হয়েছে।"

"তাহলে হাত মেলান, নিকলাই ইয়েরেমেইচ" (ব্যবসায়ী কেরাণীর সঙ্গে ছড়ান আঙুলে করমর্দন করল)। "আচ্ছা চলি!" (ব্যবসাদার উঠে পড়ল।) "তাহলে, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, মশায়, তাহলে কর্ত্রীর কাছে যাই, ওদের বলতে বলি যে আমি তাঁর কাছে এসেছি, তাহলে আমি তাঁকে বলব যে নিকলাই ইয়েরেমেইচ সাড়ে ছ'তে আমার সঙ্গে রফা করেছেন।"

"তাই বলবেন, গাভ্রিলা আন্তোনীচ।"

"আচ্ছা তাহলে এই নিন।"

ব্যবসাদার কেরাণীর হাতে নোটের একটা ছোট বাণ্ডিল দিয়ে দিল, অভিবাদন করল, মাথা ঝাঁকাল, তারপর দুই আঙুলে টুপিটা তুলে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, আর আঁকাবাঁকা গতিতে ভদ্রোচিতভাবে জুতোর মচ মচ আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল। নিকলাই ইয়েরেমেইচ দেওয়ালের কাছে গিয়ে, যতদূর আমি বুঝতে পারলাম, ব্যবসাদারের দেওয়া নোটগুলো গুণতে লাগল। ঘন গোঁপদাড়িওয়ালা একটা লাল চুলওয়ালা মাথা দরজার মধ্যে ঢুকল।

মাথাটা জিজ্ঞেস করল, "কী খবর? ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"কত হল?"

মোটা লোকটা হাত দিয়ে একটা ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী করে আমার ঘরের দিকে দেখিয়ে দিল।

"আরে ঠিক আছে।" এই বলে মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোটা লোকটা টেবিলের কাছে গিয়ে বসে একটা বই খুলল, গোল গুটিওয়ালা একটা অঙ্ক কষার শ্লেট নিয়ে গুটিগুলোকে এধার ওধার করে গুণতে লাগল, গুণবার সময়ে সে তর্জনী ব্যবহার না করে মধ্যমা ব্যবহার করছিল। এটা আরো জাঁকালো!

আগের সেই কেরাণীটি ঘরে ঢুকল।

"কী ব্যাপার?"

"গর্লপ্লিওকি থেকে সিদর এসেছে।"

"ও, ভেতরে আসতে বল। আচ্ছা দাঁড়াও, আচ্ছা একটু দাঁড়াও ... আগে যাও গিয়ে দেখ নতুন ভদ্রলোকটি এখনো ঘুমুচ্ছে না জেগে উঠেছে।"

কেরাণীটি সাবধানে আমার ঘরে এল। আমি আমার মাথা' শিকারের ব্যাগের ওপর, যেটা আমার বালিশের কাজ করত, রেখে চোখ বুজলাম।

কেরাণীটি আপিসে ফিরে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "ঘুমুচ্ছে।"

মোটা লোকটা নিজের মনে কী যেন বিড় বিড় করল।

শেষে বলল, "সিদরকে ভেতরে আসতে বল।"

আমি আবার উঠলাম। বছর ত্রিশ বয়সের এক অতিকায় চাষী ভেতরে এল — লালচে গাল, বলিষ্ঠ লোক, মাথায় বাদামী চুল, ছোটো কুঞ্চিত দাড়ি। যীশুর কাছে প্রার্থনাপূর্বক নিজের বুকে সে একটা ক্রুশচিহ্ন করল, প্রধান কেরাণীকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে দুই হাতে নিজের খোলা টুপিটা ধরে তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মোটা লোকটা হিসেব কষার গুটিগুলোতে টোকা দিতে দিতে বলল, "সুপ্রভাত, সিদর।"

"সুপ্রভাত, নিকলাই ইয়েরেমেইচ।"

"আচ্ছা রাস্তাঘাট কি রকম দেখলে?"

"বেশ ভালোই, নিকলাই ইয়েরেমেইচ। তবে একটু কাদা।" (চাষীটা জোরে নয়, আস্তে কথাবার্তা বলছিল।)

"বৌ-এর শরীর ভালো তো?"

"বেশ ভালোই আছে!"

চাষীটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা ঠ্যাং সামনের দিকে বাড়াল। নিকলাই ইয়েরেমেইচ কলম কানে গুঁজে নাকটা ঝাড়ল।

চেক-কাটা রুমালটা পকেটে পুরে সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা এবার কাজের কথাটা বল দেখি।"

"ঐ যে ওনারা বলছেন কি, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, ওনারা আমাদের কাছ থেকে ছুতোর চাইছেন।"

"তোমাদের কাছে ছুতোর নেই নাকি?"

"আছে নিশ্চয়ই, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, বনেই তো আমাদের বাস, কাঠ

কুটরো বেচেই তো আমরা খাই। কিন্তু এখন বড় কাজের তাড়া, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, ওখান থেকে আসার সময় কই?”

“আসার সময় কই! কাজের তাড়া! আমি বলতে পারি, বাইরের লোকের কাজ করতে তোমাদের ভয়ানক আগ্রহ, কর্ত্রীর কাজ করতে মোটে চাও না। কাজ সবই সমান।”

“হ্যাঁ, সব কাজই নিশ্চয়ই সমান, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, কিন্তু ...”

“কিন্তু কী?”

“এই মজুরি ... খুব ...”

“তারপর? তোমাদের স্বভাব একদম খারাপ হয়ে গেছে, এই হচ্ছে আসল ব্যাপার।”

“আরো বলতে কি, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, কাজটা হয়ত হপ্তাখানেকের, কিন্তু ওনারা আমাদের এক মাস ধরে আটকে রেখে দেবেন। কখনো হয়তো মাল ফুরিয়ে যাবে, আবার কখনো হয়ত আমাদের বাগানে পাঠানো হবে আগাছা সাফ করবার জন্য।”

“তাতে হয়েছে কি? আমাদের কর্ত্রী যখন নিজেই হুকুম দিয়েছেন এ ব্যাপারে তখন তোমার আমার কথাবার্তা বলে কোন লাভ নেই।”

সিদর চুপ করল, এক পায়ের ভর অন্য পায়ে বদলাতে লাগল।

নিকলাই ইয়েরেমেইচ এক পাশে মাথা হেলিয়ে হিসেব কষার গুটি নড়াচড়া করতে লাগল।

অবশেষে সিদর প্রত্যেক কথায় ইতস্তত করে বলতে শুরু করল, “ওখানকার চাষীরা, হুজুর আপনাকে তাদের বক্তব্য বলে পাঠিয়েছে... এই যে ... দেখুন না ...” (এই বলে সে তার মস্ত হাত কোটের ভেতরে ঢুকিয়ে লাল বর্ডার দেওয়া পাট-করা একটা গামছা টানতে আরম্ভ করল।) মোটা লোকটা ব্যস্তভাবে বাধা দিয়ে বলে উঠল, “আরে ভেবেছ কি? গর্দভ কোথাকার, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি গোল্লায় গেছে না কি? যাও, যাও, আমার বাড়িতে চলে যাও,” হতচকিত চাষীটাকে প্রায় ঠেলে বার করে দিতে দিতে বলে চলল; “আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করো, সে তোমায় চা-টা দেবে, আমি ততক্ষণে সোজা চলে যাব, যাও। ঈশ্বরের দোহাই, যাও যাও।”

সিদর চলে গেল।

"উঃ... ভাল্লুক একটা!" প্রধান কেরাণী মাথা নাড়তে নাড়তে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল, আবার হিসেব শুরু করে দিল।

হঠাৎ রাস্তায় চীৎকার শোনা গেল, "কুপ্রিয়া! কুপ্রিয়া! কুপ্রিয়াকে ঠেকাতে পারবে না!" আর একটু পরেই একটা রুগ্ণ চেহারার ছোটো খাটো লোক কাছারি বাড়িতে ঢুকল, বড়ো বড়ো বিস্ফারিত চোখ, নাকটা অস্বাভাবিক লম্বা, বেশ গম্ভীরভাবে হেঁটে আসছিল। তার পরনে জীর্ণ পুরানো ভেলভেটের কলারওয়ালা ক্ষুদে বোতাম লাগানো কোট। কাঁধে বয়ে আনছিল এক বোঝা জ্বালানি কাঠ। পাঁচজন জমিদার-বাড়ির চাকর তাকে ঘিরে ভিড় করে চেঁচাচ্ছিল, "কুপ্রিয়া! কুপ্রিয়াকে ঠেকাতে পারবে না! কুপ্রিয়া স্টোকার হয়ে গেছে, কুপ্রিয়াকে স্টোকার করে দেওয়া হয়েছে!" কিন্তু ভেলভেটের কলারওয়ালা কোট-পরা লোকটা সঙ্গীদের চেঁচামেচিতে কোন ভ্রূক্ষেপ করল না, একটুও অপ্রস্তুত হল না। মাপা পদক্ষেপে চুল্লীর কাছে গিয়ে বোঝাটা ফেলে দিল, তারপর শরীর সোজা করে পেছনের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে চোখ গোল গোল করে এক টিপ ছাই মেশানো পাতার গুঁড়ো নিতে লাগল।

যে দলটা হৈ চৈ করতে করতে ঢুকেছিল তাদের দেখে মোটা লোকটা প্রথমে ভুরু কুঁচকে আসন ছেড়ে উঠেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা দেখে সে হাসল আর ওদের শুধু চেঁচাতে বারণ করল। বলল, "ওরে, পাশের ঘরে একজন শিকারী ঘুমুচ্ছেন।"

ওদের মধ্যে দুজন একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কি ধরনের শিকারী?"

"একজন ভদ্রলোক।"

"ওঃ!"

ভেলভেটের কলারওয়ালা কোট-পরা লোকটা হাত নেড়ে বলল, "ওদের হৈ চৈ করতে দিন, যতক্ষণ না আমার গায়ে হাত দিচ্ছে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমায় তো স্টোকার করে দেওয়া হয়েছে।"

সকলে আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ! স্টোকার! স্টোকার!"

সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে চলল, "কর্ত্রীর হুকুম। কিন্তু তোরাও সবুর কর কিছুদিন ... তোদের তো শুয়োর চরাতে দেবে। আমি তো দর্জি, ভালো দর্জিই। মস্কোর সবচেয়ে ভালো দোকানে কাজ শিখেছি, জেনারেলদের

কাজও করেছি। সেটা তো আমার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আর তোদের জাঁক করবার মতো কী আছে? কী আছে? তোরা যত সব কুঁড়ের বাদশা, একেবারে অপদার্থ। আসলে তোরা এই। আমায় তাড়িয়ে দেবে! আমি না খেয়ে মরব না, ঠিক চালিয়ে নেব, আমায় ছাড়পত্র দেওয়া হোক — আমি বেশ খাজনা দিতে পারব, মনিবকে খুশি করতে পারব। কিন্তু তোরা করবি কি? তোরা মাছির মতো মরবি, এই তোদের দৌড়!"

"বেশ মিথ্যা বানিয়ে বলতে পারে," বাধা দিয়ে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একটা ছেলে বলে উঠল, তার চুলগুলো শাদা শাদা, গলায় লাল গলাবন্ধ জড়ানো, জামার কনুই দুটো ছেঁড়া। "তুমি তো বাপু ছাড়পত্র নিয়ে একবার চম্পট দিয়েছিলে, কিন্তু মনিবকে আধপয়সাও দিতে পারনি, নিজে এক কোপেকও রোজগার করতে পারনি, আবার গুটি গুটি বাড়িতেই ফিরে এসেছিলে, সেই থেকে গায়ে একটা নতুন জামাও তোমার জোটেনি।"

কুপ্রিয়া উত্তর দিল, "কনস্তান্তিন নার্কিজীচ, প্রেমে পড়লে লোকে কী করতে পারে, প্রেমে পড়লেই একজনের দফা শেষ! কনস্তান্তিন নার্কিজীচ, আমায় দোষ দেবার আগে, নিজে আমার অবস্থায় পড়ে একবার দেখ!"

"হ্যাঁ, তোমার প্রেমের পাত্রীটিও বেশ জুটিয়েছিলে, দেখলে আঁতকে উঠতে হয়!"

"না, না, একথা বলা তোমার উচিত নয়, কনস্তান্তিন নার্কিজীচ।"

"কে তোমার কথা বিশ্বাস করে? আমি তাকে দেখেছি, তুমি জানো? আমি গত বছর নিজের চোখে তাকে মস্কোয় দেখেছি।"

কুপ্রিয়া বলল, "তা গত বছরে ওর চেহারাটা একটু খারাপ হয়েছিল সত্যি।"

"না, না মশাইরা, আমি আপনাদের বলি কি যে," মুখে ব্রণের দাগওয়ালা, পমেটম দেওয়া কোঁকড়া চুল, দেখে মনে হয় সম্ভবত পরিচারক, বেপরোয়া অবজ্ঞাসূচক স্বরে সে বলে উঠল, "কুপরিয়ান আফানাসিচকে গান গাইতে দাও। আচ্ছা এ বার শুরু করো তো, কুপরিয়ান আফানাসিচ!"

অন্যেরা সবাই যোগ দিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! আলেক্সান্দ্রা কী জয়! একটা গেয়ে দাও কুপরিয়া, মাইরি ... গাও কুপরিয়া, আলেক্সান্দ্রা, তুমি আচ্ছা ফুর্তিবাজ!"

(চাকরেরা একটা পুরুষের নাম আমোদ করে মেয়েলি নামে উচ্চারণ করে।)
"একটা গান হোক।"

কুপারিয়ান দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "এটা গান গাইবার জায়গা নয়। এটা জমিদারের কাছারি।"

কনস্তান্তিন কর্কশ হেসে জবাব দিল, "তোমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি বাপু, তোমার কি কেরাণী হবার ইচ্ছে আছে নাকি? ব্যাপারটা তাই!"

বেচারী মন্তব্য করল, "সবই কর্ত্রীর ইচ্ছে।"

"ওহো ওদিকে ওর নজর আছে! এমন একটা লোক! ও, হোঃ, হোঃ!"

তারা সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ আহ্লাদে ফেটে গড়াগড়ি দিতে লাগল। সবচেয়ে জোরে হেসে উঠল বাড়ির চাকর-বাকরদের মধ্যে সম্ভবত উচ্চপদস্থ একজনের বছর পনেরোর একটা ছেলে, তার পরনে ব্রঞ্জের বোতাম লাগানো একটা ওয়েস্টকোট, লাইলাক ফুলের রঙের গলাবন্ধ গলায় জড়ানো, ইতিমধ্যে তার ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে।

নিকলাই ইয়েরেমেইচ মজা পেয়ে নিজের কাজকর্ম ছেড়ে বেশ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলতে লাগল, "আচ্ছা এ বার স্বীকার করো কুপ্রিয়া স্টোকার হওয়া কি খারাপ? কাজটা কি খুব সোজা, অ্যাঁ?"

কুপ্রিয়া বলতে লাগল, "নিকলাই ইয়েরেমেইচ, আপনি এখানকার প্রধান কেরাণী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার তো অজানা নেই যে আপনিও একবার অপদস্থ হয়েছিলেন, আপনাকেও চাষার কুঁড়েতে থাকতে হয়েছিল।"

মোটা লোকটা বাধা দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "কার সঙ্গে কথা বলছ সেটা না ভুললেই ভালো করবে; তোমার মতো বোকার সঙ্গে লোকে ঠাট্টা তামাসা করে! হাঁদারাম, তোমার জেনে রাখা দরকার যে তোমাকে সকলে যে নজর দিচ্ছে তার জন্য তাদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

"আমায় মাপ করুন, নিকলাই ইয়েরেমেইচ। কথাটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে ..."

"হ্যাঁ, বাস্তবিকই কথাটা বেফাঁস বলে ফেলেছ।"

দরজাটা খুলে গেল, একটা অল্পবয়সী চাকর দৌড়ে ঘরে ঢুকল।

"নিকলাই ইয়েরেমেইচ, কর্ত্রী আপনাকে ডাকছেন।"

সে চাকরটাকে জিজ্ঞেস করল, "তাঁর সঙ্গে কে রয়েছে?"

"ভোনিওভ'এর ব্যবসায়ী, আর আক্সিনিয়া নিকিতিশনা।"

"আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।" সে বেশ অনুরোধের সুরে সকলকে বলল, "ওহে বন্ধুরা, তোমরা এই নবনিযুক্ত স্টোকারের সঙ্গে সরে পড়লে ভালো করবে, কেননা, জার্মানটা যদি এখানে আসে তাহলে সে নিশ্চয়ই নালিশ করবে তোমাদের নামে।"

মোটা লোকটা চুলটা ঠিক করে নিয়ে কোটের আস্তিনের নিচে লুকানো হাতে একটু কেশে নিল, বোতামগুলো ঠিক করে এ'টে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ছুটল। একটু পরেই কুপ্রিয়া সমেত সমস্ত দলটা তার পেছন পেছন বেরিয়ে চলে গেল। আমার পুরানো বন্ধু সেই কেরাণীটি শুধু একা রয়ে গেল। সে কলম ছুঁচলো করতে লাগল, তারপর চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। সুযোগ পেয়ে কতগুলো মাছি ওর মুখের ওপর চারিদিকে বসে পড়ল। একটা মশা ওর কপালে বসল, আর তারপর পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নরম মাংসের মধ্যে আস্তে আস্তে হুল ফুটিয়ে দিল। সেই আগেকার দাড়িওয়ালা লাল চুলওয়ালা লোকটা আবার দরজায় দেখা দিল, উঁকিঝুঁকি মেরে কুৎসিত শরীরটা নিয়ে আপিসের ভেতরে ঢুকল।

"ফেদিউশকা! এঃ! ফেদিউশকা! সব সময় ঘুমোয়!" লোকটা বলল।

কেরাণী চোখ মেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"নিকলাই ইয়েরেমেইচ কি কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে?"

"হ্যাঁ, ভাসিলি নিকলাইচ।"

"ঠিক! ঠিক!" আমি ভাবলাম, "এই সেই প্রধান খাজাঞ্চি।"

খাজাঞ্চি ঘরের চারিদিকে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। পায়চারি করার চাইতে বললে ভালো হয় যে গুঁড়ি মেরে হে'টে বেড়াচ্ছিল, তাকে লাগছিল ঠিক বেড়ালের মতো। তার পরনে অত্যন্ত সংকীর্ণ মুড়ি দেওয়া পুরানো কালো ফ্রক-কোট। একটা হাত নিজের বুকের উপর রাখছিল, আর অন্য হাতটা তার ঘোড়ার চুলের আঁটসাঁট গলাবন্ধের কাছে সবসময় নড়াচড়া করছিল, কষ্ট করে সে মাথা ফিরিয়ে তাকাচ্ছিল। ছাগলের চামড়ার নরম জুতো পরে হাঁটছিল খুব মৃদু পায়ে।

কেরাণীটি বলল, "জমিদার ইয়াগুশকিন আপনাকে আজ খুঁজছিলেন।"

"আমায় খুঁজছিলেন? কী বলছিলেন?"

"বলছিলেন, তিনি সন্ধ্যেবেলায় তিউতিউরেভ'এর ওখানে গিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন। তিনি বললেন, 'ভাসিলি নিকলাইচের সঙ্গে আমি একটা কাজের কথা আলোচনা করতে চাই।' কাজটা কী সে কথা কিছু বললেন না, বললেন যে ভাসিলি নিকলাইচ সব জানেন।"

"হুঁ!" এই বলে প্রধান খাজাঞ্চি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"নিকলাই ইয়েরেমেইচ কাছারিতে আছে?" বাইরের ঘরে কে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল; তার পরেই পরিষ্কার পোষাক পরা একটা লম্বা লোক, অসমান কিন্তু বেশ সাহসী আর স্পষ্ট তার মুখের চেহারা, চৌকাঠের কাছে দাঁড়াল। দেখে বোঝা গেল চটে আছে।

ভেতরে চারদিকে চট্ করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সে এখানে নেই?"

খাজাঞ্চি জবাব দিল, "নিকলাই ইয়েরেমেইচ কর্ত্রীর কাছে গেছেন। তোমার যা দরকার, পাভেল আন্দ্রেইচ, আমাকে বলতে পারো ... কী চাই তোমার?"

"আমি কী চাই? তুমি জানতে চাও, আমি কী চাই?" (খাজাঞ্চি ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নাড়াল।) "আমি তাকে উচিত শিক্ষা দিতে চাই, মোটা, ধাড়ী, তেলতেলে শয়তান, কেচ্ছা-গেয়ে বেড়ানো বদমাইস, এ বার একটা কেচ্ছা ওকে আমি শিখিয়ে দিয়ে যাব।"

পাভেল একটা চেয়ারে নিজেকে ছুঁড়ে দিল।

খাজাঞ্চি আমতা আমতা করে বলল, "পাভেল আন্দ্রেইচ, তুমি বলছ কী! ঠান্ডা হও ... তোমার লজ্জা করছে না? কার সম্বন্ধে কথা কইছ ভুলো না, পাভেল আন্দ্রেইচ!"

"কার সম্বন্ধে কথা কইছি ভুলব না? ওকে প্রধান কেরাণী করা হয়েছে তাতে আমার কি? পদোন্নতি করে দেওয়ার মতো চমৎকার লোক পাওয়া গিয়েছে বটে, সন্দেহ নেই! বলতে পারো তরি-তরকারির বাগানে একটা ছাগলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে!"

"চুপ, চুপ, পাভেল আন্দ্রেইচ, চুপ করো! ও কথা ছেড়ে দাও ... কী সব যা-তা বলছ?"

"ঘোড়েল শেয়ালটা তাহলে খোশামুদি করছে?" পাভেল রাগত স্বরে টেবিলে ঘুঁষি মেরে বলল, "আমি ওর জন্য অপেক্ষা করব।" জানলা দিয়ে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ঐ যে উনি আসছেন! শয়তানের কথা বলেছ কি, ওমনি এসে হাজির। স্বাগতম, সুস্বাগতম!" (বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল।)

নিকলাই ইয়েরেমেইচ কাছারিতে ঢুকল। তার মুখ খুশিতে চক চক করছিল, কিন্তু পাভেল আন্দ্রেইচকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল।

তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ইচ্ছে করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে অর্থপূর্ণ স্বরে পাভেল বলল, "নমস্কার, নিকলাই ইয়েরেমেইচ।"

প্রধান কেরাণী কোনো উত্তর দিল না। দরজায় ব্যবসাদারটির মুখ দেখা গেল।

পাভেল আবার বলল, "আমার কথার জবাব কি অনুগ্রহ করে দেবেন না?" তারপর নিজেই যোগ করল, "কিন্তু না, না, ও রকম করে কিচ্ছু লাভ নেই। গালাগাল দিয়ে আর চেঁচামেচি করে কোনকিছু ফল হবে না, না, আপনি আমায় বন্ধুভাবে বলুন, নিকলাই ইয়েরেমেইচ, আমার পেছনে লাগেন কেন? আমার সর্বনাশ করতে চান কেন? বলুন ব্যাপারটা, খুলে বলুন।"

প্রধান কেরাণী বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, "এটা তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার উপযুক্ত স্থান নয় কিম্বা উপযুক্ত সময়ও নয়। কিন্তু বলব একটা কথা, ভেবে আমার অবাক লাগছে কী থেকে তোমার ধারণা হল তোমার সর্বনাশ করতে চাই কিম্বা শাস্তি দিতে চাই। আর সেই কথাই যদি তোলো, তাহলে আমি তোমায় শাস্তি কি করে দেব? তুমি তো আমার কাছারিতে চাকরি করো না।"

পাভেল উত্তর দিল, "আশা করি নয়, ওটা হলে তো গিয়েছি! কিন্তু ধাপ্পা কেন মারছেন, নিকলাই ইয়েরেমেইচ? ... আমার কথা তো বুঝছেন, আমি জানি।"

"না, আমি বুঝতে পারছি না।"

"নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।"

"ঈশ্বরের দিব্যি, বুঝতে পারছি না।"

"আবার দিব্যিও করছেন! আচ্ছা! যখন ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে

তখন বলুন আপনার কি ধর্মভয় নেই? ঐ বেচারা মেয়েটাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না কেন? তার কাছে কী চান আপনি?"

মোটা লোকটা বিস্ময়ের ভান করে বলল, "কার কথা বলছ, পাভেল আন্দ্রেইচ?"

"উঃ, জানেন না, আরো কত কি শুনব! আমি তাতিয়ানার কথা বলছি। একটু ধর্মভয় রাখুন—আপনি কি জন্য তার ওপর প্রতিশোধ নিতে চান? আপনার লজ্জা হওয়া উচিত: আপনি বিবাহিত লোক, আমার বয়সী ছেলেপিলে আছে; আমার কথা আলাদা... আমি ওকে বিয়ে করতে চাই! আমি সোজাসুজিই বলছি।"

"আমার কী দোষ, পাভেল আন্দ্রেইচ? কর্ত্রী তোমায় বিয়ে করতে অনুমতি দেবেন না। এ তাঁর অটল ইচ্ছা! আমি কি করব?"

"কেন, আপনি ঐ চাকরাণী বুড়ীটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেননি? নানা রকম গুজব রটাননি? ঐ অসহায় মেয়েটার নামে নানা রকম কেচ্ছা রটাননি? কাপড় কাচার কাজ থেকে ছাড়িয়ে ওকে যে রান্নাঘরে থালা বাসন ধোয়ার কাজে নামিয়ে দেওয়া হল — বলুন, এ আপনাদের কর্ম নয়? ওকে যে মারা হয়, চটের কাপড় পরিয়ে রাখা হয়, তাতে আপনাদের হাত নেই? আপনার লজ্জা হওয়া উচিত—লজ্জা হওয়া উচিত আপনার মতো বৃদ্ধ লোকের। আপনি জানেন, যে-কোনো সময় আপনার পক্ষাঘাত হতে পারে... ঈশ্বরের কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

"তুমি গালাগাল দিচ্ছ, পাভেল আন্দ্রেইচ, তুমি শাপান্ত করছ ... বেশি দিন তুমি এ রকম বেয়াড়াপনার সুযোগ পাবে না।"

পাভেল রেগে আগুন হয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "কি? আমায় শাসাচ্ছ? ভাবো তোমাকে ভয় করি! না, আমার সে অবস্থা হয়নি! তোমাকে ভয় করব আমি কেন? আমি যে-কোনো জায়গায় চাকরি পাবো। তোমার পক্ষে সেটা অসম্ভব! একমাত্র এইখানেই তোমার পক্ষে চুরি করে, কেচ্ছা রটিয়ে টিঁকে থাকা সম্ভব ..."

কেরাণীটির ক্রমশই ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছিল, সে বাধা দিয়ে বলে উঠল, "লোকটার অহঙ্কার দেখ, একজন কম্পাউন্ডার, শুধু একটা জোঁক, তার কথা শোনো! ধিক, ধিক! তুমি খুব একজন কেউকেটা!"

"হ্যাঁ, কম্পাউন্ডার! কিন্তু এই কম্পাউন্ডার ছাড়া তোমাকে এ্যাদ্দিন কবরে পচতে হত।" দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "শয়তানের তাগিদে তোমাকে সারিয়ে তুলেছিলাম।"

কেরাণী জবাব দিল, "তুমি আমাকে সারিয়েছিলে? বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করছিলে, আমায় মুসব্বর দিয়ে ওষুধ তৈরি করে দিয়েছিলে।"

"মুসব্বর ছাড়া অন্য কিছুতে তোমার ব্যামো না সারলে আর কী করার ছিল?"

নিকলাই বলল, "মুসব্বর ব্যবহার করা স্বাস্থ্যরক্ষা-সমিতি কর্তৃক নিষিদ্ধ। আমি এ বার তোমার নামে নালিশ করব ... তুমি আমায় মারবার চেষ্টা করেছিলে! কিন্তু ঈশ্বর তা সহ্য করেননি।"

খাজাঞ্চি বলতে যাচ্ছিল, "ব্যস, এবার থামুন, যথেষ্ট হয়েছে মশাইরা ..."

কেরাণীটি চীৎকার করে উঠল, "হটে যাও! ও আমায় বিষ দেবার চেষ্টা করেছিল! বুঝতে পারছ সেটা!"

পাভেল হতাশ স্বরে বলতে লাগল, "সেটা কিসের জন্য ... শোনো, নিকলাই ইয়েরেমেয়েভ, এই শেষবার আমি তোমাকে অনুনয় করছি ... তুমি আমায় এতটা করতে বাধ্য করেছ, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও, শুনতে পাচ্ছো? তা নাহলে হয় তোমার নয় আমার সাংঘাতিক কিছু একটা হয়ে যাবে!"

মোটা লোকটা ক্ষেপে উঠল।

চীৎকার করে বলে উঠল, "আমি তোমাকে ভয় করি না। বুঝলে কাঁচা খোকা? আমি তোমার বাপকেও সায়েস্তা করেছি, ওর শিং ভেঙে দিয়েছি। তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, সামলে চল।"

"বাপ তুলবে না, নিকলাই ইয়েরেমেয়েভ!"

"আমার ইচ্ছে আমি তুলব, তুমি আমায় হুকুম করবার কে হে?"

"আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, বাপ তুলবে না!"

"আর আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, নিজেকে ভুলে যেও না! যত ইচ্ছে নিজেকে দামী ভাবতে পারো, কিন্তু তোমার আমার মধ্যে যদি একজনকে বেছে নিতে হয় তাহলে কর্ত্রী আমাকে ছাড়িয়ে তোমায় চাকরীতে রাখবেন না। বিদ্রোহ বাধাবার অনুমতি কারোকে দেওয়া হয়নি।" (পাভেল রাগে

কাঁপছিল।) "আর তাতিয়ানা ছুঁড়ি, ওর দরকার... তাকেও দেখাচ্ছি ... একটু সবুর করো, তার হাল আরো খারাপ হবে!"

পাভেল ঘুঁষি পাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীটি মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

নিকলাই ইয়েরেমেয়েভ আর্তনাদ করে উঠল, "হাতকড়ি লাগাও, হাতকড়ি লাগাও ওকে ..."

এ দৃশ্যের শেষ আর আমি বর্ণনা করব না, আশঙ্কা হয় যে পাঠকের রুচিকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আহত করা হয়েছে।

ঐ দিনই আমি বাড়ি ফিরলাম। এক হপ্তা পরে শুনলাম যে মাদাম লসনিয়াকোভা পাভেল আর নিকলাই দুজনকেই কাজে বহাল রেখেছেন, কিন্তু তাতিয়ানাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে মনে হল।